এডগার রাইজ বারোজ রচিত

টারজান কিশোর সমগ্র



ভাবান্তর

শ্রীকাঞ্চন

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮

প্রকাশক :

বিজয়কৃষ্ণ দাস

৩৬, কলেজ রো

কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্ত্তী

ভেতরের ছবি : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক :

কৃষ্ণা রায়

তারা মুদ্রণ

২৫০/এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা—৭০০ ০০৬

আমার স্নেহের

তাতন, রত্না, মিতু, বাবু, পাপলু, বুবাই, পাপাই, রূপা,

রাণা, ঝুমা, রুমা, রিন্টু, সোমা, তুতন ও টুসিকে—

ভূমিকা

অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় সকলের কাছে একটি নাম টারজান। আরণ্যক টারজানকে ঘিরে কত না রহস্য, কত না রোমাঞ্চ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এডগার রাইজ বারোজই এনেছিলেন তাকে জনসমক্ষে। তারই গল্পগুলি নিয়ে এই গ্রন্থ। স্বভাবতই কল্পনা এসেছে ধেয়ে রহস্য, রোমাঞ্চ ঘেরা টারজানকে কেন্দ্র করে, আফ্রিকার পটভূমিকায় সংক্ষেপে ভাবান্তরিত হয়েও এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

আরণ্যক থেকে সভ্য মানুষে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু ভুলে যায়নি তার পূর্বজীবন। তাই বারবার সে ফিরে গিয়েছে সেই পূর্বজীবনে মানবিকতার খাতিরে, অন্যায়ের প্রতিরোধে। টারজানের জীবনের গল্প এগুলি—যে টারজান কল্পনায় জন্ম নিয়েও ভীষণভাবে বাস্তব।

আশা করি, গল্পগুলি কিশোর মনের কাছে গ্রহণীয় হবে তার মেজাজে, রহস্যে আর দুঃসাহসিকতার রোমাঞ্চে। সুখপাঠ্য এই গ্রন্থ রচনায় সুলেখক শ্রীঅজয় দাশগুপ্তের কাছে আমি ঋণী। প্রুফ সংশোধনের কষ্টসাধ্য কাজে সাহায্য করে শ্রীযোগীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী আমাকে আবদ্ধ করেছে কৃতজ্ঞতা পাশে।

প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে শ্রীঅজয় দাস আমাকে করেছেন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শ্রীকাঞ্চন



গরিলা রাজা টারজান

সরকারী নথিপত্রে যাই থাক আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী এক ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের উপর অন্য এক ইয়োরোপীয় শক্তির অত্যাচারের খবর পেয়ে ব্রিটিশ সরকার লর্ড গ্রেস্টোক নামে এক ইংরেজ সামন্তকে যে অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়েছিলেন একথা ঠিক।

তিনি ছিলেন একজন সামরিক অফিসার। বলিষ্ঠ ও পুরুষালী শক্তিসম্পন্ন। সরকারী নির্দেশ পেয়ে তিনি আর দেরি করেননি। আসন্নপ্রসবা তার স্ত্রী অ্যালিসকে নিয়েই তিনি যাত্রা করেছিলেন ডোভার থেকে। একমাস পরে ধরেছিলেন এক জাহাজ। কিন্তু এই যাত্রাই ছিল তাঁদের শেষ যাত্রা। আর ফিরে আসেনি তাঁরা।

তাঁদের যাত্রার ছয়মাস পরে অবশ্য এক ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিল তাঁদের, অ্যাটলান্টিকের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। কিন্তু পায়নি—শুধু সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের উপকূলে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া। অনুসন্ধানের সেখানেই হয়েছিল ইতি।

আসলে সেই জাহাজটা ছিল খুনী ও জলদস্যুতে ভরা। বীভৎস, নিষ্ঠুর সব লোক। যাত্রার কয়েকদিন পরেই তারা জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের লর্ড হত্যা করে গ্রেস্টোক ও তার স্ত্রীকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও গুলি বারুদসহ একটা জঙ্গলঘেরা উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। কোন অনুরোধ, উপরোধই তারা কানে নেয়নি। এই অবস্থায় লর্ড গ্রেস্টোকের করার কিছু ছিল না, শুধু ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া। তার স্ত্রী নিতে না পারলেও তিনি তা নিয়েছিলেনও।

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীকে শান্ত করে চারটে মোটা গাছ দেখে একটা মাচা বানিয়ে তিনি সেদিনের মত আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে। আর তার পরদিন থেকেই লেগে গিয়েছিলেন কাঠ কেটে ঘর বানাতে। বানালেনও তাই, দেড়মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে। তার-পরেই শান্তি। ঘরে আশ্রয় নিয়ে তারপর তিনি মন দিয়েছিলেন শিকারে। শিকার করেন আর বাকি সময়টা কাজে লাগান আর একটা ঘর বানাতে।

এরমধ্যে পরিবেশের সঙ্গেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। অসংখ্য পাখি, বাঁদর ও দূর থেকে একটা কিম্ভূত কিমাকার দৈত্যের মত জন্তু ছাড়া কিছু চোখেও পড়েনি তাদের। দৈত্যটাকে আরও দুবার দেখেছেন, কিন্তু কাছে আসেনি সে। জানেনও না দৈত্যটা কি?

দিন কেটে যায়। একদিন বিকেলবেলা একটা ঘর তৈরি করবেন বলে গাছ কাটছেন লর্ড, হঠাৎ একটা গরিলা এসে তাঁকে আক্রমণ করল। হতভম্ব হয়ে এই প্রথম তিনি দেখলেন দৈত্যটা

আর কিছু নয়, একটা গরিলা। হাতের কাছে রাইফেল ছিল না, আনবারও সময় নেই, অগত্যা চিৎকার করে কুড়াল নিয়েই রুখে দাঁড়ালেন তিনি।

স্ত্রী অ্যালিস একটু দূরেই বসেছিল। স্বামীর চিৎকারে দিশেহারা হয়ে তক্ষুনি সে ছুটে গিয়ে রাইফেল এনে দুম করে চালিয়ে দিল গুলি। গুলি গিয়ে লাগল গরিলাটার পিঠে। এক গুলিতেই গরিলাটা শেষ। অবশ্য সে গুলি খেয়ে অ্যালিসের দিকে ফিরে ছুটেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি তাকে। তার আগেই সব শেষ।

এদিকে অ্যালিস অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। লর্ড তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীর দেহটা সযত্নে ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। দুঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরেছিল তার। আর তারপরেই ঘটল সেই প্রত্যাশিত আবির্ভাব—একটি শিশুর। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল অ্যালিস। মাতৃত্বের গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। কিন্তু পিতা! পিতৃত্বের গর্বের বাইরে দুর্ভাবনায় বিচলিত হয়ে উঠলেন লর্ড।

তবুও রাত কাটে। ভোর হয়। আবার আরম্ভ হয় তাদের দৈনন্দিন জীবন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য—ঠিক একবছর পরে অ্যালিস মারা গেল। অত্যন্ত চুপিসারে। জানতেও পারেননি লর্ড। পরদিন ভোরে উঠে দেখেন শুয়ে আছে অ্যালিস, নিঃশ্বাস নেই। ছেলে কাঁদছে পাশে। সেদিন লর্ড আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিলেন—ছেলে খেতে চাইছে অ্যালিস, বল আমি কি করব? এই কটা কথাই তিনি ডায়েরীতে লিখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। ছেলেরও দুর্ভাগ্য—ঠিক সেদিনই সে তার বাপকেও হারাল একটা ঘটনায়। জানতেও পারল না সে। শুধু কান্নাই ছিল তার সঙ্গী—অসহায় শিশু।

কিছুদিন ধরে গরিলাদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল এ অঞ্চলে। মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে আট দশটা গরিলার একটা দল তোলপাড় করে

বেড়াচ্ছিল এ অঞ্চলটা ! তবে লর্ডের ঘর পর্যন্ত তারা আসেনি। কারণ তাঁর রাইফেলকে গরিলারা ভয় করত।

একদিন কি কারণে সেই গরিলা দলের দলপতি ক্ষেপে গিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছিল। অন্য গরিলাগুলি ভয়ে ছুটাছুটি করছিল এগাছ থেকে ওগাছে। এমন সময় ক্যালি নামে একটা মেয়ে গরিলার হাত থেকে তার বাচ্চাটি পড়ে যায় মাটিতে। ঠিক দলপতির সামনে। বাচ্চাটা অবশ্য বাঁচেনি। কিন্তু ক্যালি তখন মরীয়া হয়ে এক লাফে দলপতির সামনে লাফিয়ে নেমে মরা বাচ্চাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আবার উঠে যায় গাছে। থতমত খেয়ে শান্ত হয় দলপতি। শান্তি নেমে আসে দলটাতে

শান্ত হলে হবে কি? দলপতির মাথায় ঘুরছে তখন রাইফেলটার কথা। সে দেখেছে সাদা বাঁদরটার হাতে এই লাঠিটা থেকে আগুন ও আওয়াজ বেরিয়ে তাদের ঘায়েল করে। লর্ডকে গরিলা ভাষায় তারা সাদা বাঁদরই বলে। তাই সে এটা হাত করতে চলল লর্ডের ঘরের দিকে কয়েকজনকে নিয়ে। তাদের মধ্যে ক্যালিও ছিল একজন। আর তক্ষুনি সে গিয়ে পেয়েও গেল লর্ডকে। চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন তিনি—দরজা খোলা। এই সুযোগে লর্ডের দেহটাকে মাংসপিণ্ড বানাতে কতক্ষণ লাগে তার? আত্ম-রক্ষার এতটুকু সুযোগ পাননি লর্ড। তারপর অ্যালিসের দেহটা একটু নেড়েচেড়ে দলপতি ধরতে গেল শিশুটিকে। কিন্তু মুহূর্তে ক্যালির কি হয়ে গেল—সে লাফিয়ে পড়ে তার মৃত শিশুটাকে ফেলে লর্ডের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে গেল দলপতি। আর তারপরেই তার সব রাগ গিয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটার উপর। ঝট করে রাইফেলটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে ট্রিগারে হাত লাগতেই প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়। রাইফেল হাতে সে ছিটকে পড়ে একধারে। অন্য গরিলাগুলি তো

—ওরে ববাপ্—বলে পড়ে এ ওর ঘাড়ে। তারপরেই এক দৌড়ে সবাই হাওয়া। এবার ভয় লেগে যায় দলপতির। সেও রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালায়।

ক্যালি কিন্তু ততক্ষণে লর্ডের শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে পরে চলে এসেছে আস্তানায়। পরম যত্নে মানবশিশুটিকে সে তার লোমশ বুকে ধরে আদর করতে থাকে।

মায়ের বোধ হয় কোন জাত নেই, নেই পশুত্ব বা মানবত্ব। না হলে একটি গরিলা তার বুকে একটা মানব শিশুকে ধরে আদর করছে মায়ের যত্নে! কাউকে ঘেঁষতেও দিচ্ছে না কাছে! কি জানি, যদি গরিলার কর্কশ হাত লেগে আঘাত লাগে ওই শিশুর!

প্রথম প্রথম সাদা বাঁদরের বাচ্চা বলে আপত্তি করলেও পরে আর কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শুধু ক্যালির স্বামী বলত—ফেলে দাও বাচ্চাটাকে। ক্যালি কানেই নিত না স্বামীর কথা। একদিন দলপতিকে সে বলেই দিয়েছিল তার স্বামী তাকে বিরক্ত করলে সে দল ছেড়ে চলে যাবে। হুঁ, সে চলে যেতে পারে বটে—। তাদের দলে এ নিয়ম আছে। কিন্তু দলপতি তা চায় না। তাই তখনকার মত সে মিটিয়ে দিল ঝগড়াটা।

ক্যালি তখন শান্তিতে শিশুটিকে নিয়ে থাকে। শিশুটির চামড়া সাদা বলে তার নামও দিয়েছে টারজান। টারজান মানে সাদা চামড়া, তাদের ভাষায়।

দিন যায়, মাস গড়িয়ে বছরও চলে যায়। ক্যালির কোলেই বড় হয়ে সে এখন দশ বৎসরের কিশোর। বয়সের দুরন্তপনা এখন তার সর্বাঙ্গে। গরিলার দলে মানুষ হওয়ার ফলে তার সাহস ও শক্তি বেড়ে গেছে অনেক। মানব সমাজের এক পরিপূর্ণ যুবকের শক্তি ধরে সে দেহে। গাছে চড়া, লাফ দেওয়া সব রকম কৌশলই এখন তার আয়ত্বে। ক্যালিই তাকে শিখিয়েছে অতি যত্নে। কিন্তু তার দুঃখ

বাচ্চাটা অন্যান্য গরিলার মত সবল হয়ে উঠেনি এখনও। তার মত বয়সের গরিলার চেহারা প্রকাণ্ড দেখতে। তাই ক্যালি তাকে আগলে আগলেই রাখে। বিশেষ করে তার স্বামীর কাছ থেকে।

আগলে রাখলে হবে কি? সে কি দুরন্তপনা না করে পারে? ছোট ছোট বাচ্চা গরিলাদের সঙ্গে সারাদিনই খেলা করে বেড়ায়। গরিলার দলে মানুষ হলেও তার বুদ্ধিটা তো মানুষের! তাই সে তাদের সঙ্গে খেলা করবার সময় নানা কৌশলে তাদের বিপদেও ফেলে। মজা করে। ঘাস দিয়ে দড়ি বানিয়ে গাছের উপর থেকে তাদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানাটানি করে। সবাই উপভোগ করে। ক্যালির স্বামীর গলায়ও মাঝে মাঝে আটকে দেয় ফাঁস। স্বামী যায় রেগে। সে তখন তাকে ভেংচি কেটে দুয়ো দুয়ো করে। ক্যালির স্বামী তাকে ধরতে পারে না। দলপতির কাছে নালিশ করেও কিছু ফল হয় না। মোটামুটি অন্যরা মেনেই নিয়েছে ক্যালির ছেলে টারজনকে।

এরই মধ্যে একদিন টারজান তার বাবার ঘরের কাছে কয়েকটা গরিলার বাচ্চার সঙ্গে খেলা করতে করতে জল খেতে গিয়ে জলে নিজের চেহারা দেখে চমকে ওঠে—এ কে? আমি! আমি এত সুন্দর দেখতে! পরে তার সঙ্গীদের সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে কেমন যেন গর্ব হতে থাকে তার। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে একটা সিংহ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার এক সঙ্গীর উপর। মুহূর্তে চিৎকার করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে টারজান। অন্য সঙ্গীগুলি পালিয়ে যায়। সাঁতার না জানলেও পশুর প্রবৃত্তিতে হাত পা নেড়ে কোনমতে মাথাটা জাগিয়ে রেখে চিৎকার করতে থাকে সে। তার চিৎকারে অন্য গরিলাগুলি এসে পড়তেই সিংহ চলে যায়। বিপন্মুক্ত হয় সে। কিন্তু এক অদ্ভুত অনুভূতি জেগে ওঠে টারজানের মনে—জলটা এত ঠাণ্ডা!

তার বাবার ঘরটা সে বহুদিন থেকেই দেখেছে দূর থেকে।

কিন্তু কাছে যায়নি। সেদিন কি মনে হতেই দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে বিস্মিত—এত জিনিষ! কক্ষনো দেখেনি সে। প্রথমে তিনটে কঙ্কাল, দুটি বড় একটা ছোট। কিন্তু তাতে ভয় পায়নি সে। কঙ্কাল তো সে কতই দেখেছে। কিন্তু—। জামা কাপড়, বই পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র!

তার বাবার ছুরিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আঙুল কেটে যায় তার। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আবার কুড়িয়ে নেয় সে—কি এটা! সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের তাকে নজর পড়তে ঝটঝট করে বইগুলি নামিয়ে দেখতে থাকে সে। তার মধ্যে একটা ছবির বই পেয়ে তন্ময় হয়ে যায়। কিসের ছবি এগুলি? ট্রেন, মোটর, জাহাজ, নৌকো, মানুষ! আরে এই তো পাখি, সাপ, হাতি! বুঝতে পারছে না সে এগুলি এখানে কেন? নিচে ছোট ছোট অক্ষর—হয়তো এগুলির নাম! হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করল সে অক্ষরগুলি। ছবির ছেলেটিকে দেখে তার লজ্জা লেগে গেল। কি যেন পড়ে আছে সে। কিন্তু তার—! এই তার আরম্ভ হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কাছে শিক্ষার প্রথম পাঠ।

এগুলি দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এলে টারজান বইগুলি গুছিয়ে রেখে বাবার ছুরিটা নিয়ে বেরিয়ে এল দরজা ঠেলে। কিন্তু তারই দুর্ভাগ্য, কয়েক পা এগুতেই শত্রুপক্ষের এক গরিলা এসে আক্রমণ করল তাকে।

প্রথমটা থতমত খেলেও সাহস হারায়নি সে। গরিলা দলে যাবার ফলে শক্তি, সাহস, সংগ্রাম-প্রবণতা ও যুদ্ধ কৌশল বেড়ে গিয়েছিল তার বয়সের অনুপাতে।

সেও রুখে দাঁড়াল ছুরি হাতে। কিন্তু এতটুকু ছেলে এতবড় প্রকাণ্ড গরিলার সঙ্গে কি পারে! ঝট করে গরিলাটা তার ঘাড়ে কামড়ে দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে খপ করে বসিয়ে দিল ছুরি তার বুকে। ভীষণ চিৎকার করে উঠল গরিলাটা। সে আবার তাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতেই টারজান আবার বসিয়ে দিল হাতের

ছুরি পেটে, গলায় বুকে। ভীষণ চিৎকার করে পড়ে যায় গরিলাটা, আর ওঠে না। আহত টারজানও চিৎকার করে যন্ত্রণায়।

তার চিৎকার শুনে ক্যালিই তাকে তুলে নিয়ে আসে আস্তানায়। আর তারপর তার কি সেবা! কে বলবে সে তার আপন মা নয়! দিনরাত বসে থাকে তার কাছে।

একমাস পরে সুস্থ হয়ে টারজানের প্রথমেই মনে পড়ল ছুরিটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার ঘরটার কথা—বইগুলির কথা।

লড়াইয়ের জায়গাতেই সে পেয়ে যায় ছুরিটা। তারপর ছুরিটা হাতে নিয়েই ঢুকে যায় ঘরে। আবার আরম্ভ হয় পাঠ। এভাবে যখনই সুযোগ পায় সে এখানে এসে বই পড়ে. উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু অক্ষরগুলি চেনা হয়ে যায় তার।

দিন যায়। টারজন এখন সতের বছরের জোয়ান। দেহের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে সাহস, বেড়েছে বুদ্ধি। গরিলা দলের সবাই একটু সমীহও করে চলে তাকে। বুঝতে পারে না, তাদের থেকে ছোট হয়েও সাদা বাঁদরটা কি করে নাজেহাল করে তাদের।

এর মধ্যে আরেকটা ঘটনায় তাদের ভয় বেড়ে গেল আরও।

সেদিন কি একটা কারণে গরিলারা হৈ হুল্লোড় করছিল। হঠাৎ ক্যালির স্বামী আক্রমণ করে তাকে। কিন্তু টারজান অনেক বেশি তৎপর। সে ঝট করে একটা গাছে লাফিয়ে উঠে ভেংচাতে থাকে তাকে। তাতে ক্যালির স্বামী আরও রেগে গিয়ে সামনে ক্যালিকে পেয়ে তাকেই আক্রমণ করে। রেগে যায় টারজানও। কি? আমি থাকতে মাকে আক্রমণ? সে ঝট করে নেমে দাঁড়িয়ে গরিলাটাকে রুখে দাঁড়ায়। তখন গরিলাটা তাকে আক্রমণ করতেই সে পাশ কাটিয়ে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দেয় তার বুকে। তারপর আবার, আবার। কিছু বোঝবার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় গরিলাটা। আর ওঠে না। তখন টারজান গরিলাটার দেহের উপর পা তুলে বুক চাপড়ে গর্জন করে বলে—দেখ, আমি টারজান।

তোমাদের সবার থেকে শক্তিশালী। এখন থেকে আমার মা ক্যালি ও আমাকে মান্য করে চলবে।



এরপর আর একদিন একটা সিংহ মারল টারজান। তাতে সবাই ভয় করতে লাগল টারজানকে। যদিও দলপতি ক্ষুব্ধ হয়েই রইল।

নিরুপদ্রবেই দিন কেটে চলে টারজানের। সতের থেকে আঠারোর পড়ে আরও জোয়ান হয়েছে সে।

এরই মধ্যে একদিন এক নরখাদক নিগ্রো জংলী তার মা ক্যালিকে বর্শার ঘায়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সেদিন টারজান কাছে ছিল না। পরে এসে শুনে তক্ষুনি ছুটে চলল লোকটার সন্ধানে। যেতে যেতে পেয়েও যায় সে লোকটাকে। জীবনে এই প্রথম টারজান মানুষ দেখল। বিস্মিত হয়ে সে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে গাছের উপর থেকে। হঠাৎ দেখে লোকটা একটা ধনুকে তীর লাগিয়ে ছুঁড়ে দিল একটা শুয়োরের দিকে। তীরের ঘায়ে ছটফট করতে করতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল শুয়োরটা। আরও বিস্মিত টারজান! এ কি! এতটুকু ছোট্ট তীরটার ঘায়ে শুয়োরটা—! না কি—! মানুষের বুদ্ধিই তো টারজানের। বুঝল তীরটায় কিছু মাখানো আছে।

তারপর লোকটা খানিকটা শুয়োরের মাংস ঝলসে খেয়ে চলে গেল। ক্ষিদে পেয়েছিল টারজানেরও। সেও তাড়াতাড়ি নেমে এসে খানিকটা মাংস কাঁচাই খেয়ে আবার ছুটল তার পেছনে। গাছের ডালে লাফাতে লাফাতে। জানতেও পারল না লোকটা।

গ্রামের কাছে এসেই লোকটাকে হত্যা করে তার হরিণের ছালের পোশাকটা পরে ফেলে টারজান। তারপর এক ফাঁকে গ্রামে ঢুকে একটা ধনুক, কতগুলি তীর, একটা বর্শা নিয়ে, কয়েকটা ঘর তছনছ করে ফিরে আসে আস্তানায়।

এর পর আরও দু'একবার গ্রামে হানা দিয়ে তীর নিয়ে এসেছিল টারজান। তাতে গ্রামবাসীরা ভাবত বনদেবতা রুষ্ট হয়েছেন। তাই তারা তারপর থেকে বনদেবতাকে তুষ্ট করতে একটা গাছের নিচে কিছু তীর ও খাবার রেখে দিত বনদেবতার উদ্দেশ্যে। টারজান নিয়ে আসত তীরগুলি। আর তাদের মত তীর ছুঁড়তেও শিখে ফেলেছিল।

সন্ধে হয়ে গেছে ততক্ষণে। আস্তানায় ফিরেই টারজান তার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বলতে লাগল। টারজানকে নতুন

পোষাকে দেখে গরিলারা স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল তার কথা। কিন্তু দলপতির আর সহ্য হল না। সে ঝট করে আক্রমণ করে বসল তাকে। কিন্তু টারজানও ছেড়ে দেবার পাত্র না। লেগে গেল যুদ্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সবাই। এক ফাঁকে টারজানও তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল দলপতির বুকে। এই শেষ। দলপতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। তখন টারজান গরিলার মত বুক চাপড়ে একটা পা দলপতির দেহের উপর রেখে চিৎকার করে বলতে থাকে —দেখে যাও সব, আমি দলপতি। সবাই মান্য করে চলবে আমাকে। গরিলারা ভয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মেনে নেয় তাকে। কিন্তু একটা গরিলা ছাড়া। সে ক্ষুব্ধ হয়েই রইল।

এভাবেই টারজান তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল একই দিনে। সে জানতেও পারল না।

দলপতি হল বটে টারজান, কিন্তু কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। সে বুঝতে পারে গরিলাদের সঙ্গে তার প্রভেদ আছে, কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারে না। তাই সে দলপতি হলেও দলের সঙ্গে থাকে না। দলের দু'একটা ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেয় আর ঘুরে বেড়ায়। বাবার ঘরে গিয়ে বই পড়ে, জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করে। এখন সে সেই বইটা গড়গড় করে পড়তে পারে; লিখতেও পারে।

সেদিনও সে বাবার ঘরে গিয়ে বই ঘাঁটাঘাঁটি করছে, হঠাৎ তার ভেঁতরে একটা ঢাকনা দেওয়া একটা ছোট বাক্স পেয়ে যায় সে। বাক্সটা খুলে আশ্চর্য হয়ে দেখে একটা ছবি, একটা ছোট বই, আর হীরের লকেট দেওয়া একটা সোনার হার। বুঝতে পারে না সে এগুলি কি? সে তো আর জানে না, ছবিটা বইটা ডায়েরীটা তার বাবার, আর হারটা মায়ের। কি মনে করে হারটা গলায় পরে ডায়েরীটা খুলে দেখতে থাকে সে। অক্ষরগুলি যেন চেনা চেনা, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না।

এগুলি দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এসেছে। হঠাৎ গরিলাদের

চিৎকারে সচকিত হয়ে টারজান লাফিয়ে চলে আসে আস্তানায়। এসে দেখে সেই গরিলাটা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে। প্রচণ্ড রেগে টারজান চিৎকার করে উঠতেই গরিলাটা ঝট করে করে তাকে আক্রমণ করে। সেও হঠবার পাত্র নয়। তক্ষুণি প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে দেয় তার চোয়ালে। কিন্তু গরিলা তো, ঘুঁষিতে তার কি হবে? সে তার ঘাড় কামড়ে দেয়। লেগে যায় তুমুল যুদ্ধ। এক ফাঁকে টারজান গরিলাটার ঘাড় ধরে তার বুকে ছুরি বসাতে গিয়ে থমকে যায়। ভাবে তাকে মেরে কি লাভ? আমি দলপতি হলেও আর ভাল লাগে না। বরং সে শক্তিমান—দলপতি হতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুরিটা কোমরে গুঁজে আরও জোরে জাপটে ধরে তার ঘাড়টা। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে গরিলা। আর টারজান বলে—কি কেমন বুঝছ? বল, হার মানছ তবে ছেড়ে দেব।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে গরিলাটা বলে—হ্যাঁ, মানছি।

কিন্তু তবুও টারজান তাকে মুক্তি দেয় না। বলে—শোন! আমি টারজান, সব চেয়ে শক্তিশালী। দলের সবাই শুনছে। এবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আর কখনো কারোর সঙ্গে ঝগড়া করবে না। না হলে পরের বার বিপদ হবে।

গরিলাটা টারজানের কথা মেনে নেয়। সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় সেখান থেকে।

তারপর থেকে টারজান একা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে গিয়ে বই পড়ে।

সেদিনও সে যাচ্ছিল বই পড়তে। গাছ থেকে নামেনি তখনো। হঠাৎ দেখে কতগুলি লোক ঘরটার পাশে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। সমুদ্রে একটা জাহাজ। জাহাজ সে চেনে। ছবিতে দেখেছে। কিন্তু কোত্থেকে এল তারা!

ঝগড়া করতে করতে একটা ইঁদুরমুখো লোক হঠাৎ একটা দৈত্যের মত লোককে গুলি করল। পড়ে গেল লোকটা। আর উঠল না।

টারজান বিস্মিত—আরে লোকগুলি তো ভাল না।

একটু পরে লোকগুলি চলে যেতেই টারজান লাফিয়ে নেমে ঘরে ঢুকেই প্রচণ্ড রেগে গেল। তার জিনিসপত্র এলোমেলো! তক্ষুনি সে একটা কাগজে পেন্সিলে আঁকাবাঁকা অক্ষরে কি লিখে দরজায় টাঙিয়ে, ছোট বাক্সটা, একটা বর্শা ও কতগুলি তীর নিয়ে আবার গাছে উঠে বসে রইল।

একটু পরে আরো পাঁচজনকে মালপত্র সমেত নিয়ে এল লোকগুলি। এরা কারা? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল টারজান। এই পাঁচজন ছাড়া অন্য লোকগুলি ভাল না সে বুঝে ফেলল তার বনচারী দৃষ্টিতে। সে তো আর জানে না যে তারই খুড়তুতো ভাই, অধ্যাপক পোর্টার, তার সহকারী, অধ্যাপকের মেয়ে জেনী ও তার নিগ্রো পরিচারিকাকে বনবাসে দিয়ে গেল লোকগুলি অধ্যাপকের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। মেয়ে দুটিকে ভাল লাগল টারজানের, বিশেষ করে সাদাটাকে। কিন্তু—। এবার আরও সতর্ক টারজান।

এর মধ্যে নাবিকগুলি মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল দরজার উপরে কাগজটা দেখে। কি এটা? ইঁদুরমুখো চিৎকার করে উঠল—ও পোর্টার মশাই! এটা কি পড়ুন তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা। বলে অধ্যাপক কাগজটা পড়লেন—

এই বাড়ি টারজানের। টারজান বহু কালা মানুষ ও পশু হত্যা করেছে। তার জিনিস নষ্ট করবে না। সে লক্ষ্য করছে।—গরিলা রাজা টারজান।

—কে, কে এই শয়তান টারজান? হুঁ! বলে অধ্যাপকের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ইঁদুরমুখোটা ফেলে দিল।

অধ্যাপক বললেন,—তা তো জানি না।

—ধ্যুৎ—অপদার্থ কোথাকার! কিছুই জানে না। ধমকে উঠল ইঁদুরমুখোটা।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল তার ভাই—এই, এই মুখ সামলে কথা বল, কাপুরুষ কোথাকার! বলে সে পিছন ফিরল।

টারজান কিন্তু এবার আরও সতর্ক হয়ে বসে আছে। কারণ সে দেখেছে ইঁদুরমুখোটা একটা লোককে পেছন থেকে গুলি করেছে। এবারও যদি করে?

এই সুযোগ কি আর ইঁদুরমুখো ছাড়ে। তার ভাই পেছন ফিরতেই ঝট করে সে রিভলবার বার করল। আর তক্ষুনি কোত্থেকে সাঁই করে টারজানের বর্শাটা বিঁধল তার কাঁধে। —ও-ব্বাপ্—বলে ধপাস করে সে পড়ে গেল মাটিতে।

ভয়ে ঘাবড়ে গেল সবাই। বুঝল টারজানই মেরেছে।

এরপর আর কি নাবিকগুলি এখানে থাকে? ঝট করে ইঁদুরমুখোকে কাঁধে তুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল তারা জাহাজে।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ। যাকে নিয়ে এই ঘটনা সেই অধ্যাপক ও তাঁর সহকারীকে কোথাও দেখা গেল না।

জেনী তো কেঁদেই দিল।

তার ভাই তাড়াতাড়ি বলল,—আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। যাবে আর কোথায়? তোমার আত্মভোলা বাবাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। ভেবো না, আমাকে যখন টারজান এভাবে রক্ষা করেছে তখন আমি বাজী রেখে বলতে পারি সে আমাদের বন্ধু। তোমরা ঘরে গিয়ে আগল লাগিয়ে বস। আমি যাচ্ছি খুঁজতে। বলে সে নিজের রিভলবারটা জেনীর হাতে গুঁজে দিয়ে মাটি থেকে বর্শাটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল জঙ্গলে।

জঙ্গলে ছুটলে কি হবে? সে কি আর পথ চেনে? বরং নিজেই যে কখন পথ হারিয়ে ফেলেছে সে নিজেই জানে না। জানে না টারজান যে তাকে অনুসরণ করে চলেছে গাছের ডালে ডালে। যেতে যেতে হঠাৎ টারজান দেখল একটা চিতাবাঘ ওৎ পেতেছে। তার ভাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। আর সে দেরি করতে

পারল না। হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার করে উঠল গরিলার মতো। পালিয়ে গেল চিতাবাঘটা।

"ওরে-ব্বাপ" বলে ধপাস করে পড়ে গেল তার ভাই। এমন চিৎকার জীবনেও শোনেনি সে। সে ভীরু নয়, একটু ধাতস্থ হয়ে আবার চলল সে। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই একটা সিংহ গর্জন করে উঠল তার সামনে। ঝট করে মাটিতে শুয়ে পড়ল সে। আর তক্ষুনি টারজান গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল সিংহের পিঠে। তারপর তুমুল যুদ্ধের পর সিংহটাকে ঘায়েল করে মুখোমুখি দাঁড়াল তার ভাইয়ের।

তার ভাই কিছু বলবে কি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সুঠাম, সুপুরুষ, পরনে হরিণের ছাল, গায়ে ও পায়ে আদিম অধিবাসীদের মতো গয়না, গলায় সোনার হার, হীরের লকেট—হাতে ছুরি।

সে কিছু বলার আগেই টারজান ইশারা করল তাকে অনুসরণ করবার জন্য। কিন্তু তার ভাই ভাবতে লাগল, এ কে? এই কি গরিলা রাজা টারজান! তাকে অনুসরণ করা কি ঠিক হবে? রাজি হল না সে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অন্যদিকে পা বাড়াতেই ঝপ করে টারজান তার কলার ধরে টেনে নিয়ে চলল।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে—গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে টারজান কান পেতে কি শুনে তার ভাইকে কাঁধে তুলে লাফিয়ে গাছে উঠে ডালে ডালে লাফিয়ে চলতে লাগল! আতঙ্কে চিৎকার করে চোখ বুজে টারজানকে আঁকড়ে ধরে রইল সে। বাপের জন্মেও সে দেখেনি একটা লোক এভাবে গাছের ডালে লাফাতে পারে!

একটু পরে ঘরের কাছে এসে তার ভাই দেখে আর এক বিপদ। একটা সিংহ জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকছে। কিন্তু ততক্ষণে টারজান রাগে সিংহের কেশর ধরে উল্টে ফেলে দিয়েছে তাকে। তারপর

আরম্ভ হল সিংহ ও মানুষে মরণপণ লড়াই। মানুষই জয়ী হল শেষে। ছুরির ঘায়ে নেতিয়ে পড়ে গেল সিংহটা। সঙ্গে সঙ্গে টারজানের বিকট বিজয় উল্লাসে বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায় তার ভাইয়ের। ডুকরে কেঁদে ওঠে মেয়ে দুইজন, ঘরের ভিতর।

চিৎকার করে ওঠে টারজানের ভাই—জেনী, জেনী কেঁদো না। আমি এসেছি। দরজা খোল। সিংহটা—।

—তুমি এসেছ! বলে দরজা খুলে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনী।—এই চিৎকারটা—!

—ভয় নেই জেনী—এই আমাদের রক্ষা করেছে—আমাদের বন্ধু—এই তো দাঁড়িয়ে—বলেই থেমে গেল টারজানের ভাই। তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

টারজান ততক্ষণে চলে গেছে অধ্যাপকের খোঁজে। পথঘাট তো তার চেনা। পেয়েও গেল সে তাদের। তারা তখন পথ হারিয়ে সমুদ্রের উপকূলে একটা খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। কি যে বলছেন কিছুই বুঝতে পারছে না টারজান।

সহকারী বললেন—মুরদের জ্ঞান-বিজ্ঞানই ছিল উন্নত। অথচ—।

বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক বললেন—কি যে বল, আরবীয়েরা না থাকলে—।

হঠাৎ কিসের একটা খসখস আওয়াজ শুনে সহকারী বললেন—প্রোফেসার, কে যেন আসছে।

—ধ্যেৎ। আত্মভোলা অধ্যাপক বললেন—এ জন্যই বলি উপযুক্ত মনসংযোগ না থাকলে কিছুই করতে পারবে না। অথচ চাঁদনী রাত, একটা চতুষ্পদের ভয়ে—একটু সৌজন্যবোধ নেই—আলোচনাটা—

সহকারী বাধা দিয়ে বললেন—প্রোফেসর—আমার মনে, হচ্ছে একটা সিংহ —।

—সিংহ! এখানে সিংহ আসবে কোত্থেকে?

—আজ্ঞে। ঢোঁক গিলে সহকারী বললেন—আজ্ঞে এসেছে।

—বেশ, তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম এসেছে। কিন্তু এখানে এসে সে করবে কি? অভদ্রতা হবে না?

—অজ্ঞে ভদ্রতা বোধহয় সিংহটা জানে না। বলে সহকারী অধ্যাপকের হাত ধরে পিছোতে পিছোতে বললেন—ঐ দেখুন।

—এ্যাঁ! অধ্যাপক তাকিয়ে সিংহটাকে দেখে বললেন—তাই তো, ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। তুমি নোট করে নাও। কালকেই চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষকে লিখতে হবে, এভাবে সিংহ ছেড়ে রাখা ভারী অন্যায়।

—আজ্ঞে, তা নয়ত জানাবেন। কিন্তু আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তত তাড়াতাড়িই ছুটে যাওয়াই ভাল। বলে সহকারী অধ্যাপকের হাত ধরে ছুটতে লাগলেন।

ছুটলেন অধ্যাপকও। কিন্তু তিনি একটু ছুটেই হঠাৎ সহকারীর হাত ছাড়িয়ে বলে উঠলেন—থামো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমাদের মত শিক্ষিত লোকের এভাবে ছোটাটা ভাল নয়। কেউ দেখে ফেললে—

সহকারী ছুটতে ছুটতেই বিরক্ত হয়ে বললেন—আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধব কেউ দেখবে না, তবে সিংহটা দেখছে। বলে পিছন ফিরে দেখেন সিংহটা আস্তে আস্তেই তাদের অনুসরণ করছে।

টারজান বুঝল সিংহটার পেট ভর্তি। তাই তাদের ধরতে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু ছেড়েও দিচ্ছে না। হয়ত পরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সে নিজেও তাদের অনুসরণ করে চলল।

সিংহটাকে আসতে দেখে অধ্যাপকেরও ভয় লেগে গেল। তিনি তখন আর কথা না বাড়িয়ে ছুটলেন সহকারীর পিছনে।

তারাও ছোটে, সিংহও ছোটে। কিন্তু একটু পরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে টারজান ঝট করে তাদের দুজনকেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসিয়ে দিল। নিচে সিংহটা গর্জন করে উঠল।

নিচের দিকে তাকিয়ে সিংহটাকে দেখে অধ্যাপক বললেন—সময়-মতো তুমি যে আমাকে তুলে নিলে তার জন্য ধন্যবাদ।

—প্রোফেসার! আমি তো আপনাকে তুলিনি। আমাকেও কে যে তুলেছে জানি না। বোধহয় এই গাছেই কেউ আছে।

—তবে তো তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

এদিকে শিকার হারিয়ে সিংহটা গর্জন আরম্ভ করেছে দেখে প্রচণ্ড রাগে টারজান গরিলাদের মতো বিকট চিৎকার করে উঠল। সিংহ এ ডাক চেনে। সে তক্ষুনি লেজ তুলে হাওয়া। কিন্তু এদিকে হল আর এক কাণ্ড। টারজানের বিকট চিৎকারে থতমত খেয়ে অধ্যাপক ও সহকারী দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে ধুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

ভাগ্যিস খুব উঁচু থেকে পড়েননি তাঁরা। কিছুই হয় নি তাঁদের। কিন্তু কিছুক্ষণ তাদের আর কোনো সাড়া নেই।

একটু পরে সহকারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—প্রোফেসার উঠুন।

অধ্যাপক বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি বেঁচে আছি কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। হাত-পাগুলি বোধহয় আস্তই আছে, কি বল? বলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক।—আচ্ছা, কি হল বলতো?

—আজ্ঞে, আমিও তো ঠিক—বলতেই সহকারী তাকিয়ে দেখেন সামনে টারজান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন—এই যে অধ্যাপক—এর কথাই বলছিলাম আমরা।

—কে? বলেই টারজানের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন—এর কথা? কি সুপুরুষ দেখতে, তাই না? বলে টারজানের দিকে ফিরে বললেন—গুড ইভিনিং স্যার।

কিন্তু টারজান অতশত জানেও না, বোঝেও না। সে তাদের ইশারা করল তাঁর সঙ্গে যেতে। সহকারী বললেন—প্রোফেসার, ইনি আমাদের তাঁর সঙ্গে যেতে বলছেন।—এঁরা বনচারী, পথঘাট সবই চেনেন, আসুন যাই।

বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক বললেন—কি যে বল। এই বললে দক্ষিণে যেতে হবে, এখন বলছ এর সঙ্গে যেতে। না, না, ভাল কথা না। সিদ্ধান্ত নিলে আমি একচুলও নড়ি না। এস—। বলে অধ্যাপক অন্যদিকে যেতে উদ্যত হতেই টারজান কোমড় থেকে দড়ি নিয়ে দুটো ফাঁস তাঁদের দুজনের গলায় দিয়ে টেনে নিয়ে চলল।

অগত্যা যেতেই হল তাঁদের।

ঘরের কাছে এনে টারজন তাঁদের ছেড়ে দিলে তাঁরা ছুটে চলে গেলেন ঘরে। তাঁদের পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা। সহকারী সবিস্তারে বর্ণনা করল ঘটনাটা।

পরিচারিকা বলল—আমার মনে হচ্ছে, ও দেবদূত।

বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক বললেন—দেবদূত না ছাই। তাহলে কখনও সে আমাদের মতো পণ্ডিত, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের গলায় দড়ি দিয়ে গরুর মত টেনে আনে?

সারাদিন দুর্ভাবনায় কাটলেও রাত্তিরটা তাদের ভালই কাটে।

পরদিন ভোরবেলায় কখন যে টারজান এসে তাদের লক্ষ্য করছে তা তারা জানতেই পারেনি। তারা তখন কঙ্কালগুলি নিয়ে ব্যস্ত। একটা কঙ্কালের হাতে গ্রেস্টোক লেখা আংটি পেয়ে তারা বুঝল লর্ড গ্রেস্টোক এখানে এসে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়টি তাঁর স্ত্রীর। কিন্তু ছোটটা নিয়ে একটা খটকা লেগেই রইল।

সে যাহোক এগুলি সমাহিত করতে দেখে টারজান বিস্মিত। লোকগুলি কি বোকা! এগুলি আবার কেউ এভাবে রাখে! ঠিক তখনি জাহাজটা চলে যাচ্ছে দেখে সে ছুটল তাদের পেছনে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পেয়েও গেল তাদের। তারা জঙ্গলে নেমে এসে একটা সিন্দুক লুকিয়ে রাখছে দেখে বিস্মিত হয়ে লুকিয়েই রইল সে। একটু পরে তারা চলে গেলে সে সিন্দুকটা তুলে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল গরিলাদের আস্তানায়।

তার বাবার ঘরে যে লোকগুলি থাকে তাদের ভাল লেগে গিয়েছিল

টারজানের। বিশেষ করে সাদা মেয়েটাকে। কি সুন্দর দেখতে। তাই যখনই সময় পায় সে ছুটে যায় ঘরের কাছে। কিন্তু আজ সেই সকাল থেকে—। সে কাজটাজ সেরে তক্ষুনি ছুটল মেয়েটাকে দেখতে।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তখন। চুপিচুপি সে গিয়ে দেখে সেই সাদা মেয়েটা আলো জ্বালিয়ে একটা কাগজে কি লিখছে। আর সবাই রয়েছে ঘুমিয়ে। আলো সে এই প্রথম দেখল। লণ্ঠনটা তো কতদিন দেখেছে। কিন্তু এটাকে এভাবে জ্বালানো যায়! বিস্মিত হয়ে একটু এগিয়ে গেল সে জানালার ধারে। কিন্তু বেশি গেল না। যদি ভয় পায় মেয়েটি। কি লিখছে মেয়েটি? দেখার কৌতূহল হল তার। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। চুপ করে একধারে দাঁড়িয়েই রইল। একটু পরে ফস করে আলো নিভিয়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়তেই টারজান দেখল, এই সুযোগ। সে চট করে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়েই দে ছুট।

সেদিন রাত্রে তার কেমন কেটেছে সে জানে না। বুঝতে পারেনি কেন যে তার ঘুম আসেনি অনেকক্ষণ। পরে অবশ্য ঘুমিয়েই পড়েছিল সে।

কিন্তু সকালবেলা উঠেই সে নিয়ে বসেছিল কাগজটা। কি লিখেছে মেয়েটা! অক্ষরগুলি চেনা, কিন্তু—। অনেকক্ষণ পরে সে বুঝতে পারল সব। বুঝতে পারল, একটা চিঠি—এবং কাকে লিখেছে। চিঠিতে আছে কিভাবে অধ্যাপক সিন্দুকটা উদ্ধার করেছে তার কথা। কিন্তু এটাই খারাপ লোকগুলি লুণ্ঠন করে তাদের এখানে ফেলে দিয়ে যায়। রাগে টারজানের দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল। গুলি নেই। কি করে শিকার করবে তারা? গর্জন করে উঠল টারজান, আমি থাকতে তোমাদের ভাবনা কি? সে টারজানকে দেখেনি—গরিলা রাজা টারজান। সে-ই তার বাবা ও তার ভাইকে রক্ষা করেছে।

পড়ে খুব মজা লাগল তার। তার বাবার একটা পেন্সিল এনেছিল ছোট বাক্সটাতে। সে তাড়াতাড়ি সেটা বের করে কাগজের একটা কোণায় 'আমিই গরিলা রাজা টারজান' কথাটা লিখে রাত্রিতে দিয়ে এল।

পরদিন চিঠিটা পেয়ে জেনী খুব খুশি। সবাইকে সে দেখালও চিঠিটা। তাতে আর যাই হোক টারজান যে তাদের বন্ধু সে সম্বন্ধে তাদের আর সন্দেহ রইল না।

দিন চলে যায়। টারজান ঘোর প্যাঁচ বোঝে না। রোজই সে কিছু না কিছু শিকার করে দিয়ে আসে তাদের। কিন্তু দেখা দেয় না। একদিন সে সোজা গিয়ে হাজির। জেনীর সঙ্গে সে দেখা করবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, কাউকে পেল না সে। সে তো আর জানে না, রোজকার মত তার ভাই বসে থাকে সমুদ্রের ধারে জাহাজের আশায়। অধ্যাপক চলে যান সহকারীকে নিয়ে আলোচনা করতে। আর জেনী পরিচারিকাকে নিয়ে যায় ফল কুড়োতে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কাউকে না পেয়ে টারজান চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার পরিচিত গরিলার গর্জন ও একটা মেয়ের আর্ত চিৎকার শুনে সচকিত হয়ে ওঠে সে। তবে কি জেনী বিপদে পড়েছে? এক লাফে সে ছিটকে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে আর্ত স্বর লক্ষ্য করে। হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। জেনীই। যে গরিলাটাকে সে দলের ভার দিয়ে এসেছিল, সে-ই জেনীকে নিয়ে পালাচ্ছে।

রাগে চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল টারজান তার সামনে। গরিলাটাও কম যায় না। জেনীকে নামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে টারজানের উপর। লেগে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। টারজানই জয়ী হল।

জেনী ততক্ষণে মাটিতে পড়ে আছে অচেতন হয়ে। মুখে কোনো ভাষা নেই টারজানের। কিন্তু মনের আবেগে সে জেনীর দেহটা অতি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে গেল গরিলাদের আস্তানায়। ঘাসের

বিছানায় শুইয়ে বসে রইল সারারাত। জানে না সে কি করে জাগাবে জেনীকে।

সেদিন রাতে জাগেনি জেনী। জেগেছিল তার পরদিন ভোরে। জেগে সে প্রথমেই দেখেছিল টারজানকে। কিন্তু তার ভয় হয়নি। তার আশ্রয়ে নিরাপত্তাবোধ জেগে উঠেছিল।

টারজান তাকে গাছ থেকে ফল পেড়ে খাইয়েছিল। নিজেও খেয়েছিল তার পাশে বসে। তাতে তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল আরও। জেনী বুঝেছিল, এই সেই গরিলা রাজা টারজান, সুন্দর, সুপুরুষ, যে তার বাবা ও ভাইকে রক্ষা করেছিল এবং তাকেও তো করেছে।

টারজানের মনোজগৎও উত্তাল হয়ে উঠেছিল জেনীকে পেয়ে। সে-ই তো তাকে দেখিয়েছে তার গলায় হাড়ের লকেটে দুটো ছবি—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোকের। ঠিক তার তুলে রাখা ডায়েরীর সঙ্গে পাওয়া ছবির মত।

জেনী বুঝেছিল এই ছবি দুটো লর্ড গ্রেস্টোক ও লেডি অ্যালিসের। তবে কি টারজান তাদের ছেলে! কিন্তু—!

জেনীর দেখাদেখি টারজানও লকেটটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে ঝপ করে তাকে কাঁধে তুলে আবার ছুটল গাছের ডালে ডালে। এবার ভয় লাগেনি জেনীর। বুঝল সে তাকে নিরাপদেই রাখতে চায়। কিন্তু সে বিস্মিত—এভাবে একটা মানুষ গাছের ডালে লাফাতে পারে! চোখ বুজে আঁকড়ে ধরে রাখল সে টারজানকে।

তাদের ঘরের কাছ থেকে গরিলাদের আস্তানা ছিল অনেকদূর গভীর বনে। জেনীকে কাঁধে নিয়ে সেখানে পৌঁছুতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে গেল টারজানের। পরিশ্রান্ত টারজান তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু জেনীর মুখে হাসি কই? কেমন অসহায়ের দৃষ্টিতে টারজানের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল জেনী—আবার এস।

কি বুঝল টারজান কে জানে! হাসতে হাসতেই সে ফিরে চলে গেল গভীর বনের দিকে।

একটু গিয়েই একটা গুলির আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে উঠল সে। বুঝল নরখাদক জংলী লোকদের গ্রামের দিক থেকেই এসেছে শব্দটা। তবে কি কাউকে ধরে এনেছে তারা, খাবে বলে! সে জানতো মাঝে মাঝেই তারা উত্তর থেকে বিদেশীদের ধরে আনে। রাগে গর্জন করে ছুটল টারজান শব্দ লক্ষ্য করে।

জেনী হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে এদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

এক ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ সেই দস্যু জাহাজটাকে মাঝ সমুদ্রে টালমাটাল অবস্থায় ধরে দেখে জাহাজের বেশীর ভাগ নাবিকই আর বেঁচে নেই। যে কয়জন আছে তারাও ভীষণ আহত আর অসুস্থ। তাদের জবানবন্দী অনুসারেই তারা এদিকে এসে টারজানের ভাইয়ের নির্দেশ পেয়ে এখানে নোঙর করে পরে এসে জানতে পারে জেনীর কথা। জাহাজের কম্যাণ্ডার তখন একদল সৈন্য দিয়ে দুইজন লেফট্যানাণ্টকে পাঠান জঙ্গল খুঁজে দেখতে। তারা জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজেও জেনীকে পায় না। বরং নরখাদকদের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসে। দার্নো নামে একজন লেফট্যানাণ্টকে নরখাদকেরা ধরে নিয়ে চলে যায়। কিছুতেই তারা তাকে রক্ষা করতে পারেনি। এদিকে সন্ধে হয়ে এসেছে বলে তারা ফিরে এসে পেয়ে যায় জেনীকে। তখন তারা পরের দিন দার্নোর খোঁজে যাবে বলে ঠিক করে সেদিনকার মতো জাহাজে চলে যায়।

এদিকে টারজান গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে নরখাদকদের গ্রামে গিয়ে দেখে, যা ভেবেছে তাই। তারা একজন শ্বেতাঙ্গকে খুঁটিতে বেঁধে উন্মত্ত নৃত্যে ব্যস্ত। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত তার। টারজান জানে নাচ শেষ হলেই তারা মেরে ফেলবে তাকে।

রক্ত চড়ে গেল টারজানের মাথায়। সে তক্ষুনি এক লাফে

নরখাদকদের মাথার উপরের গাছটাতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা দড়ির ফাঁসে একটা লোককে হ্যাঁচকা মেরে তুলে নিয়েই মারল এক আছাড় তাদের সামনে।

নিশুতি রাত। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল তাদের নাচ, এবং তক্ষুনি বনদেবতার আক্রোশ ভেবে মশাল, অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে দিয়ে দুদ্দাড় করে পালিয়ে বাঁচল তারা।

বেঁচে গেল দার্নো। টারজান তাকে নিয়ে চলে এল তার নিজের আস্তানায়। দার্নো তখন অচেতন।

সেদিন রাত তো গেলই, কেটে গেল আরও অনেকদিন। দার্নো তখন একটু সুস্থ। কিন্তু সে ভাবে, এ কোথায় এল সে? এই লোকটিই বা কে? সে যেই হোক তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তার। কিন্তু একটা দুঃখ দার্নোর, লোকটা কথা বলে না। পারে না! দিনে দিনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করল তাকে। সেদিন টারজান একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে লিখে জানিয়েছিল—আমি লিখতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না। লিখেই সে দার্নোকে জানাল অনেক কথা। দেখিয়েছিল তার বাবার ডায়েরীটা। ডায়েরীটা দেখেই খটকা লেগেছিল দার্নোর। বিশেষ করে একটি বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ যে পাতাটায় রয়েছে সেই পাতার লেখা পড়ে। লর্ড গ্রেস্টোক লিখেছেন—আমার ছেলের হাতের ছাপ। তবে কি সে লর্ড গ্রেস্টোকের ছেলে!

লিখে লিখেই টারজান দার্নোকে জানাল কে নিয়ে গিয়েছিল জেনীকে, কি করে সে তাকে উদ্ধার করে দিয়ে এসেছে।

দিনে দিনে টারজান হয়ে উঠেছে দার্নোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন সে লিখল—তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। আমি কিভাবে তোমার ঋণ শোধ করব?

টারজান লিখল—তুমি আমাকে ভাষা শিখিয়ে দাও।

সেদিন থেকেই দার্নো তাকে ফরাসী ভাষা শেখাতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন যেতে না যেতেই টারজানও শিখে ফেলল দু'একটা কথা।

দার্নো আরেকটু সুস্থ হলে টারজান জানাল—এখন তুমি একটু সুস্থ হয়েছ। আমি তোমাকে ঘরে রেখে আসতে চাই। তুমি যাবে ?

—কি করে নেবে তুমি ? দার্নো লিখে জানতে চাইল।

টারজান কোন কথা না বলে তক্ষুনি তাকে পিঠে তুলে নিয়ে যাত্রা করল ঘরের দিকে। একদিন যেমন টারজানের ভাই ও জেনী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল আজ দার্নোও আশ্চর্য হয়ে গেল তার গাছের ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার ক্ষমতা দেখে। এদিকে টারজানও যে জেনীকে দেখার জন্য কত ব্যাকুল তা তো আর দার্নো জানে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাফিয়ে চলেছে সে।

ঠিক দুপুরবেলায় সে এসে পৌঁছল ঘরের কাছে দার্নোকে নিয়ে। কত আশা তার জেনীকে দেখবার। কিন্তু সবই বুঝি তার ভাগ্য। কেউ নেই কোথাও। টারজানই প্রথমে দরজা খুলে দেখছে। বলো, শূন্য ঘর মুহূর্তের মধ্যে বিপদের আশঙ্কাটায় ভরে গেল।মরা তাকে কোথায় গেল জেনী ? এমন কি বাইরেও কোন চিহ্ন নোনাবে কিনা চলে গেছে তারা ?

মুহূর্তে তার মন ফাঁকা হয়ে যায়। প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে ওঠে ম্ব। মানুষের উপর। না, না—সে আর কোনদিন ঘরে আসবে না। দার্নোর সঙ্গেও আর সে সম্পর্ক রাখবে না। এক লাফে বেরিয়ে এসেই লাফ দিয়ে গাছে উঠে গেল সে।

এদিকে দার্নোও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফ্যালফ্যাল করে। জাহাজটা নেই। তারা চলে গেছে ! আর একটু অপেক্ষা করল না তারা ? এই নির্বান্ধবপুরীতে সে আর টারজান একা। এই কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ফিরে চমকে গেল সে—টারজান ! টারজান কোথায় ? পাশ থেকে টারজান কখন চলে গেছে দেখেনি সে।

—টারজান, টারজান বলে চিৎকার করে সে ঘরে ঢুকে দেখে কেউ

কোথাও নেই। অনেক, অনেক জিনিষপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না দার্নো। ধপ করে বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল। সে ভীরু নয়, কিন্তু একটা ভয় যেন তার স্নায়ু-তন্ত্রীকে অবশ করে দিতে চাইছে—টারজানও চলে গেল! আমি একা। ঠিক তখনই টারজানের মুখটা মনে পড়ল তার—যেন সে দেখেছিল একটা সকরুণ ভাব তার চোখে মুখে!

ভয় পেলেও দার্নো সৈনিক। নিজেকে সামলে নেবার ক্ষমতা তার আছে। মুহূর্তের মধ্যে সে তার ভয়কে দূর করে এগিয়ে গিয়ে দেখে টেবিলের উপর দুটো চিঠি। দুটোই টারজানকে লেখা। একটা মেয়েলী হাতের আর একটা পুরুষের—খোলা। লেখক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে টারজানকে। এবার চিন্তিত হয়ে পড়ল দার্নো—কি করি? চুপচাপ বসে রইল সে চিঠি সরিয়ে।

আরও যা কে টারজানও চলে এসেছে অনেক দূর। মানুষের সম্পর্ক দিয়ে মাটিতে লাগে না। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল—এ কি! অসুস্থ পারি না। ফেলে চলে এলাম—! কত হিংস্র জন্তু—! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তার বাবার ম তার মনে জেগে উঠল মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের প্রভেদ।—না—বিশেষ কে বাঁচাতে হবে, দার্নোকে বাঁচাতে হবে। বলে তক্ষুনি আবার সে ফিরে চলল সে।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। কতক্ষণ দার্নো বসেছিল অন্ধকারে খেয়াল নেই তার। হঠাৎ সে দেখে কে একটা লোক—চুপিচুপি ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি করে বসল লোকটাকে। লোকটা পড়ে গিয়ে উঠতে চেষ্টা করতেই আবার গুলি করতে যাচ্ছিল দার্নো। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হতে কাছে গিয়ে দেখে টারজান।

—টারজান, টারজান তুমি! বলে চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দার্নো। আক্ষেপে ভরে গেল তার হৃদয়। একটা আলো জ্বালিয়ে শুশ্রূষা করতে করতে তাকে জড়িয়ে ধরে দার্নো বলতে লাগল—ভুল, ভুল টারজান, না জেনে।

ভাগ্য ভাল মারাত্মক হয়নি গুলিটা। টারজান হেসে তাকে সরিয়ে দিয়ে ফরাসী ভাষায় বলল—ও কিছু না।

এরপর দুজনে পাশে বসে টুকরো টুকরো কত কথা। এক ফাঁকে জেনীর চিঠিটা পড়ে সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল তার। জেনীর দোষ কি?

জেনী হারিয়ে যাওয়ার পরে কি করে ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ এসে তাকে খুঁজতে বেরোয়, কি করে নরখাদকেরা দার্নোকে ধরে নিয়ে যায়, এই সংবাদ দিয়ে সে লিখেছে—

টারজান, তুমি তোমার ঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছ বলে তোমায় ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে আর একজন বনবাসীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে রক্ষা করেছিল, গলায় হীরের লকেট পরত। আমি তার নাম জানি না। পার যদি তাকে জানিও আমার কথা। তাকে বলো আমরা তার জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেছি। বলো, সে যদি কোনদিন আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে যায় আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাব। তুমি এই চিঠির কথা তাকে জানাবে কিনা জানিনা, কারণ তুমিও তো কোনদিন দেখা দাওনি আমাদের।

জান টারজান, আমি লক্ষ্য করেছি সে আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু—। তাকে বলো আমি তার চিরকালের বন্ধু। ইতি—

জেনী

হাতের মুঠিতে মুচড়ে ফেলল চিঠিটা টারজান। কিন্তু! কিন্তু, কি? সে জানে না টারজান ও গরিলা রাজা এক।

—কি হলো? দার্নো হঠাৎ জিজ্ঞেস করে তার ভাবান্তর দেখে।

—না না, কিছু না। সহজ হয়ে গেল আবার টারজান।

তারপর থেকে তারা দুইজন রয়ে গেল সেখানে অনেক, অনেকদিন। ইতোমধ্যে টারজান শিখে ফেলেছে আরো অনেক কিছু। ফরাসী ভাষা তো রপ্ত হয়েছেই, সে এখন দস্তুরমত সভ্য মানুষ। দার্নোর হাতেই ঘটল তার শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়। এমন

কি, জেনীদের দিয়ে যাওয়া নানা জিনিষের সঙ্গে ছুরি কাঁটাতেও খেতে শিখেছে সে।

কিন্তু এত সবের পরেও জেনীর কথা টারজান ভুলতে পারে না। একদিন চট করে দার্নোকে জিজ্ঞেস করে বসল—আচ্ছা দার্নো বাল্টিমোর কোথায়?

চমকে উঠে দার্নো জিজ্ঞেস করল—কেন?

—না, এমনি বলছিলাম।

কি বুঝল দার্নো কে জানে! বলল—আমেরিকায়।

—আমেরিকা! কতদূর? সেখানে জেনী থাকে?

—জেনী! বিস্মিত হল দার্নো। বুঝল সরল মনে টারজান বলে ফেলেছে জেনীর কথা। তবে কি টারজান জেনীকে পছন্দ করে! বলল—অনেক দূর। জাহাজে করে যেতে হয়। অনেক টাকা লাগে।

টাকা! টাকা কি? বিস্মিত টারজান।

মৃদু হাসল দার্নো। বলল—টাকা হচ্ছে একটি বস্তু, মাধ্যম যা দিয়ে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু, লোকের সাহায্য পেতে পার। তা দিয়ে তারাও আবার পাবে তাই। নানা ধাতু দিয়ে তৈরি হয় টাকা। কাগজ ছাপিয়েও তৈরি হয়। দেশের সরকারই তা করে সোনার পরিবর্তে। সোনা মূল্যবান। সব দেশেই সোনা চলে। দেশের মধ্যে সোনার পরিবর্তে সবাই টাকাই নেয়। দেশের বাইরে সোনা দিয়ে জিনিষ আনা-নেওয়া চলে। তাছাড়া, আজকাল সোনার পরিবর্তে নানা ভাবে নানা প্রতিশ্রুতিতেও পৃথিবীর দেশে দেশে কাজ চালানো যায়। তাই যে জাহাজে আমেরিকায় যাবে তার মালিককে টাকা না দিলে সে তোমাকে নিয়ে যাবে কেন? তোমাকে অন্যের জন্য খেটে টাকা রোজগার করতে হবে, না হলে সে-ই বা তোমাকে টাকা দেবে কেন?

—তবে আমিও খাটব দার্নো। টাকা রোজগার করব। টারজান জড়িয়ে ধরল দার্নোর হাত।

—খাটবে তো। কিন্তু শহরে না গেলে খাটবে কোথায় ?

—তাহলে চল না দার্নো শহরে যাই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না দার্নো, বাঁচব না। বলে টারজান ধপ করে বসে পড়ল দার্নোর পাশে।

দার্নো বুঝল টারজান জেনীকে না দেখে আর থাকতে পারছে না। বলল—আমিও কি ছাই এখানে থাকতে চাই ?

সেদিনই তারা ঠিক করে ফেলল কালই রওনা হবে।

তার পরদিন সকালেই কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, গুলিবারুদ, রাইফেল, খাবার-দাবার নিয়ে যাত্রা করল তারা। পথে শ্বেতাঙ্গ বস্তীতে এক ধর্মযাজকের আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে শহরে গিয়ে এক হোটেলে উঠল। দার্নোর হাতে যে টাকা অবশিষ্ট ছিল তাতে মোটামুটি চালিয়েও নিল সে। মাঝে টারজানের কাছে জানতে পেরে একটা নৌকো ভাড়া করে টারজানের লুকানো অধ্যাপকের সিন্দুকটাও নিয়ে এল তারা। এদিকে দার্নো তার দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা জাহাজেরও ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু টাকা ? ভাগ্য—! টাকারও ব্যবস্থা হয়ে গেল তাদের হঠাৎ।

একদিন হোটেলে কয়েকজনের সঙ্গে সিংহ নিয়ে তাদের জোর তর্ক হচ্ছিল। হঠাৎ একজন টারজানকে বলে বসল—তুমি যদি খালি গায়ে মাত্র একটা ছুরি নিয়ে একটা সিংহ মারতে পার তবে তোমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ * দেব। লোকটা তো আর টারজানকে জানে না, কিন্তু দার্নো জানে। সে বলল—না, পাঁচ নয়, দশ।

দশেই রাজি হয়ে গেল লোকটি। আর তারপর টারজান কি দেরী করে !

ঠিক মেরে নিয়ে এল একটা সিংহ। পেয়ে গেল দশ হাজার ফ্রাঁ। এই টারজানের প্রথম রোজগার। বিস্মিত টারজানের হাতে টাকাটা দিতেই চমকে উঠল সে—এই টাকা ?

* ফরাসী মুদ্রা।

হেসে দিল দার্নো।—হ্যাঁ, ধর।

—না—তুমি, তুমি নাও। পাঁচ হাজার। টারজান হাত সরিয়ে দিল দার্নোর।

অগত্যা দার্নোকেও নিতে হল পাঁচ হাজার।

তার কয়েক সপ্তাহ পরেই তারা চলে এল প্যারিসে। ইতোমধ্যে আরও সুসভ্য হয়ে উঠেছে টারজান। গাড়ি চালাতেও শিখে গেছে সে। দার্নোকে বলেছে কত কথা। দেখিয়েছিল তার বাবার ডায়েরীটা। ডায়েরীটা দেখেই খটকা লেগেছিল দার্নোর। বিশেষ করে একটা বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ যে পাতাটায় রয়েছে সেই পাতার লেখা পড়ে। লর্ড গ্রেস্টোক লিখেছেন—আমার ছেলের হাতের ছাপ। তবে কি সে লর্ড গ্রেস্টোকের ছেলে! জানতে চায় সে। তাই সে একদিন টারজানের হাতের ছাপ নিয়ে পাঠিয়েও দিল পরীক্ষার জন্য সরকারী অফিসে। বুঝল টারজান, দার্নো তার জন্মরহস্য ভেদ করতে চায়। কিন্তু তার কি আর এসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? তার মাথায় ঘুরছে আমেরিকা—আমেরিকা—।

একদিন রওনাও হয়ে গেল সে। এল বাল্টিমোর শহরে। ঠিকানা অনুযায়ী তন্নতন্ন করে খুঁজল সে জেনীকে, কিন্তু পেল না কোথাও। সে তো আর জানে না যে জেনী এখন শহরের প্রান্তে সবার সঙ্গে তাদের খামার বাড়িতে গেছে। টারজানের ভাইই তাদের খামার বাড়িটা বাসযোগ্য করে তুলেছে। এত আশা তার—। আর সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। গাড়ি ছুটিয়ে চলে এল সে শহরের প্রান্তে, জঙ্গলে। এই জঙ্গলই যেন তার আপন। মনমরা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখে দাউ দাউ করে জ্বলছে দাবানল। তার কাছাকাছি আগুনের বেড়াজালে একটি মেয়ে চিৎকার করে ছুটছে। মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল সে। ছুটতে ছুটতে মেয়েটিকে ধরে এক লাফে গাছে উঠে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে

আগুনের বাইরে এনে ছেড়ে দিল মেয়েটিকে। মেয়েটি কৃতজ্ঞ হয়ে চমকে তাকিয়ে দেখে টারজান।— টারজান তুমি! বলে চিৎকার করে সে জড়িয়ে ধরল টারজানের হাত।— তুমি এখানে এলে কি করে?

আনন্দে টারজানও বলে উঠল—সে অনেক কথা। এস বলে সে জেনীকে গাড়িতে বসিয়ে ছুটল তাদের খামার বাড়ির দিকে।

যেতে যেতে পথে তাদের অনেক কথা হল। কি করে দার্নো তাকে নিয়ে এসেছে এ জীবনে, কি করে সে শিখিয়েছে তাকে ভাষা। জেনী বলল, তার বাবা তার অভিযানের জন্য এক সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার করেছিলন বলে এখন জেনীকে বিয়ে করতে হবে সেই মহাজনকে।

—কেন? টারজান বলল—আমি যদি তাকে বলি?

—সে তোমার কথা শুনবে কেন বল! জেনী বলল।

—ভুলে যেও না জেনী গরিলাটাও একদিন তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

—না, না—আঁৎকে উঠল জেনী।— সে তুমি করতে পার না। এ সুসভ্য জগৎ। এখানে খুন করতে পার না তুমি!

চুপ করেই রইল টারজান। কথা বলল না। জেনীও বলল না কোন কথা। মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠেছিল সে। টারজানের ভাইও তো তাকে চেয়েছে। মহাজনের টাকা মিটিয়ে দিয়ে মুক্ত করতে চেয়েছে। এই টারজানের মুখ চেয়েই তো সে প্রত্যাখান করেছে তাকে। বলেছে—না, তোমাকে আমি চাই না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তার চেয়ে যাকে আমি ভালবাসিনা তাকেই আমি বিয়ে করব। কিন্তু এই টারজান, টারজানকে ভাল লাগছে না কেন? বনচারী টারজান! এ তো সুসভ্য! এত সব কথা তো সে বলতে পারছে না টারজানকে।

খানিক পরে টারজান বলল—আমি বুঝতে পেরেছি, জেনী।

আমি তো একটা বাঁদর। একটা বাঁদরের সঙ্গে তুমি সুখী হতে পারবে না।

'—না, না—প্রতিবাদ করে উঠল জেনী—ওকথা বল না। তুমি বুঝতে পারবে না।

বলতে বলতেই গাড়ি এসে থামল খামার বাড়ির কাছে। হৈ হৈ করে সবাই বেরিয়ে এল জেনীকে দেখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অধ্যাপক বললেন—কি ভাবনায় ফেলেছিলি মা। বনের প্রান্তে বাড়ি। চারিদিকে দাবানল। কি বুঝে তুই ওখানে গেলি ?

তার পরেই টারজানের ভাই টারজানের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি ? তুমিই আমাদের রক্ষা করেছ। তোমাকে তো— !

—হ্যাঁ—। মৃদু হেসে টারজান ফরাসী ভাষায় বলল—ঠিক বলেছ ভাই।

ভাই ! তুমি আমাকে চেন ? তুমি কে ?

—আমি সেই গরিলা রাজা টারজান।

কি ? চমকে চিৎকার করে উঠল তার ভাই—কি বললে ?

টারজান ! তুমি টারজান ! বলে সবাই এসে আনন্দে ঘিরে ধরল তাকে। বাড়িতে নিয়ে এসে বসাল।

ঠিক এমন সময় মহাজন ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই বলে উঠল—ওমা, কি বিপদ কোনমতে বেঁচে গেছি।

চমকে উঠল সবাই। বিরক্ত। কিন্তু টারজান বুঝতে পারল না কি বলতে চায় লোকটা। সঙ্গে একজন ধর্মযাজকও নিয়ে এসেছে।

'অস্বস্তিটা জেনীই কাটিয়ে বলে উঠল—এই যে, আসুন, কিন্তু—। বলে কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে হয়ে উঠল সে।

এবার বুঝল টারজান। মহাজন। বিয়ে করতে এসেছে।

মহাজন ততক্ষণে এগিয়ে এসে জেনীর হাত ধরে বলে উঠল—এস জেনী—আজই আমাকে আবার চ.ল যেতে হবে—আসুন ফাদার, বিয়েটা—।

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। এতক্ষণ টারজান রাগে দেখছিল সব। এবার আর সে নিজেকে সামলাতে পারল না। ঝট করে সে মহাজনের গলাটা ধরে এক হ্যাঁচকায় শূন্যে তুলে ধরল।

হা হা করে তার ভাই ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের উপর। কিন্তু টারজানের এক ঝটকায় সে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। এবার জেনী এসে মিনতি করতেই টারজান বলল—তুমি ওকে বাঁচাতে চাও কেন ?

জেনী বলল—আমি চাই না তুমি খুনের অপরাধে অপরাধী হও।

টারজান তখন মহাজনের গলা ছেড়ে দিয়ে তাকে বলে উঠল—বল, জেনীকে তুমি মুক্তি দিলে।

—হ্যাঁ—। বলে গলায় হাত বুলোতে লাগল মহাজন।

কিন্তু তবুও টারজান মুক্তি দিল না তাকে। বলল—বল, আর কোনদিন আসবে না।

ঢোঁক গিলে ঘাড় নাড়ল মহাজন।

—তবে যাও। বলতেই ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল মহাজন। পিছনে পিছনে ধর্মযাজকও চলে গেল।

এবার অধ্যাপক নিজে কেঁদে ফেললেন। টারজানকে ধমকে বলে উঠলেন—তুমি জান কি করেছ তুমি ? আর কি সে বিয়ে করবে জেনীকে ?

টারজান বলল—না, করবে না। কিন্তু আপনি তার টাকা শোধ করে দিতে পারতেন। এই নিন। বলে দুলক্ষ চল্লিশ হাজার ডলারের একটা চেক তার দিকে বাড়িয়ে বলে উঠল—আপনার ধনরত্ন আমিই লুকিয়ে রেখেছিলাম। নিয়েও এসেছি। দার্নো তাই কিনে নিয়ে এই চেক আপনাকে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞকে দেখানো হয়েছিল আপনার ধনরত্ন।

—অ্যাঁ। অভিভূত হয়ে গেলেন অধ্যাপক। বললেন—তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ—।

—না, তার দরকার নেই। বলে টারজান যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

এমন সময় কে একজন বলে উঠল—মঁসিয়ে আর বোধহয় দেরী করা চলে না। দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। খামার বাড়িটাকেও বোধ হয় আর রক্ষা করা যাবে না। আসুন।

সেদিন গাড়ি চালাতে চালাতে টারজানের মনে যে কি ঝড় উঠেছিল অধ্যাপকের সহকারী তার ছোট্ট গাড়িটাতে পাশে বসে তার খবরও জানে না। স্টেশন থেকে ট্রেনেই যাবে তারা। জেনীও ভেঙে পড়েছিল দু হাতে মুখ ঢেকে আর সবার সঙ্গে যেতে যেতে টারজানের ভাইয়ের বড় গাড়িটাতে। ভাবছিল, টারজান সভ্য হলেও মনে সে এখনও বন্য। সে কি সুখী হতে পারবে? অথচ তার ভাই সভ্য, শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন—।

এমন সময় টারজানের ভাই জেনীকে জিজ্ঞেস করেছিল—জেনী, কি ভাবছ?

—না, কিছু না।

টারজানের ভাই জেনীর হাতটা স্পর্শ করে বলল—আর তো তোমার আপত্তি নেই জেনী? জাহাজ তো আর—

—না—।

ক্ষোভ, বিস্ময়, সভ্যতা যেন টারজানের বন্য মনটাকে চুরমার করে দিয়েছিল সেদিন স্টেশনে এসে। তবুও এক সময় জেনীকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল—জেনী, আর কি কোনো আশা নেই আমার? অথচ দেখ আমি তোমার জন্য আফ্রিকার জঙ্গল থেকে সমুদ্র পেরিয়ে এখানে ছুটে এসেছি। শিখেছি ভাষা, হয়েছি সভ্য—।

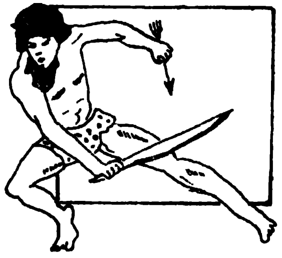
এমন সময় স্টেশনের এক কর্মচারী দার্নোর টেলিগ্রামটা দিয়ে

গেল টারজানের হাতে। দার্নো লিখেছে—টারজান, তুমিই লর্ড গ্রেস্টোকের ছেলে। তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আঙ্গুলের ছাপ তাই প্রমাণ করেছে।

আমি? সে জেনীর দিকে একটু এগুতেই তার ভাই এসে ঘরে ঢুকল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টারজান। ভাবল এই সেই লোক যে আমার সম্পত্তি অধিকার করে জেনীকে নিতে চলেছে। অথচ অথচ একটি কথায় আমি তাকে—। মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী যেন তার শূন্যতায় ভরে গেল।

ততক্ষণে তার ভাই তাকে বলে চলেছে—টারজান তুমি আমাদের জন্য যা করেছ তাতে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমাদের নেই। আচ্ছা! তুমি আফ্রিকার জঙ্গলে কি করে গিয়ে পড়েছিলে?

চোখ ছলছল করে উঠল টারজানের। কিন্তু শক্ত মানুষ টারজান কাঁদে না। বলে উঠল—আমি সেখানেই জন্মেছিলাম। একটি গরিলা আমার মা—বাবা কে জানি না। বলেই সে ছুটতে ছুটতে তার ছোট্ট গাড়িটাতে বসে চালিয়ে দিল গাড়ি। মুহূর্তে গাড়িটা আওয়াজ তুলে স্টেশন চত্বর পেরিয়ে ছুটে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। মিশে গেল জনারণ্যে।





আবার টারজান

জেনীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেদিন বাল্টিমোরের জঙ্গলের দাবানলটা যেন টারজানের হৃদয়টাকেই ঘিরে ধরেছিল। আর এক মুহূর্তও সে থাকতে পারেনি সেখানে। সেদিনই সে টিকিট কেটে ভেসে পড়েছিল অকূল সাগরে। চলেই যাবে সে। দার্নোর সঙ্গে দেখা করে চলে যাবে সে তার সেই আফ্রিকার জঙ্গলে।

জাহাজের হলঘরে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল নানা কথা। সমস্ত অতীতটাই যেন ফুটে উঠছিল তার চোখে এক এক করে। কোথায় সে ছিল, আর কোথায় সে এসেছে। ছিল বন্য, হল

সভ্য। কিন্তু সভ্য মানুষ সত্যিই কি সভ্য? ক্ষুধার্ত হয়ে পশু করে হিংসা, আর মানুষ—?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নজর পড়ে কে একজন কাউন্টকে ঘিরে ধরেছে কয়েকজন, তাস খেলতে গিয়ে। লোকগুলির চোখে মুখে যেন হিংস্র ভাব। লক্ষ্য করতে না করতেই টারজান দেখল হঠাৎ একটা লোক কাউন্টের অজান্তে একটা তাস তার পকেটে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, তাস চোর, তাস চোর বলে। লজ্জায় লাফিয়ে উঠে কাউন্ট কি বলতে যেতেই থাবড়ে বসিয়ে দিল তাকে একজন।

মুহূর্তে আগুন ধরে গেল টারজানের মাথায়—কি? এত বড় অন্যায়? এক লাফে ছিটকে গিয়ে সে চেপে ধরল লোকটার হাত—হতভাগা, তুই-ই কাউন্টের পকেটে তাস ফেলে বলছিস চোর! হাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। তার বন্ধু-বান্ধবরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল টারজানের ওপরে। কিন্তু মুহূর্তেই ছিটকে পড়েছিল টারজানের এক ঝটকায়। স্বীকার করেছিল সব।

কাউন্ট টারজানকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন তারপরে। টারজানও চলে গিয়েছিল তার কেবিনে দুর্বৃত্তগুলোকে ছেড়ে। কিন্তু সেদিন রাত্রেই লোকগুলো শাসিয়েছিল তাকে চিঠি দিয়ে। হেসে ফেলেছিল টারজান হা হা করে—কাপুরুষ সব। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কেন তারা এমন করেছিল কাউন্টকে নিয়ে। কি চায় তারা কাউন্টের কাছে? না কি ষড়যন্ত্র? কিন্তু কেন? না হলে কাউন্টের ওপরই বা হামলা করবে কেন একা পেয়ে? ভাগ্যিস চোখে পড়ে গিয়েছিল টারজানের। কিন্তু টারজান ভ্রূক্ষেপই করেনি। ইচ্ছে করলে সে তাদের মেরেই ফেলতে পারত। কিন্তু তা করেনি সে—সভ্য টারজান তা কি করতে পারে এখন? অবাক হয়ে ভাবছিল টারজান, সভ্য মানুষ কতরকম অন্যায় করে স্বার্থসিদ্ধির আশায়। বিশ্বাস যেন হারিয়ে ফেলেছিল সে সভ্যতার ওপর। প্যারিসে পৌঁছে

বেঁচে গিয়েছিল সে। দার্নোর সঙ্গে দেখা করেই সে চলে যাবে অফ্রিকায়, তার জন্মস্থানে।

কিন্তু দার্নো তাকে ছাড়লে তো! বন্ধুকে পেয়ে দার্নো আত্মহারা। শুধু আক্ষেপ একটা কারণে, টারজান তার বংশমর্যাদা, অর্থ সব ছেড়ে দিয়ে চলে এল? বলল—বন্ধু, তুমি জান না তোমার সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে কি ভুল করলে তুমি। জীবনে অর্থ ছাড়া চলবে কি করে?

টারজান হেসে বলল—বন্ধু, আমি টারজান হয়েই বাঁচতে চাই।

দার্নো বলল—না না, তা নয়। অর্থের অভাব তোমার হবে না, যতদিন আমি বেঁচে আছি। তুমি আমাকে যেভাবে বাঁচিয়েছ, তার ঋণ আমি অর্থ দিয়ে পরিশোধ করব কি করে?

টারজান লজ্জা পেয়ে বলল—এসব বলছ কেন? কর্তব্য ছাড়া আর কি করেছি আমি? সে থাক—।

দার্নো তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল—না বন্ধু, তোমার বংশের কথা জানতে পেরে তুমি কি খুশি নও? প্রতিষ্ঠা পেলে আনন্দ পাবে না বলতে পার? আর তা হতে পারে একমাত্র অধ্যাপক ও সহকারীর সাহায্যে। তারাই তো জানেন তোমার বাবার ঘরে যে শিশুর কঙ্কালটা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল একটা গরিলার বাচ্চার। তারাও বৃদ্ধ হয়েছেন, বেশি দিন তো তাঁরা বাঁচবেন না ভাই।

টারজান বলল—কিন্তু জেনীর মন পরিবর্তন না হলে তো—।

সেদিন আর কথা বেশি এগোয়নি তাদের। টারজান রয়েই গেল দার্নোর কাছে। দিন যায়। ভালোও লাগে না টারজানের। তবু খায় দায় ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সন্ধ্যার পর রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ টারজানের মনে হল কে যেন তাকে লক্ষ্য করছে। দেখতে না দেখতে লোকটি তার সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল একটা বাড়ির দিকে। আর তারপরেই এক নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকার। টারজান এ চিৎকার সহ্য করে কি করে? সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঢুকল সেই বাড়িতে। গিয়ে দেখে

একটি মেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার চারপাশে কয়েকজন লোক তাকে মারতে চলেছে।

টারজানকে দেখেই চিৎকার করে উঠল মেয়েটি—আমায় বাঁচান



ম'সিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কে একটা লোক বেরিয়েও গেল টারজানের সামনে দিয়ে। টারজান দেখেই চিনল তাকে—জাহাজের সেই লোকটা।

রাগে জ্বলে উঠল টারজান—কি, এত সাহস! এখানেও!

টারজান লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পেটাতে শুরু করল। লোকগুলো কিছুই করতে পারল না। তাকে একটু পরে বাইরে থেকে একটা লোক তরবারি নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের ওপর। কিন্তু সে তো আর টারজানকে জানে না। তরবারি চালাবে কি, মার খেয়ে পালাতে পথ পায় না। কিন্তু পালাতে পারলে তো! টারজান সব কটাকে আটকে রাখল ঘরে।

একটু পরে পুলিশ এলে টারজান সব কিছু বলতে যেতেই চিৎকার করে উঠল মেয়েটি—না না, মিথ্যে কথা। এই লোকটি আমাকে মারতে এলে এই ভদ্রলোকেরাই আমাকে বাঁচায়।

কিন্তু কারো কথায় বিশ্বাস করে না পুলিশ। মেয়েটিকে দলবল-সহ গ্রেপ্তার করে টারজানকে অফিসার বললেন—আপনাকেও যেতে হবে মঁসিয়ে।

—কেন? চিৎকার করে উঠেই টারজানের মনে হয় এ একটা ষড়যন্ত্র—সেই জাহাজের লোকটা প্রতিশোধ নিচ্ছে। নাহলে সে আর এল না কেন ঘরে?

পুলিশ বলল—আপনার যা বলবার—।

—কি? মুখের কথা মুখেই থেকে যায় পুলিশের। রেগে আগুন হয়ে টারজান প্রচণ্ড এক ঘুঁষি বসিয়ে দেয় অফিসারের চোয়ালে। আর তারপরেই সে ঝাঁপিয়ে পরে সবার ওপর। মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব। নিভে যায় বাতি। আর তক্ষুনি টারজান এক চিৎকার করে জানালা দিয়ে পাশের এক গাছে লাফিয়ে পড়ে নেমে পালিয়ে যায় দার্নোর কাছে।

উত্তেজনা তখনও কমেনি তার। দার্নো তখন ঘরেই ছিল। এক লাফে ঘরে ঢুকেই টারজান বলল—দার্নো, এ কি সভ্যতা তোমাদের?

বিস্মিত দার্নো।—কি হয়েছে? খুলে বলো। সব শুনে দার্নো

বলে—কাজটা ভালো করনি ভাই। পুলিশ তো তোমাকে জানে না। বলেই সে টারজানের হাত ধরে বলল—এস, পুলিসের কাছে সব খুলে বলি। দেখবে, সব মিটে গেছে।

সত্যিই তাই। টারজানের সব কথা শুনে পুলিশ বিস্ময়ে অভিভূত। মিটেও গেল ব্যাপারটা।

সেদিনই টারজান তার ভাইয়ের একটা চিঠি পেয়ে বুঝল, দু'মাসের মধ্যেই সে বিয়ে করছে জেনীকে। দার্নোর সঙ্গে পত্রালাপ ছিল তার ভাইয়ের। মুখে কিছু না বললেও দার্নো বুঝেছিল টারজানকে। তাই সেদিন সে একটা নাটক দেখতে গিয়েছিল টারজানকে নিয়ে। কিন্তু টারজানের মন থাকলে তো? মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল সে। আর তখনই কাউন্টেসের নজরে পড়ে গেল সে।

একটু পরে কাউন্টেস তার পাশে এসে বসতেই চমকে উঠেছিল টারজান—আপনি?

কাউন্টেস হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপনাকে কত খুঁজেছি জাহাজ থেকে নেমে, কিন্তু—।

টারজান তাকিয়ে রইল কাউন্টেসের দিকে।

কাউন্টেস বলতে লাগলেন—আপনি দু-দু'বার আমাকে রক্ষা করছেন জাহাজে! কিন্তু সেই লোকটা এখানেও—।

—কি? লাফিয়ে উঠল টারজান।

—হ্যাঁ। কাউন্টেস বললেন—তাই আমি বলছিলাম আপনি যদি কাল আমার বাড়িতে যান, সব বলব আপনাকে।

টারজান গিয়েওছিল তাই। তারপর আরও অনেকদিন। দার্নোকেও নিয়ে গিয়েছিল সে। শুনেছিল কাউন্টেসের সব কথা। লোকটা তার নামে কলঙ্ক লেপন করতে চায়—ক্ষতি করতে চায় তার, কাউন্টের—হয়ত সে বিদেশী গুপ্তচর—ভয়ে সে কাউন্টকে বলতে পারছে না সে কথা—কারণ সে তার ভাই। বলে কেঁদে ফেলেছিল কাউন্টেস।

কিছু বলতে পারেনি টারজান কাউণ্টেসকে—শুধু একটু সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া। সভ্যতার রূপ দেখে কেঁপে উঠেছিল তার সমস্ত অন্তর। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছিল সেদিন।

সেই লোকটা যে এদিকে কাউণ্টেসের সঙ্গে টারজানকেও জড়িয়ে ফেলেছে, তা টারজান বুঝতেই পারেনি। কিন্তু যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফেরবার পথ নেই।

এমনি একদিন কাউণ্ট বাড়ি নেই। নিজের এক জরুরী সভায় ব্যস্ত। এক বেনামী টেলিফোন পেয়ে টারজান ছুটে যায় কাউণ্টেসের কাছে।

কাউণ্টেস তো অবাক্। বললেন—টারজান তুমি?

—কেন? টারজান বলে—আপনি টেলিফোনে খবর পাঠাননি?

—না তো! বলে কাউণ্টেস টারজানের হাত ধরে এনে বসালেন ঘরে।

টারজান বুঝতে পারল, একটা ষড়যন্ত্র চলছে। বোধহয় সেই লোকটাই। কিন্তু মুখে বলল—ও! না, তাহলে বোধহয় ভুলই শুনেছি। আমি যাই।

কিন্তু যেতে চাইলেও কাউণ্টেস ছাড়লে তো? আসলে এই লোকটার সাহস ও শৌর্য্যের কাছে কাউণ্টেস পেয়েছিলেন আশ্রয়। তাই তার সান্নিধ্য কাউণ্টেসের ভালো লাগে। দেখা পেলে সহজে ছাড়তে চায় না। তাই সেদিনও তার সঙ্গে বসে গল্প করতে লাগলেন।

আর এদিকে ঐ লোকটা কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে তার বাড়িতে ডেকে কাউণ্টকে লোক পাঠিয়ে চিঠি দিয়েছে—কাউণ্ট যেন শিগ্রির বাড়ি চলে যান। তাহলে তিনি দেখতে পাবেন টারজান কাউণ্টেসের সঙ্গে গল্প করছে।

রাগে আগুন হয়ে কাউণ্ট ছুটে বাড়ি এসে দেখলেনও তাই। আর তক্ষুণি তিনি একটা লাঠি দিয়ে পেছন থেকে টারজানের মাথায়

করলেন প্রচণ্ড আঘাত—মেরেই চললেন তিনি পাগলের মত। কেটে গেল টারজানের মাথা। কিন্তু তবুও সে টারজান। বন্য কঠোরতায় মানুষ হয়েছে সে। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠেই সে কাউন্টের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে প্রচণ্ড ঘুষিতে ধরাশায়ী করে ফেলল কাউন্টকে। সে হয়ত রাগে মেরেই ফেলত কাউন্টকে। কিন্তু কাউন্টেসের চিৎকারে সচকিত হয়ে তাকে সযত্নে তুলে খাটে শুইয়েই চলে গেল থানায়। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে সোজা সেই লোকটার বাড়ি।

লোকটা তখন তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছিল সংবাদপত্রের প্রতিনিধির জন্য। টারজানকে দেখেই সে চমকে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল—তুমি এখানে?

টারজান হেসে বলল—কেন এসেছি তুমি জানো না? তুমি কাউন্টেসের ভাই। বেঁচে গেলে।' যাকগে, কাগজ কলম নিয়ে ঘটনাটার পূর্ণ স্বীকারোক্তি লিখে দাও তো চট করে। আর হ্যাঁ, সংবাদপত্র যেন কিছু জানতে না পারে। তা হলে তোমরা দুজনের কেউ বাঁচবে না।

কিছু করার ছিল না লোকটার। ইতোমধ্যে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এলে তাকে বিদেয় করে থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্বীকারোক্তি লিখে টারজানের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল তার।

কিন্তু এত সহজে টারজান রক্ষা পেল না কাউন্টের কাছে। ডুয়েলের আহ্বান জানালেন কাউন্ট! চিন্তিত দার্নো, কি করবে বুঝে উঠতে পারল না—কি করে বাঁচাবে সে টারজানকে? কিন্তু টারজান নির্বিকার।

অদ্ভুত কাণ্ড! আশ্চর্যভাবে টারজান চারটে গুলির পরেও বেঁচে গেল। সামান্য একটু ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি তার। এবার টারজানের পালা। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখল, টারজান ধীরে ধীরে কাউন্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল—যে কোন কারণেই হউক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন আপনি। আমার রিভলভারটা

নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখুন না। দয়া করুন কাউণ্ট, আমি মরতেই চাই।

কাউণ্ট হতভম্ব। এমন কথা তিনি শোনেননি কখনও। জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

—কেন কি কাউণ্ট? মিনতি ঝরে পড়ল টারজানের। আমি, আমার জন্যেই আপনার সুখের সংসার আজ ভেঙ্গে যেতে বসেছে। আপনার স্ত্রী নির্দোষ। জাহাজের সেই লোকটা ষড়যন্ত্র করে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আপনার বাড়িতে। আর আপনাকেও দিয়েছিল তার খবর। এই দেখুন তার স্বীকারোক্তি। বলে সে কাগজটা তুলে দিল কাউণ্টের হাতে।

কাউণ্ট কাগজ পড়বেন কি, আবেগে টারজানের হাত ধরে বলে উঠলেন—ভাই, তোমার মত বীর, ভদ্রলোক পৃথিবীতে বিরল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমার কিছু হয়নি।

তারপর টারজানের চাকরির প্রয়োজন জেনে ওই কাউণ্টই জুটিয়ে দিলেন তাকে একটা কাজ। আলজিরিয়ার এক ফরাসী উপনিবেশের সামরিক অধিকর্তার উপর খবরদারীর কাজ। সরকার খবর পেয়েছেন এই অধিকর্তা কিছু সামরিক তথ্য বিদেশীদের কাছে পাচার করতে পারে। টারজানেরই উপযুক্ত কাজ। সাহস, শৌর্যের প্রয়োজন প্রতি পদে। আমেরিকান শিকারীর ছদ্মবেশে ছদ্মনামেই পরিচিত হবে সে।

চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গেল টারজান। প্যারিস আর ভালো লাগছে না তার। কিন্তু দার্নো? উপায় নেই টারজানের। দার্নোর আক্ষেপ উপেক্ষা করে তার কাছ থেকে কয়েক মাসের বিদায় নিয়ে চলে গেল সে আলজিরিয়ায়।

সে টারজান। তার ভাগ্যটাও বোধ হয় কঠোতায় ভরা। সেখানেও তাকে অতিক্রম করতে হল কত বিপদ, কাটাতে হল কত চক্রান্ত। এবারও সে তার বিপদে পেল এক অসহায় ক্রীতদাসীর সহায়তা।

বিপদমুক্ত হয়ে সে মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়েছিল তার বাড়িতে। মেয়েকে ফিরে পেয়ে পিতার চোখে জল, পুত্রী জড়িয়ে ধরেছে তার পিতাকে। এ দৃশ্য টারজান কখনও ভুলতে পারবে না! তারপর সেই কৃতজ্ঞ পিতা-পুত্রীর সহায়তায় সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে টারজান উদ্ধার করেছিল সেই সামরিক তথ্য প্রতিপক্ষের কাছ থেকে! অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে টারজান, এখানেও প্রতিপক্ষ তার সেই জাহাজের লোকটা। কিন্তু এবারেও সে তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বারবার তার চোখে ভেসে উঠেছিল কাউণ্টের মুখ। অধিকর্তা আত্মহত্যা করেছিলেন।

টারজান আর কি করবে? সে সেখান থেকে আলজিয়ার্সে গিয়ে পেল সরকারী নির্দেশ। ছদ্মনামে তাকে সেখান থেকে জাহাজে কেপ টাউন যেতে হবে। জাহাজ ভাসল জলে। টারজান অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভাসলে কি হবে, সে দেখে এখানেও তার সেই প্রতিপক্ষ জাহাজের লোকটা অনুসরণ করে চলেছে তাকে। টারজানের সঙ্গে রয়েছে সামরিক তথ্য, আরও সতর্ক হয়ে উঠল সে।

এদিকে জেনীর কাছ থেকে টারজান চলে আসার পর সেখানেও ঘটে চলেছিল কত না ঘটনা নাটকের মত।

মনমরা জেনী। টারজানের ফেলে আসা দার্নোর টেলিগ্রামটা গোপনে কুড়িয়ে নিয়ে তার ভাই জানতে পারল টারজানই লর্ড গ্রেস্টোক, সে আজ নিঃস্ব। কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ল না জেনীকে বিয়ে করতে। তখনকার মত তাকে লণ্ডনে চলে আসতে হল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে অধ্যাপক ও জেনীকে আমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠাল লণ্ডনে। অধ্যাপক এলেন লণ্ডনে তার মেয়েকে নিয়ে। উদ্দেশ্য, ঘোরাঘুরিতে তবুও যদি জেনীর মন কোরে। তিনি তো আর জানেন না যে তার ভাই লর্ড গ্রেস্টোক নয়। তিনি চান জেনী তার ভাইকেই বিয়ে করুক।

জেনীও অবশ্য জানে না যে টারজানের ভাই লর্ড গ্রেস্টোক নয়।

তবুও তার মন কি আর সায় দেয় ? নানা অজুহাতে সে সময় পিছোতে লাগল। টারজানের ভাইয়ের প্রস্তাবে মন ঠিক করতে পারেনি এখনও। এরই মধ্যে একদিন এক ভদ্রলোক অধ্যাপকের কাছে তার জাহাজে আফ্রিকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাতেই বেঁচে গেল জেনী। তবুও বহুদিন সময় পাবে সে মন ঠিক করতে। আর তাছাড়া আফ্রিকার কথায় মনে পড়ে গেল তার, সেখানেই তো প্রথম দেখা হয়েছিল টারজানের সঙ্গে। তার পরদিনই ছাড়ল জাহাজ।

ঘটনাক্রমে টারজানও যে চলেছে আর একটা জাহাজে একই অভিমুখে, তা তো আর জেনী জানে না। জানে না টারজানও। সে তখন জাহাজে জেনীর এক বান্ধবীকে পেয়ে মনে অনেক শান্তিও পেয়েছে। দুজনে মিলে কত কথা। এক ফাঁকে জেনেও ফেলল সে, যে, জেনী তাকে কত গভীরভাবে চায়। কিন্তু তার ভাই ?

এরই মধ্যে একদিন টারজান সেই লোকটাকে জেনীর বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে কথা বলতে দেখে ভয় পেয়ে তাকে শাসিয়ে এসেছিল এক ফাঁকে। লোকটা টারজানকে জানত। তখনকার মত সে চুপ করে গেলেও এক রাত্রে টারজানের অসতর্ক মুহূর্তে টারজানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় জলে। টারজানের জলে পড়ার শব্দটা শুনেছিল অনেকেই। শুনেছিল জেনীর বান্ধবীও। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি কেউ।

পরদিন বুঝতে পেরে জেনীর বান্ধবীর কি আক্ষেপ লোকটার কাছে। সে তো আর লোকটার আসল প.রিচয় জানে না। সে কিন্তু ততক্ষণে টারজানের কেবিন থেকে সামরিক তথ্যগুলি উদ্ধার করে গুছিয়ে ফেলেছে। জাহাজ থেকে নেমে প্রথম সুযোগে চলেই যেত সে, কিন্তু এই বোকা ধনী মেয়েটাকে বিয়ে করে তার সম্পত্তিটাও হাতিয়ে নেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারল না। তাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার অছিলায় তার সঙ্গে কেপ টাউনেই নেমে গেল সে।

বান্ধবীটি তার মায়ের সঙ্গেই বেড়াতে বেরিয়েছিল। আগের

থেকেই তারা ঠিক করেছিল কেপ টাউনে তারা কিছুদিন থাকবে। তাই তারা কেপ টাউনেই রয়ে গেল কিছুদিন। লোকটাও কিন্তু তাদের সঙ্গ ছাড়েনি।

ঘটনাক্রমে কেপ টাউনেই দেখা হয়ে যায় দুই বান্ধবীর, এক দোকানে। কেউ তো জানত না তারা দুজনেই এখানে আছে। দেখা হতেই দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে —তুই!

তারপর দুই বান্ধবীর কত কথা। টারজানের কথা শুনে জেনীর চোখের জল আর শুকোয় না। লোকটা সান্ত্বনা দিতে এলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় জেনী।

সেখান থেকে জেনীর বান্ধবী জেনীদের জাহাজেই থেকে যায় মাকে নিয়ে। একই জাহাজে পাড়ি দেয় সাগর। লোকটাও কিন্তু তাদের সঙ্গ ছাড়েনি তখনও।

দিন যায়। কিন্তু একদিন,দুর্ভাগ্য তাদের—জেনীদের ছোট্ট, জাহাজটা সমুদ্রের একটা ডুবো পাহাড়ে লেগে ভেঙ্গে যায়। তারা পড়ে অকূল সাগরে। জাহাজের ক্যাপ্টেনই তখন লাইফবোটে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়। নিমেষের মধ্যে লাইফবোটগুলি যাত্রীদের নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। খোঁজও পায় না কেউ কারোর। একটা বোটে ছিল টারজানের ভাই, জেনী ও জাহাজের সেই লোকটা। ভয়ে জড়সড় টারজানের ভাই আর জেনী সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কিন্তু সেই লোকটা নির্বিকার। ভেসেই চলেছে তারা অকূল সাগরে।

এদিকে জলে পড়েই টারজান বুঝেছিল লোকটা হঠাৎ তাকে বোকা বানিয়ে সামরিক তথ্যগুলি সবই নিয়ে নিয়েছে। প্রচণ্ড আক্রোশে হাত-পা নিশাপিশ করে উঠল তার। কিন্তু কিছুই করার নেই তার এই বিস্তীর্ণ মহাসাগরে—এক সাঁতার কাটা ছাড়া। আপ্রাণ চেষ্টা

করে যুঝতে লাগল সে সমুদ্রের সঙ্গে। কিন্তু তবুও, টারজান হলেও তার শক্তির সীমা আছে। আর বুঝি সে পারছে না। কোথায় যে যেতে হবে, কতদূর, কিছুই তো জানা নেই তার।

কিন্তু এবার তার ভাগ্য অনুকূল। হঠাৎ হাতের কাছে একটা ভাঙ্গা জাহাজের কতকগুলি কাঠ পেয়ে বেঁচে যায় সে। কাঠগুলি আঁকড়ে ধরে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পরিশ্রমে অচৈতন্য টারজান কখন যে এসে উপকূলে আছড়ে পড়ছে, তা সে নিজেও জানে না।

চৈতন্য ফিরে পেয়ে সে তো আনন্দে আত্মহারা। দেখে সে তার পরিচিত জঙ্গলেই এসে পড়েছে। ঐ তো তার বাবার ঘরখানা। লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে সে ঘরে ঢুকেই হা হা করে হাসতে লাগল আপন মনে। কতকালের সেই চেনা ঘর, সেই জিনিস, থরে থরে সাজানো এখনো। একটু শান্ত হয়ে এবার ক্ষিদে পেয়ে গেল তার। পাগলের মত আতি পাতি করে খুঁজতে লাগল সে অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু না, কিছুই নেই ঘরে, শুধু একটা দড়ির ফাঁস ছাড়া, অগত্যা সে এটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। কিন্ত শিকার কোথায়? হঠাৎ দেখে এক নিগ্রো যোদ্ধা চলেছে একা, সে ভাবল তাকে কাবু করে, তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই না হয়—। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখে এক প্রকাণ্ড সিংহ লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যোদ্ধাটির সামনে। ভুলে গেল টারজান অস্ত্রের কথা। সেও তক্ষুণি এক ঝটকায় দড়ির ফাঁসে সিংহটাকে আটকে লাফ দিয়ে নেমে নিমেষে যোদ্ধার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে আক্রমণ করল সিংহটাকে। একটু পরেই নেতিয়ে পড়ল সিংহটা। এবার রক্তাক্ত দেহে টারজানকে দেখে যোদ্ধা হতভম্ব। হতভম্ব টারজানও। কিন্তু একটু পরেই একদল যোদ্ধা এসে তাকে ঘিরে ধরতেই হকচকিয়ে যায় সে। তবে কি তারা নরখাদক? এক লাফে ছুরি হাতে টারজান রুখে দাঁড়তেই হাসতে হাসতে তারা নিরস্ত্র করে তাকে। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বলে সে তাদের বন্ধু। তাঁদের যোদ্ধাকে সে রক্ষা করেছে, সে তো বীর। মহা-

সমারোহে তারা তাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে দেয় প্রাপ্য সম্মান। তাদের একজন হয়ে তাদের সঙ্গেই থেকে যায় সে। খুব খারাপ লাগে না টারজানেরও। জংলী নিগ্রোদের কিছু শত্রু নিপাত করে এরই মধ্যে সে হয়ে উঠেছে আরও প্রতিপত্তিশালী। টারজানই যেন এখন জংলী-দের মধ্যমণি।

গাঁয়ের জংলীরা প্রায় সবই হলুদ ধাতুর গয়না পরত। টারজান দেখেই বুঝেছিল এগুলি সোনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সভ্যজগতে থেকে সোনার সে কি মূল্য তা টারজানের অজানা ছিল না। তাই একদিন সে তাদের এক বৃদ্ধ দলপতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, এই হলুদ ধাতুগুলি তোমরা কোথায় পাও?

—কেন, ধ্বংস নগরী থেকে।

—ধ্বংস নগরী! সে কোথায়?

—এখান থেকে অনেক দূরের পথ। তবে, আমরা আর সেখানে যাই না। বড় বিপদ সেখানে, কেউ ফিরে আসে না।

—বিপদ! বিস্মিত টারজান জিজ্ঞেস করল—কিসের বিপদ?

—তা তো জানি না বীর।

—হুম্—আমি যাব।

—না। ভয়ে কেঁদে উঠল বৃদ্ধ।—যাবে না তুমি। তাহলে আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু তাতে কি আর তারা টারজানকে দমিয়ে রাখতে পারে? পঞ্চাশ জন যোদ্ধা নিয়ে একদিন যাত্রা করল সে সেই ধ্বংস নগরীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এত করেও টারজান ওখানে গিয়ে কাউকে পাঁচিল ডিঙোতে রাজি করাতে পারল না। অগত্যা সারাদিন অপেক্ষা করে সূর্য ডুবতেই টারজান লাফিয়ে নামল পাঁচিলের ওপারে। কেউ কোথাও নেই। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। মাথার উপরে আকাশের চাঁদ। তবুও অস্পষ্ট মনে হয় সব কিছু। পা টিপে টিপে চলেছে টারজান। কিন্তু হঠাৎ কারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে প্রচণ্ড

বিজাতীয় চিৎকার করে। নিমেষের মধ্যে হাত-পা বেঁধে নিয়ে চলল তাকে। কিছুই করতে পারল না টারজান।

টারজান বুঝতে পারল না এরা কারা। কেমন যেন গরিলার মত দেখতে মানুষগুলি। গরিলাদের ভাষায় কথা বলছে। এদের কথাবার্তায় সে বুঝল তারা তাকে বলি দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। কি করে যে মুক্ত হবে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। যেতেই হল তাদের সঙ্গে।

একটু পরে তারা তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা বেদীর উপর চিৎ করে শুইয়ে সার দিয়ে দাঁড়াতেই কোত্থেকে কতগুলি মেয়ে পূজারিণী এসে তার পায়ের বাঁধন কেটে, নিয়ে চলল পাশের ঘরে। সেখানে গিয়ে সবাই সার বেঁধে দাঁড়াতেই হীরে-সোনার গয়না পরা একজন পূজারিণী এসে দাঁড়াল তার পাশে। হাতে তরবারী। ঝকঝক করে উঠছে আলোতে। ধীরে ধীরে সে তরবারীটি নাচাতে লাগল টারজানের বুকের উপরে। টারজান বুঝল আর রক্ষা নেই তার।

এমন সময় হঠাৎ নিচের ভীড় থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল—না, তুমি না, আমি। আমিই প্রধান। বলেই সে পাগলের মত একটা খাঁড়া ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটল ভীড় ঠেলে। কয়েকটাকে মেরেও ফেলল সে খাঁড়া দিয়ে। লেগে গেল হুলুস্থুল। নিমেষে সবাই ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। টারজানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পূজারিণী ভুলে গেল টারজানের কথা। মুহূর্তে পূজারী লাফ দিয়ে বেদীতে উঠে হঠাৎ এক হাতে পূজারিণীকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল পাশের ঘরে। চিৎকার করে উঠল পূজারিণী। এতক্ষণ হতবাক হয়ে সবকিছু দেখেছিল টারজন। এবার এক ঝটকায় সে তার হাতের বাঁধন ছিঁড়ে ছুটল মেয়েটির কান্না লক্ষ্য করে। পেয়েও গেল সে তাকে কয়েকটা ঘর পরেই। ততক্ষণে গরিলা-মানুষটা মেয়েটির গলা টিপে ধরেছে। দরজা থেকেই এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজান লোকটার ওপরে। তারপরেই লেগে গেল ধ্বস্তাধ্বস্তি।

কিন্তু সে টারজান, কত গরিলা হত্যা করেছে সে। তার সঙ্গে পারবে কেন মানুষটা? মুহূর্তে সাঙ্গ করে দিল তার ভবলীলা। মেয়েটি ভয়ে চিৎকার করে দরজার দিকে লাফ দিতেই টারজান এক হ্যাঁচকায় তাকে টেনে আনল ঘরে।

মেয়েটি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে টারজানের হাত থেকে মুক্ত করতে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল— তু-তুমি কে? আমায় বাঁচালে কেন? আমি তো তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।

টারজান বলল—একটি পুরুষ করবে নারীহত্যা? ছিঃ ছিঃ। আমি টারজান।

—তুমি আমাদের ভাষায় কথা বলছ!

—হ্যাঁ। আমি টারজান। তুমি কে?

—আমি? আমি? বলে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল তাদের পূর্ব ইতিহাস।

বহুদিন আগে তাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল এখানে। ভাল ভাল সোনায় গড়া সম্পূর্ণ অঞ্চল। এসে গড়ে তুলেছিল এই নগরী। তাদের সঙ্গে কিছু গরিলাও ছিল পরিশ্রমের কাজ করতে। গরিলাদের সঙ্গে তাদের কিছু অংশ মিশেও যায়। তা থেকেই হয়েছে এই গরিলা-মানুষের পূজারীর দল। খাঁটি মানুষের বংশধর বলতে এখন কয়েকজন মেয়েই আছে এখানে। গরিলা-মানুষেরা চায় এ নগরীর প্রধান হতে। তাই তাদের সঙ্গে লেগে রয়েছে এই মেয়েদের শত্রুতা। এতদিন তবু মানুষের বংশটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এরা, কিন্তু আর বুঝি পারছে না। তারা সূর্য উপাসক। বিদেশী কাউকে পেলে তারা তাঁকে দেবতার কাছে বলি দেয়।

—হুম। টারজান বলল—সে তোমাদের সমস্যা। আমি চললাম। পথ দেখিয়ে দাও আমায়।

—না না। চিৎকার করে উঠল মেয়েটি।—এখন তুমি যেতে পার

না। তারা তোমায় খুঁজছে হন্যে হয়ে। দেবতার কাছে উৎসর্গ করা তোমাকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। কিন্তু তুমি আমায় রক্ষা করেছ। আমি বাঁচাব তোমায়, এস। বলে সে টারজানের হাত ধরে বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বলল—এস, এই ঘরে। লুকিয়ে থাক কিছুদিন। তারপর দেব পথ দেখিয়ে। এস। বলে সে তাকে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

আসলে মেয়েটি যে কৌশলে বলিষ্ঠ সাহসী টারজানকে বন্দী করে রাখতে চায় তা তো আর সে জানে না। মেয়েটি চায় এই টারজান দিয়েই তার বিরুদ্ধ পূজারী দলটাকে শায়েস্তা করতে। তাই সে টারজানকে এখানে বন্দী করে রেখে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যেতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে টারজান হাঁপিয়ে উঠল। এ কি! আমাকে এখানে থাকতে হবে কিছুদিন? না, থাকতে পারব না আমি। আমাকে চলে যেতেই হবে এবং এক্ষুণি। বলেই সে তক্ষুণি ঘরের ছোট্ট জানালাটা চাড় দিয়ে ভেঙ্গে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অনেকটাই দেখা যায় চত্বরটা। সে পা টিপে টিপে চত্বরটা পেরিয়ে দেখে একটা খোলা ঘরে তাল তাল সোনা। দুতাল সোনা হাতে নিয়ে সে তক্ষুণি ছুটে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে এল যোদ্ধাদের কাছে।

হৈ হৈ করে উঠল যোদ্ধারা টারজানকে পেয়ে। এতক্ষণ টারজানকে না দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারা। এরমধ্যে কতগুলি গরিলা-মানুষকেও যেতে দেখেছে। এবার তারা সবাই মিলে নগরীর ভিতরে যাবে ঠিক করেছিল। তখনই এল টারজান। হৈ হৈ করে সবাই এসে টারজানকে ঘিরে ধরতেই টারজান বলল—না, এখন নয়। সবাই এস আমার সঙ্গে।

সবাই টারজানের কথায় রাজি। পথ দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে এল টারজান সেই সোনার তালের ঘরটাতে। সে তারপর প্রত্যেকের

হাতে হাতে ছুটো করে সোনার তাল তুলে দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ফিরে চলল দেশে।

গাঁয়ের কাছে একটা জঙ্গলে এসে টারজান বলল—বন্ধুগণ, তোমরা এগুলি এখানে রেখে চলে যাও গাঁয়ে। আমি পরে যাব।

টারজানের কথা তারা অমান্য করতে পারে না। তারা তক্ষুণি সোনার তালগুলি সেখানে রেখে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল গাঁয়ে।

তারা চলে যেতেই টারজান সোনার তালগুলি একে একে নিয়ে তার পুরোনো গরিলাদের আস্তানায় গর্ত খুঁড়ে রেখে দিয়ে চলে গেল শিকার করতে। পথেই দেখা হয়ে গেল তার সেই পুরোনো গরিলা দলের সঙ্গে। তারা তাকে পেয়ে খুব খুশি। সে ঠিক করল তাদের সঙ্গেই সে থাকবে এখন পুরোনো আস্তানায়। মানুষের সঙ্গে আর নয়। তবুও মন তো তার খারাপ হয়েই যায়। সে তাদের কাছ থেকে তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে আসে সমুদ্র উপকূলের কাছে। কিন্তু হঠাৎ যেন তার হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যায়—এ কে? জেনী! তার জেনী! তাকিয়ে দেখে তার ভাইয়ের সঙ্গে বসে আছে জেনী। পাড়ে বালির ওপর উল্টানো একটা লাইফ বোট। জেনী বলে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও চুপ করে যায় সে। না, জেনী তো তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার ভাইয়ের জন্য। আর জেনী নয়। প্রচণ্ড অবসাদে, ঈর্ষ্যায় জ্বলে উঠে তক্ষুণি সে গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে চলে আসে আস্তানায়। গরিলারা তখন কেউ ছিল না সেখানে। চুপচাপ বসে থাকে সে গাছে।

এদিকে জেনীরা যে কি বিপদে পড়েছে এই গভীর বনের কাছে তা তো আর টারজান জানে না। একটু আগেই লাইফ বোটে ভাসতে ভাসতে তারা তিনজন—টারজানের ভাই, জেনী ও জাহাজের সেই লোকটা এসে আছড়ে পড়েছে এখানে। পরিশ্রমে, ক্ষুধায়, পিপাসায়, তারা যেন আর পারছে না। বিপদের উপর বিপদ, জাহাজের সেই লোকটাই সমুদ্রেই একসময় টারজানের ভাইকে কেটে

খেয়ে ফেলতে গিয়েছিল। কিন্তু পারে নি। তারপরেই তারা এসে এখানে পড়েছে। লোকটা যে এইমাত্র কোথায় লুকিয়েছে তা তারা জানে না। অথচ এখান থেকে উঠে চলে যাওয়ার শক্তিও তাদের নেই। তাই টারজানের ভাই জেনীর পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। ঠিক তখনই টারজান তাদের দেখেছে।

জেনীকে দেখার পর থেকে তার আর কিছুই ভাল লাগে না। একা একাই ঘুরে বেড়ায়। গরিলা দলটাকেও যেন আর ভাল লাগে না তার। কয়েকদিন কেটেও যায়।

হঠাৎ একদিন একটা গরিলা এসে তাদের ভাষায় বলে—টারজান, দেখে এলাম কয়েকদিন আগে একটা সাদা মেয়েকে গরিলা-মানুষেরা ধরে নিয়ে গেছে।

—কি? চিৎকার করে উঠল টারজান।—কি বললে? সাদা মেয়েকে?

—হ্যাঁ। মাথা নাড়ল গরিলাটা। কিন্তু বুঝতে পারল না টারজান চীৎকার করে উঠল কেন।

—তবে তো সে জেনী। জেনীকে ধরে নিয়ে গেছে গরিলা-মানুষের দল। বলেই সে এক ভীষণ চিৎকার করে ছুটল গাছের ডালে ডালে।

থতমত খেয়ে গরিলারা কিছুই বুঝতে পারল না, কি হল টারজানের।

উন্মত্তের মত ছুটে চলল টারজান ধ্বংস নগরীর দিকে। সে বুঝতে পেরেছে জেনীকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছে তারা। বিরামহীন টারজান ছুটে চলল গাছের ডালে ডালে। পথ ঘাট সবই তার চেনা। এমনকি নগরীর প্রাসাদের মাঝে সেই হলঘরটার পথও সে চেনে। প্রাচীর ডিঙিয়ে পাগলের মত সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই হলঘরটায়। গিয়ে দেখে, হুম্, যা ভেবেছে তাই। গরিলা মানুষদের দল থিকথিক করছে চারদিকে। জেনীকে শুইয়ে রেখেছে বেদীতে। আর সেই

পুজারিণীর হাতে ঝকঝক করছে একটা তলোয়ার। মুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে টারজান একলাফে বেদীতে উঠে এক ঝটকায় তলোয়ারশুদ্ধ মেয়েটিকে ছিটকে ফেলে দিয়ে পাশে দাঁড়ানো এক গরিলা মানুষের হাত থেকে একটা খাঁড়া নিয়ে হুলঘরে লাফিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল—হতভাগা বজ্জাতের দল আয়, এগিয়ে আয়।

এত তড়িৎ ঘটনাটা ঘটে গেল যে, গরিলা-মানুষের দল কিছু বুঝবার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে। আর বাকী যারা ছিল তারা তক্ষুণি ভয়ে দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল। হারে-রে-রে। বলে সব গরিলা-মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে টারজান লাফ দিয়ে বেদীতে উঠে জেনীর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে তাকে দাঁড় করিয়ে বলল—জেনী, জেনী চেয়ে দেখ, আমি, আমি এসেছি।

কিন্তু কে দেবে সাড়া? জেনী ততক্ষণে অচৈতন্য। টারজান খাঁড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জেনীকে কাঁধে তুলে ফিরে দাঁড়াতেই সেই পুজারিণী এসে বাধা দিয়ে বলল—না, তুমি একে নিয়ে যেতে পার না।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান—পথ ছাড়। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাবই।

—তোমার স্ত্রী? বলে কেঁদে উঠল পুজারিণী।

এতদিনের সব আশা কল্পনায়ই রয়ে গেল তার। পেল না সে টারজানকে। হা হা করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল পুজারিণী।

গুপ্তপথ জানাই ছিল টারজানের। সে ততক্ষণে জেনীকে কাঁধে নিয়ে সবার অগোচরে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়েছে শহর ছেড়ে।

একটু পরে অবশ্য পুজারীরা একত্র হয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, কিন্তু তাকে পাবে কোথায়? সে ততক্ষণে তাদের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে গভীর জঙ্গলে।

ছুটতে ছুটতে টারজান যখন দেখল বিপদের আর সম্ভাবনা নেই,

তখন সে একটা নদীর ধারে সযত্নে জেনীকে রেখে তার চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। চোখে জলের ঝাপটা লাগতেই আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল জেনী—আ-আমি কোথায়? বলেই সে ঝট করে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠে—আ-আমি তু-তুমি—! বলেই হঠাৎ চুপ করে টারজানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠে—তুমি টারজান! বলেই টারজানের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে—টারজান, টারজান, তুমি আমায় রক্ষা করেছ? জান, তারা আমায় বলি দিতে নিয়ে গিয়েছিল।

জেনীর পিঠে হাত বুলিয়ে টারজান জেনীকে সান্ত্বনা দেয়—হ্যাঁ জেনী, জানি। আর ভয় নেই। একটু বস তুমি, বিশ্রাম কর। কয়টা ফল নিয়ে আসি আমি। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে আবার রওনা হব। বলেই এক লাফে ছুটে চলে গেল টারজান বনে।

একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে জেনী তাকিয়ে রইল টারজানের সুঠাম দেহের চঞ্চলতার দিকে।

একটু পরেই টারজান একগাদা ফল নিয়ে এল হাসতে হাসতে। তারপর দু'জনে বসে খেতে খেতে কত কথা। জেনী কাঁদতে কাঁদতে বলল তাদের সব বিপদের কথা। জাহাজটা ভেঙ্গে কত কষ্টই না পেয়েছে তারা। তার বাবা, জাহাজের মালিক, ক্যাপ্টেন এরা যে কোথায় সে জানে না। জানে না, টারজানের ভাইকে একা পেয়ে জাহাজের সেই লোকটা কি করেছে।

—জান টারজান! জেনী বলতে লাগল—জাহাজের সেই লোকটা বড় নিষ্ঠুর। সে তোমার ভাইকে কাটতে গিয়েছিল।

—হুম্। বলে মৃদু গর্জন করে উঠল টারজান। বলল ভেবো না। আমরা খেয়ে-দেয়ে যাব তাকে দেখতে। বলল, বটে সে কথাটা, তবুও কোথায় যেন এক ঈর্ষ্যা তাকে চঞ্চল করে তুলল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার রওয়ানা হল তারা। কিন্তু বহুদিনের পথ। যেতে যেতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে জেনী। তাকে বিশ্রাম

দিয়ে দিয়ে দিনের পর দিন চলে টারজান এসে পৌঁছল জেনীদের আস্তানায়। তার ভাই তখন জ্বরে মরণাপন্ন, একা। মাচায় শুয়ে। কেউ কোথাও নেই।

জেনী লাফিয়ে মাচায় উঠে টারজানের ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে বলে—দেখ কে এসেছে। আর ভয় নেই।

টারজানও জেনীর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে মাচায় উঠে তাকিয়েছিল ভাইয়ের দিকে।

রক্তাক্ত ঘোলাটে চোখ তুলে দু'জনকে দেখে তার ভাই বলে উঠে—আঃ, একটু জল।

টারজানেরও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার এ অবস্থা দেখে। সে চট করে নেমে ছুটে যায় নদীর দিকে।

তার ভাই ধীরে ধীরে বলতে থাকে—জেনী, আমি অন্যায় করেছি, পার যদি ক্ষমা কর। আমি-আমি লর্ড গ্রেস্টোক নই। আসল গ্রেস্টোক টারজান। এই দেখ—। বলে সে কোটের পকেট থেকে সেই টারজানের ফেলে দেওয়া টেলিগ্রামটা মেলে ধরে জেনীর সামনে।

টেলিগ্রামের কথা জানত না জেনী। এখন পড়ে সে বিস্মিত হয়ে যায়। টেলিগ্রামটা হাতে ধরে চুপচাপ বসে থাকে সে তার পাশে।

টারজান ইতোমধ্যে একটা বড় পাতার ঠোঙায় করে জল নিয়ে গাছের গোড়ায় এসে থতমত খেয়ে যায় ভাইয়ের কথা শুনে। সে বলে চলেছে—জেনী আমি জানি তুমি টারজানকে চাও। আমাকে নয়। আর তার জন্যই তুমি এতদিন সময় নিয়েছ। কিছুতেই ধরা দাওনি। এই আফ্রিকায় বেড়াতে আসাটাও তোমার অছিলা, আমি জানি। কিন্তু তোমাকে পাবার আশা ছাড়তে পারিনি বলে আমিও এসেছি তোমার সঙ্গে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমরা সুখী হও। আর থাকব না আমি। চললাম।

—না না—একি বলছ তুমি? জেনী তার মুখে হাত চাপা দেয়।

—হ্যাঁ, জেনী, আমায় বলতে দাও। আর তো সময় পাব না।

ভাইয়ের কথা শুনে টারজান ভাবে, তবে কি জেনী প্রত্যাখ্যান করেনি আমায়! সে আমাকে চায়! বুকটা যেন ভরে উঠে তার জেনীর একনিষ্ঠতায়। ভাইয়ের প্রতিও মমতায়। তাকে ভাল করে তুলতে হবে, তাকে—। হঠাৎ হাতের ঠোঙাটায় নজর পড়তেই সাড় ফিরে আসে তার। সে জল চেয়েছিল। সে তক্ষুণি ধীরে ধীরে ঠোঙাটা নিয়ে গাছে উঠে ভাইকে তুলে ধরে জলটা খাওয়ায়।

জলটা খেয়ে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার ভাই বলে উঠে—আঃ বাঁচালে ভাই।

এতটুকু জল—। জান টারজান, আজ দু'দিন আমি জল খেতে পাইনি। হতভাগা জাহাজের লোকটা কোথায় পালিয়েছে কে জানে আমাকে একা ফেলে। অথচ টারজান জান, লোকটাকে নিয়ে শিকার থেকে যখন ফিরে এলাম তখন লোকটার জ্বর। চলতে পারছে না। কি করি! তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে মাচায় উঠে দেখি জেনী নেই। পাগলের মত হয়ে গেলাম। কোথায় গেল জেনী? আর এদিকে লোকটা মাচায় পড়ে কাতরাচ্ছে। ফেলেও যেতে পারি না তাকে। তবুও তাকে একটু শান্ত করে খুঁজতে বেরুলাম জেনীকে। পেলাম না। লোকটারও জ্বর বাড়তে লাগল। দিনরাত বসে থেকেছি তার পাশে। করেছি সেবা। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠল। আর আমি জেনীর খোঁজে বনে বনে ঘুরে, লোটার সেবা করে পড়লাম জ্বরে। উঠতে পারছি না। লোকটা আমাকে দেখেও না। দুদিন আগে আমার পাশে বসে সে জল খাচ্ছিল। আমার প্রচণ্ড পিপাসা। তাকে বললাম, একটু জল দাও ভাই। কিন্তু সে দিল না, টারজান, সে দিল না। সে জল খেয়ে বাকি জলটুকু মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে গেল। আর আসেনি।

—হুম্। বলে মৃদু গর্জন করে টারজান বলল—ভেব না ভাই। লোকটাকে ধরব আমি। তুমি ভাল হয়ে যাবে। আগেরবার যে ঘরটাতে ছিলে তোমরা, সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না ভাই—। তার ভাই বলতে লাগল—ঠিক হবে না। আমি ভাল হব না। পার যদি আমায় ক্ষমা কর। জেনী, জেনী তোমাকে—তোমাকে চায়—। বলতে বলতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

কেঁদে উঠল জেনী। টারজান তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল—কেঁদ না জেনী, এই নিয়ম।

কাঁদতে কাঁদতে জেনী বলল—জান টারজান, সে কি বলেছে? তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক—এই দেখ টেলিগ্রাম। বলে তার দেওয়া টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে ধরে জেনী টারজানের দিকে।

টারজান তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ, জানি। টেলিগ্রামটা আমিই সেদিন ফেলে দিয়েছিলাম। সে কুঁড়িয়ে নিয়েছিল।

—তাহলে, তাহলে তুমি সেদিন বললে না কেন?

কেন বলেছিলে তোমার মা একটা গরিলা? বলে টারজানের হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল জেনী।

—কেঁদ না জেনী, কেঁদ না। টারজান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—সেদিন আমি ভেবেছিলাম, আমি বন্য। সভ্য দেশে মানুষ হইনি আমি, আমাকে নিয়ে সুখী হবে না। তাই আমি ভাইয়ের কাছে তোমাকে রেখে চলে গিয়েছিলাম। যাকগে, যা হবার হয়েছে। এখন চল।

—কোথায়?

—কেন? টারজান বলল—আমি যেখানে মানুষ হয়েছিলাম সেখানে। বাবার সেই ঘরটায়। বেশী দূরে তো নয়। জান জেনী আমি ভাবছি, সে আমাদের বংশেরই তো ছেলে, তার দেহটা আমি বাবা-মার কবরের পাশেই কবর দেব, কি বল!

—আচ্ছা। বলে জেনী উঠে দাঁড়াতেই হৈ হৈ করতে করতে টারজানের সেই নিগ্রো যোদ্ধার দল এসে হাজির।

টারজান বিস্মিত হয়ে বলল—তোমরা!

—হ্যাঁ, মালিক। সর্দার এগিয়ে এসে বলল—তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

— বেশ, চল তাহলে। বলে টারজান ভাইয়ের দেহটা যোদ্ধাদের কাঁধে তুলে সবার সঙ্গে এগিয়ে চলল সেই ঘরের দিকে।

এদিকে টারজান ও জেনীর জন্য যে আরও বিস্ময় জমা হয়ে রয়েছে তা তো আর তারা জানে না?

ঘরটার কাছাকাছি আসতেই চমকে গেল টারজান। চমকে গেল জেনী! বাবা না!

দরজার কাছেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ অধ্যাপক।

—বাবা, বাবা! বলে ছুটে গিয়ে অধ্যাপককে জড়িয়ে ধরল জেনী।

অধ্যাপকও বিস্মিত! —জেনী তুই! চোখে জল অধ্যাপকের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। —মা তোকে কত খুঁজেছি আমি, আমরা। বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে টারজানকে দেখে বললেন—তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম—জাহাজের সেই লোকটা বলেছিল—তুমি নাকি মারা গেছ!

—জাহাজর সেই লোকটা! কোথায় সে? জিজ্ঞাসা করল টারজান।

—জাহাজের মালিকের সঙ্গে বনে গেছে শিকার করতে। সে যা চমকে উঠবে না! বলে হাসতে লাগলেন অধ্যাপক।

—আরও বেশী চমকাবে আমার কাছে এলে!

—না না, টারজান—বলে লাফিয়ে উঠল জেনী কথাটা শুনে। সে বুঝেছিল এবার আর রক্ষা নেই লোকটার। সে বলল—না টারজান, তুমি তাকে কিছু করবে না, হত্যাকারী হবে না তুমি।

ক্যাপ্টেনের হাতে তুমি তাকে তুলে দেবে। তিনিই যা করবার করবেন। কথা দাও।

—হুম্। শান্ত হল টারজান।

যোদ্ধারা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। এবার তারা হৈ হৈ করতে করতে তার ভাইয়ের দেহটা নিয়ে আসতেই অধ্যাপক বললেন —একি!

—হ্যাঁ। টারজান বলল—এখানে কবর দেব তাকে বলে নিয়ে এসেছি।

আক্ষেপে ভরে গেল অধ্যাপকের হৃদয়। তারপর তাদের ঘরে নিয়ে বসে অধ্যাপক বললেন তাদের বিপদের কথা। কিভাবে ভাগ্যের জোরে এরা এসে পড়েছেন এখানে। শুনলেন জেনীর কথা, টারজানের কথা।

এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে দার্নো এসে উপস্থিত।

দার্নোকে দেখেই লাফিয়ে উঠল টারজান। —আরে তুমি?

—হ্যাঁ। হাসতে হাসতে টারজানের দিকে হাত বাড়িয়ে দার্নো বলল—তুমি চলে আসার পর আমারও আর ভাল লাগছিল না। হঠাৎ শুনলাম আমাদের একটা সামরিক জাহাজ এদিকেই আসছে। তাই চলে এলাম এদিকে। ভাবলাম ঘরটা একটু দেখেই যাই। কতদিন তো কাটিয়েছি এখানে। তাই জাহাজ ভিড়িয়ে চলে এসেছি। এসে পেয়ে গেলাম তোমাদের।

একটু পরেই এল সেই লোকটা জাহাজের মালিকের সঙ্গে। সে তো আর জানত না টারজান আছে এখানে। তাহলে সে আসতই না। কথা বলতে বলতেই আসছিল তারা।

দরজার কাছেই বসে ছিল টারজান। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই বাইরে এসে দাঁড়াল সে।

জাহাজের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অতটা খেয়াল করেনি লোকটা। আর একটু কাছে এগিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে

নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে লাফিয়ে উঠল সে—টারজান! পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই আর। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তক্ষুণি সে গুলি করল টারজানকে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি।

টারজান কি আর এ সুযোগ ছাড়ে? একছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লোকটার উপর।

—আরে কর কি? কর কি? বলে সবাই ছুটে গিয়ে নিরস্ত করল টারজানকে। সামরিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিল তারা লোকটাকে। বেঁচে গেল লোকটা।

জেনীদের ছোট্ট জাহাজের মালিক কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। জেনী তার কাছে পরিচয় দিল টারজানের—লর্ড গ্রেস্টোক। দার্নো বলল তার পূর্বজীবনের কথা।

তারপর সবাই মিলে টারজানের ভাইয়ের দেহটা সমাধিস্থ করে ঠিক করল কয়েকদিনের মধ্যে সামরিক জাহাজেই চলে যাবে তারা।

এরমধ্যে টারজান তার আদিবাসী যোদ্ধাদের নিয়ে তার লুকান সব সোনার তালগুলিই নিয়ে এল কাদা মেখে লতা পাতা দিয়ে বেঁধে। কেউ বুঝতে পারেনি এগুলি কি। বুঝতেই দেয়নি টারজান। কারণ সভ্য জগতে থেকে সে বুঝেছিল সোনার প্রতি কি লোভ মানুষের। তাই সে এভাবেই সে এগুলি তুলে রাখল জাহাজে।

সবই হল, কিন্তু—। টারজান একসময় জেনীকে বলল—জেনী, আর তো কোন বাধা নেই—আমাদের বিয়ের?

কি জবাব দেবে জেনী। টারজানের হাত আঁকড়ে ধরে বলল —জানি না।

টারজান ছুটে গিয়ে অধ্যাপককে বলল—স্যার আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।

—কি আশ্চর্য। সানন্দে লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। বললেন—লর্ড

গ্রেস্টোক, আমি তো—আমি তো—আমি আশির্বাদ করছি সুখী হও তোমরা।

তারপর? তারপর মধুরেন সমাপয়েৎ। অবশ্য মিষ্টি কিন্তু ছিল না সেখানে, সবার মুখে হাসি ছাড়া।

তার পরদিনই বিয়ে হয়ে গেল তাদের। সেই ঘরে। যেখানে জন্মেছিল টারজান, বড় হয়ে উঠেছিল যে পরিবেশে। টারজানের ইচ্ছেও ছিল তাই।

এদিকে জেনীর যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন এক যাত্রায় পৃথক ফলই বা হয় কেন? জেনীর মধ্যস্থতায় জেনীর বান্ধবীরও বিয়ে হয়ে গেল তাদের ছোট্ট জাহাজের মালিকের সাথে, তার মায়ের অনুমতি নিয়ে একই দিনে।

তারপর যাত্রা। ছেড়ে দিল জাহাজ তাদের সবাইকে নিয়ে।

কূল থেকে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল আদিবাসী যোদ্ধা ও গরিলার দল বিদায় জানিয়ে।

সবাই তাকিয়ে রইল সেদিকে। বিস্মিত নাবিকের দল। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তারা দেখেনি কখনো—একদিকে গারিলা ও আর একদিকে আদিবাসী যোদ্ধা বিদায় জানাচ্ছে তাদের মালিককে।





টারজান ও গরিলার দল

দার্নোর প্যারিসের বাড়িতে এসেই খবরটা পায় লর্ড গ্রেস্টোক, ওরফে টারজান—জাহাজের সেই লোকটা পালিয়েছে জেলখানা থেকে।

আফ্রিকার এক অংশে জমিদারী কিনে সেখানেই বাস করে টারজান বৌ ছেলে নিয়ে। শুধু বর্ষার সময়টাই লণ্ডনে চলে আসে। লণ্ডনে এলে দেখা-সাক্ষাতের জন্য মাঝে মাঝে চলে আসে প্যারিসে।

দার্নোর সঙ্গে কাটিয়ে যায় কিছুদিন। এবারও তাই এসেছিল সে। এসেই শুনল এই খবর।

স্তম্ভিত হয়ে গেল টারজান খবরটা শুনে।

টারজানকে চিন্তিত দেখে দার্নো বলল—এত ভাববার কি আছে? পালিয়েছে, আবার ধরা পড়বে।

—না বন্ধু, এত সোজা নয়, লোকটা সাংঘাতিক। আমি ভাবছি, তার কত কুকীর্তি আমি ফাঁস করেছি, কত চক্রান্ত ব্যর্থ করেছি। সে এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। আমার ওপর মানে, আমার স্ত্রী ও ছেলের ওপর।

—না না। দার্নো বলল—তুমি যত ভাবছ, লোকটা লণ্ডনে এসে—। কথাও শেষ হয়নি তার কলিং বেল বেজে উঠল। দার্নো বলল—দাঁড়াও, আসছি। মনে হচ্ছে পিওন। উঠে চলে গেল দার্নো।

কিন্তু টারজানের কথাই ঠিক। লোকটা টারজানের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করছে।

একটু পরেই দার্নো ফিরে এসে একটা টেলিগ্রাম বাড়িয়ে দিল টারজানের দিকে। বলল—তোমার টেলিগ্রাম।

—টেলিগ্রাম! কৈ, দেখি। বলে টারজান হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা নিয়ে পড়েই ধপ করে বসে পড়ল।

লাফিয়ে উঠল দার্নো।—কি, কি হল? কার টেলিগ্রাম? কে দিয়েছে?

—জেনী। নীরবে টারজান দার্নোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু দম নিয়ে বলল—দার্নো, আমি যে বলেছিলাম লোকটা প্রতিশোধ নেবে, ঠিক তাই। এই দেখ, পড়ে দেখ টেলিগ্রামটা। জেনী লিখেছে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরতে।

—কিন্তু লোকটাই যে চুরি করেছে—।

কথা শেষ হল না দার্নোর। টারজান বলল—কিন্তু নয়, ভাই,

আমি নিশ্চিন্ত যে ঐ লোকটাই করেছে। যাকগে—। বলে টারজান টুপিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল—আমি চললাম। দেখি কি করতে পারি। বলে সে তক্ষুণি ছুটে চলে গেল রাস্তায়।

লণ্ডনে এসে সব শুনে অস্থির হয়ে পড়ল টারজান।

জেনী তখনও কাঁদছিল তার পাশে বসে—কেন যে ধাই তখন ছেলেকে গাড়ি করে বাগানের ধারটায় নিয়ে গেল? সেখানে না গেলে তো নতুন চাকরটা তাকে আমি ডাকছি বলে বাড়িতে পাঠালেও লোকটা এত তাড়াতাড়ি ছেলেকে রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়িটাতে তুলে দিতে পারত না। পরে চিৎকার করে ছুটে এসেও ধাই ধরতে পারল না গাড়িটাকে। কি হবে টারজান?

—না না, এত ভেঙে পড়ছ কেন? টারজান জেনীর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

এমন সময় ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠতেই টারজান লাফ দিয়ে উঠে বলল—কেঁদো না জেনী, আমি আসছি।

পাশের ঘরে গিয়ে টারজান টেলিফোন ধরতেই ওপার থেকে কে বলল—লর্ড গ্রেস্টোক?

—হ্যাঁ। আপনি কে?

—আমি আপনার বন্ধু।

—বন্ধু! কি নাম?

—নাম জেনে দরকার নেই। তবে জেনে রাখুন, আপনি আপনার হারানো ছেলেকে ফিরে পেতে চাইলে আজই আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হতভম্ব হয়ে গেল টারজান। বলল—তার মানে?

—মানে কিছু নেই লর্ড গ্রেস্টোক। যে আপনার ছেলেকে নিয়েছে তার সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। তাই আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। যদি চান আজ রাত দশটায় ডোভার বন্দরে নাবিকদের যে বিশ্রামাগার আছে সেখানে আসুন, একা। পুলিশকে জানাবেন না,

কাউকে সঙ্গে আনবেন না, একা আসবেন। আমি খুঁজে নেব আপনাকে। বলেই লাইন কেটে দিল লোকটা।

মুহূর্তে টারজান স্থির করে ফেলল সে ডোভার যাবে।

জেনীকে সব কথা বলতেই জেনী বলল—টারজান, আমি যাব তোমার সঙ্গে। আমায় নিয়ে চল তুমি।

—না জেনী। টারজান বলল—তুমি বুঝছ না—লোকটা আমাকে একা যেতে বলছে। আর তাছাড়া, আমি একা গেলেই সুবিধে।

—কিন্তু এখুনি যাবে? জেনী জড়িয়ে ধরল টারজানকে।

টারজান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—এখন না গেলে তো সময়মতো ডোভার পৌঁছতে পারব না জেনী। আমি যাই,কিছু ভেব-না তুমি। বলে টারজান আর দেরি করল না। প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সময়মতই ডোভার বন্দরে পৌঁছেছিল টারজান। রাত তখন দশটা বাজে। চারিদিকে আলো-আঁধারি ঘেরা ছমছমে পরিবেশ। দূরে দূরে দু একটা আলো টিম টিম করে জ্বলছে। ভূতের মত জলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা জাহাজ। জাহাজের আলো জলের ওপর কেমন যেন একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে চারি-দিকে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট নৌকো আর লঞ্চ, মিলে মিশে একাকার। ঢেউয়ের তালে যেন নাচছে, ছলাৎ ছলাৎ।

হাঁটতে হাঁটতে নাবিকদের বিশ্রামাগারটার কাছে এসে দাঁড়াল টারজান। কি স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ! দশ বারোটা নাবিক নরক গুলজার করে তুলেছে ঘরটাতে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না টারজান। এমন সময় তার ডান পাশের অন্ধকার থেকে কে যেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।—লর্ড গ্রেস্টোক?

টারজান লোকটাকে চিনতে পারল না অন্ধকারে। বলল—হ্যাঁ।

—আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ঐ যে জাহাজটা, সেটাতে। ওখানেই রেখেছে তারা আপনার ছেলেকে। এখন জাহাজ ফাঁকা রয়েছে, আসুন।

টারজান আর কথা না বলে লোকটার সঙ্গে একটা ছোট নৌকো করে গিয়ে উঠল সেই জাহাজটাতে। নিজের নিরাপত্তার কথা মনেও এল না তার ছেলের ভাবনায়।

সত্যি জাহাজটা ফাঁকাই ছিল। ডেকের ওপর দিয়ে লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে টারজান জিজ্ঞেস করল—কৈ কোথায় আমার ছেলে?

মৃদু হেসে লোকটা বলল—আসুন। ডেকের নিচে একটা ঘরে আপনার ছেলেকে রেখেছে।

টারজানের আর তর সয় না। সামনেই নিচে নামবার সিঁড়ি দেখে তরতর করে নেমে পড়ল টারজান। জিজ্ঞেস করল—কোথায়? কোন ঘরে?

লোকটা পাশের একটা ঘরের দরজা ঠেলে বলল—এই ঘরে। যান।

বলতে না বলতেই ছুটে গেল টারজান দরজা ঠেলে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এক হ্যাঁচকায় দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল—পেয়েছেন তো লর্ড গ্রেস্টোক?

ঘুল-ঘুলি দিয়ে একটা গর্জন ভেসে এল টারজানের—শয়তান!

হা হা করে হাসতে হাসতে চলে গেল লোকটা। টারজান বুঝল কৌশলে তাকে বন্দী করা হয়েছে, কিন্তু—। সঙ্গে সঙ্গে টারজান তার অমানুষিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপরে। ঝনঝন করে উঠল দরজাটা, কিন্তু ভাঙল না। টারজান বুঝল ইস্পাতের দরজা এভাবে ভাঙবে না। এবার দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ল টারজান। মেঝেতে বসে ভাবতে লাগল, কি করা যায়। ছেলেকে তো নিয়েছে, এবার জেনীর না জানি কি ক্ষতি করে লোকটা।

জেনীর ক্ষতি! এদিকে জেনীও যে তার হাতে ধরা পড়ে গেছে তা তো আর জানে না টারজান!

টারজান চলে যাবার পর জেনীও অশান্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিল ডোভার বন্দরে। কিন্তু ততক্ষণে টারজান জাহাজে বন্দী হয়ে গেছে। জেনী তখন বিশ্রামাগারের দুজন নাবিকের সহায়তায় জাহাজে এসে উঠেছিল। জাহাজে উঠেই সে পড়ে গিয়েছিল সেই লোকটার সামনে। আর তক্ষুণি সে তাকে বন্দী করে রেখে দেয় একটা ঘরে। এদিকে জাহাজও তখন ছেড়ে দিয়েছে। জেনীর কোন কাতর অনুরোধেও কোন ফল হল না।

কেটে গেল আরো কয়েকদিন।

একদিন লোকটা জেনীর কাছে এসে একটা মোটা অঙ্কের চেক দাবী করে বলল—লেডী, আপনাকে আমরা আনিনি। আপনি নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন। যাকগে, আপনি জানেন আপনার স্বামী ও ছেলে এখানেই আছে। আপনি যদি তাদের মঙ্গল চান তবে চেকটা আমাকে দিন। কথা দিচ্ছি আপনাকেও একটা সভ্য দেশে নামিয়ে দেওয়া হবে।

কিছুতেই কিছু হল না। জেনীকে দিতেই হল চেক।

এদিকে টারজানের কাছেও সেই একই বায়নাক্কা। লোকটা টারজানের কাছে নিজে গেল না। তার সহকারী একটা মোটা অঙ্কের চেক দাবী করে বলল—লর্ড গ্রেস্টোক, আপনি আপনার স্ত্রীর নিরাপত্তা, ও আপনার ছেলের মুক্তি নিশ্চয়ই চান। তাহলে এই চেকটা আপনার কাছে কিছুই না। না হলে বুঝতে পারছেন আপনাকে হত্যা করা ভিন্ন আমাদের আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। তারপর আপনার ছেলের—।

—আমার ছেলে কোথায়? গর্জন করে উঠল টারজান।

—এখানে নেই। অন্য জায়গায় ভালই আছে।

অসহায় টারজান কিছুই করতে পারল না। দিতেই হল একটা চেক লিখে।

এরপর কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ। কেউ এল না তার কাছে,

শুধু সুইডেনবাসী একটি নাবিক ছাড়া। সে-ই এসে তাকে খাবার দিয়ে যেত। টারজান বুঝতে পারছিল না লোকটা তাকে কিভাবে মুক্তি দেবে।

হঠাৎ একদিন লোকটার সহকারী এসে বলল—তৈরী হয়ে নিন লর্ড। আমরা একটা জঙ্গলের কাছাকাছি এসেছি। এখানেই আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যাব। জঙ্গলের অভিজ্ঞতা তো আপনার আছেই। কোন অসুবিধে হবে না। আসুন। বলে সে দরজা খুলে একটু দূর থেকে টারজানের দিকে একটা রাইফেল তাক করে রইল। রাইফেল হাতে আর কয়েকটা নাবিকও দূরে দাঁড়িয়ে তাক করে ছিল তার দিকে।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে টারজান বুঝল এতগুলি রাইফেলের সামনে কিছুই করতে পারবে না সে।

সহকারী বলল—পোষাকটা খুলে যান। জঙ্গলে পোষাক দরকার হবে না। বলে সে জাহাজের একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ঐ দিকে। নৌকো তৈরী আছে। যা—আ—ন।

যন্ত্রচালিতের মত তাদের কথামত টারজান পোষাক খুলে নৌকোয় গিয়ে উঠল নাবিকদের সাথে। ছুটে চলল নৌকো তীরের জঙ্গলের দিকে।

ইচ্ছে করলে টারজান নৌকোর এ কয়েকটা নাবিককে ঘায়েল করে জাহাজে গিয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হবে না ভেবে চুপচাপই বসে রইল সে নৌকোয়। ভাবল, তবুও যদি স্বাধীনভাবে চেষ্টা করতে পারি জঙ্গলে গিয়ে।

একটু পরে নাবিকেরা টারজানকে কূলে নামিয়ে তার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে ছুটে নৌকোয় উঠেই ছেড়ে দিল নৌকো। তাকিয়ে রইল টারজান তাদের দিকে। হঠাৎ জাহাজের দিকে নজর পড়তেই দারুণ আক্ষেপে ভরে গেল তার হৃদয়। দেখে, সেই লোকটা ডেকে দাঁড়িয়ে তার ছেলেকে মাথায় তুলে দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু কিছু করার নেই টারজানের। রাগে দুঃখে ছটফট করে উঠল টারজান। তার ছেলে জাহাজে আছে সে কথা জানলে সে কক্ষনো জাহাজ থেকে নামত না। কিন্তু এখন—। জাহাজটা ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে জঙ্গল বরাবর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল টারজান। জাহাজটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

খানিক পরে হঠাৎ তার হাতের চিঠিটার কথা মনে পড়তেই খুলে দেখে লোকটা লিখেছে—লর্ড, তোমার ছেলে এখানেই ছিল। তুমি জানতে না। তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ। তার প্রতিশোধ হিসেবে ছেলের বিনিময়ে টাকাও পেয়েছি। ছেলেকেও তুলে দেব আদিবাসী নিগ্রোদের হাতে। তুমি জঙ্গলেই তো মানুষ হয়েছিল, সে সেখানেই মানুষ হবে আদিবাসী হয়ে। ভাল হবে না, কি বল? নির্বাসিত হয়ে তোমার ছেলের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই তুমি করতে পারবে না। তারপর তোমার স্ত্রীর শাস্তিটা কল্পনা করে নিও।

হাতের চিঠিটা দুমড়ে রাগে গর্জন করে উঠল টারজান—শয়তান।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে কার একটা গর্জন শুনে চমকে তাকিয়েই টারজান দেখে একটা গরিলা তাকে আক্রমণ করতে আসছে। পেছনে আরও আট দশটা গরিলা দাঁড়িয়ে আছে।

আর ভাববার সময় পেল না টারজান। সেও তক্ষুণি ছুটে গিয়ে আক্রমণ করল গরিলাটাকে। লেগে গেল তুমুল যুদ্ধ। টারজান বুঝেছিল এ গরিলাটাই দলপতি। গরিলাদের স্বভাব অনুযায়ী অন্যরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে না এক্ষুণি। দলপতি ঘায়েল হলে আসবে আর একজন।

গরিলার সঙ্গে যুদ্ধে তার অভিজ্ঞতা ছিলই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গরিলাটার ঘাড় মটকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বিজয় উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

তারপরেই এল আরেকজন। এবার টারজান গরিলাটাকে

মেরে ফেলল না। তাকে হার মানিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল—মনে রেখো আমি টারজান। তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী। আমি তোমাদের দলপতি হব না। তুমিই থাকবে। তবে আমি বন্ধু। প্রয়োজনমত আমাকে সাহায্য করবে।

রাজী হল তারা। তারপর থেকে টারজান তাদের সঙ্গেই থাকে, শিকার করে, ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার একটা অস্ত্রের দরকার। অস্ত্র ছাড়া অসহায় হয়ে পড়ে টারজান এক এক সময়।

এমনি একদিন অস্ত্রের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে টারজান এক জায়গায় দেখে একটা চিতা বাঘ একটা গাছ চাপা পড়ে চীৎকার করছে। দয়া হল টারজানের। কোন কিছু না ভেবেই গাছটা তুলে চিতাটাকে মুক্ত করল সে এবং তক্ষুণি তার মনে হল, এবার চিতাটা আক্রমণ করবে তাকে। কিন্তু না, টারজান আশ্চর্য হয়ে দেখল চিতাটা আক্রমণ তো করলই না, বরং তার কাছে এসে পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়ছে। চোখে জল এসে গেল টারজানের। —হায় রে! বনের পশুও হিংসা ভুলে যায় কৃতজ্ঞতায়. অথচ নরপশু সেই লোকটা—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টারজান চিতাটার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে।

চিতা আর গরিলাদের নিয়ে এখন ঘুরে বেড়ায় টারজান বনে বনে। ভাবে লোকটা কোথায়, কোন আদিবাসীর গ্রামে দিয়েছে ছেলেকে কে জানে। এখানে তো কোন আদিবাসী গ্রামই চোখে পড়ল না।

ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে একদিন টারজান সমুদ্রোপকূলে শুয়ে আছে, চিতা ও গরিলারা গেছে শিকার করতে, হঠাৎ নৌকোয় করে কতগুলি আদিবাসী যোদ্ধা এসে ঘিরে ধরল তাকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টারজান। কিন্তু বুঝল তাদের হাত থেকে রক্ষে নেই আর। বর্শা উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারা।

হঠাৎ টারজান কি মনে করে এক চীৎকারে ডেকে উঠল তার

সঙ্গীদের। চীৎকারটাও শেষ হয়নি তার, সমস্ত জঙ্গলটাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল দলটার উপর। আদিবাসী যোদ্ধার দল কিছু বোঝবার আগেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল গরিলা ও চিতার হাতে। অল্প কয়েকজন পালিয়ে বাঁচল। দলপতি পড়ল ধরা।

সেই থেকে দলপতি টারজানের সঙ্গেই থাকে। পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না ভয়ে। আর তাছাড়া একটা কৃতজ্ঞতা-বোধও আছে সরল এই জংলী লোকটার মনে।

তারপর একদিন এই দলপতির নৌকোতেই টারজান সবাইকে নিয়ে এসে পৌঁছল মূল দেশের উপকূলে। সেখান থেকেই সে চালাল তার অভিযান ছেলের সন্ধানে—কোথায়, কোন গাঁয়ে যে লোকটা দিয়ে এসেছে তার ছেলেকে কে জানে! জেনীর কথা তো সে জানেই না।

এদিকে জেনী কিন্তু পালিয়েছে জাহাজ থেকে এক সুযোগে।

টারজানকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজটা মূল দেশের উপকূলে একটা নদীর মোহনায় নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল। তখন রাত। লোকটা ভেবেছিল ভোর হলেই সে জেনী ও তার ছেলের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তার আগেই পালিয়েছিল তারা।

লোকটা নিষ্ঠুর হলেও সবাই তো আর তার মত নিষ্ঠুর নয়। সুইডেনবাসী পরিচারকটি কয়দিন ধরেই ভাবছিল জেনী ও তার ছেলের দুঃখের কথা।

সেদিন রাতে জাহাজটা নোঙর করতেই এক ফাঁকে সে এসে জানিয়েছিল জেনীকে, যদি পালাতে চায় তার ছেলেকে নিয়ে, তবে সে আজ রাতেই তাদের নিয়ে যাবে কূলে।

প্রথমটায় জেনী বিশ্বাস করেনি, কিন্তু তারপরেই সে ভাবল সবাই তো আর লোকটার মত নয়। সেদিন রাত্রেই সে পালিয়েছিল পরিচারকটির সাথে। শিশুটিকে পরিচারকটিই নামিয়েছিল কোলে করে। তারপর গভীর বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সে রাতের

মত। হাতে রাইফেল ছিল তার। সারারাত সে-ই পাহারা দিয়ে রেখেছিল তাদের।

রাতের অন্ধকারে না বুঝলেও পরদিন ভোরে উঠেই জেনী চীৎকার করে উঠেছিল—এ কার ছেলে?

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল—সে কি! একেই তো এনেছিল সেই লোকটা!

জেনী বুঝল যে কোন কারণেই হোক লোকটা ভুল করে এই ছেলেটাকে এনেছে, তার ছেলেকে আনতে পারেনি। তাই সে আর কোন কথা না বলে এই শিশুটিকে সে কোলে তুলে নিল মায়ের মমতায়। তারপর পরিচারকটি তাকে নিয়ে তুলল এক গাঁয়ে। গাঁয়ের সর্দার আশ্রয় দিল জেনীকে। ছেলেটির তখন প্রচণ্ড জ্বর।

এদিকে পরদিন ভোরে জেনীকে ও ছেলেকে জাহাজে না পেয়ে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে লোকটা নাবিকদের নিয়ে রাইফেল হাতে আশে পাশের আদিবাসী গাঁয়ে দিয়েছিল হানা। আদিবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়েও কিছু করতে পারে না রাইফেলের সামনে। ছত্রাখান হয়ে গিয়েছিল তারা, কেউ বা পালিয়ে বেঁচেছিল। একের পর এক গাঁয়ে হানা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল লোকটা—জেনীকে ও ছেলেকে তার চাই।

ঠিক এই সময়ই টারজান গিয়ে পড়েছিল সেই গাঁগুলিতে। শ্বেতাঙ্গের হাতে অত্যাচারিত হয়ে গাঁয়ের লোকেরা ততক্ষণে হয়ে উঠেছিল মারমুখী। এখন একা টারজানকে পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে এসেছিল আক্রমণ করতে। কিন্তু গরিলা ও চিতাকে দেখে তারা পালিয়ে বেঁচেছিল। তবু দুয়েকজন পড়েছিল ধরা। তাদের কাছ থেকেই সে শুনেছিল যে একদল শ্বেতাঙ্গ আরেকদল শ্বেতাঙ্গকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই দলে তারা একটি মেয়ে ও আর একটা শিশুকে দেখেছে। খুঁজে বেড়ানো দলটা বড় সাংঘাতিক। তারাই তাদের গাঁ তছনছ করে দিয়েছে। তাই তারা আর শ্বেতাঙ্গকে বিশ্বাস করে না। যাহোক কোনমতে তাদের শান্ত করে আবার চলল টারজান

তার ছেলের খোঁজে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, মেয়েটি কে? শিশুটি যদি তার ছেলেই হয় তবে কি সেই লোকটা পায়নি তাকে? তাই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

যেতে যেতে সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় সে এসে পড়ল আরেক গাঁয়ে। এই গাঁটা ছিল নরখাদকদের গাঁ। এখানে এসেও সে একই কথা শুনল—একটা দল আরেকটা দলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। টারজান তার বন্য জন্তুদের বনে রেখে একাই এসেছিল গাঁয়ে। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত সে। ভেবেছিল, আজ রাতটা এই গাঁয়ে থেকে কাল সকালেই আবার সে বেরিয়ে পড়বে লোকগুলির খোঁজে।

এদিকে কুচক্রী গাঁয়ের সর্দার কিন্তু ভাবছিল, লোকটা যখন আগের দলটার খোঁজ করছে তখন সে নিশ্চয়ই তাদের শত্রু। সে একা। তাকে যদি গাঁয়ে কৌশলে বন্দী করে আগের দলটাকে খবর দেই তাহলে তারা এসে তাকে মেরে ফেলতে চাইবে। আমরাই তখন তাদের হয়ে লোকটাকে মেরে ফেলব। তাহলে দলটা খুশী হয়ে আর আমাদের উপর অত্যাচার করবে না। আর তারা তো তার মাংসও খাবে না, তাই মাংসটা আমরাই খাব। দুটো কাজই হবে। তাই সর্দার তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আশ্রয় দিল বটে, কিন্তু গভীর রাত্রিতে হাত-পা বেঁধে বন্দী করে সেই দলটাকে দিল খবর।

খবর পেয়ে জাহাজের সেই লোকটা দলবল নিয়ে ছুটে এসে টারজানকে দেখেই চীৎকার করে উঠল—ও টারজান তুই? বলেই সে ছুটে গিয়ে টারজানকে একটা লাথি মেরে বলল—বল, এবার তোকে কে রক্ষা করবে। বলেই আবার লাথি।

সর্দার ছুটে এসে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—না, এখন তাকে এভাবে মারা চলবে না। আমাদের অনুষ্ঠান শেষে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে আমরাই মারব।

তা হলে, যা করবার কর, তাড়াতাড়ি। বলে লোকটা সরে দাঁড়াল।

তারপর গাঁয়ের লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে হৈ হৈ করতে করতে টারজানকে নিয়ে উঠোনের এক কোণে একটা খুঁটিতে বেঁধে আরম্ভ করল নৃত্যানুষ্ঠান। ঢুম দাম করে বাজছে ঢাক, আর মাঝে মাঝে নাচতে নাচতে তারা আলতো করে টারজানের গায়ে বর্শা ছুঁয়ে যায়। জমে উঠেছে আসর।

টারজান বুঝতে পারল আর রক্ষে নেই তার। তখন মরীয়া হয়ে এক ভীষণ চীৎকার করে কাদের ডেকে উঠল সে। ভীষণ এই চীৎকারে থতমত খেয়ে আদিবাসীরা নাচ থামিয়ে দিতেই সমস্ত বনটাই যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। কোত্থেকে কতগুলি গরিলা আর একটা চিতা বাঘ এসে আক্রমণ করল তাদের। যাকে পাচ্ছে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। যে যেভাবে পারল পালাতে লাগল। সাদা লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল। কয়েকজন নাবিক শিকার হয়ে গেল জন্তুদের।

একটাও লোক নেই গাঁয়ে। তখন টারজানের অনুগত সর্দার ছুটে এসে টারজানের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে দিল।

সেদিন রাতে আর কোথাও গেল না টারজান। তার জন্তু সাথীদের নিয়ে সে এই গাঁয়েই থেকে গেল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে আদিবাসীরাও আর গাঁয়ে আসতে সাহস করেনি। তাদেরই ভাগ্য। সারারাত জঙ্গলেই কাটাতে হল তাদের।

তার পরদিন ভোরেই টারজান আবার চলল সেই লোকটার খোঁজে তার দলবল নিয়ে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। কিন্তু এতবড় জঙ্গল, কোথায় পাবে তাকে? খুঁজতে খুঁজতে টারজান হঠাৎ দেখে এক-জায়গায় জাহাজের পরিচারকটির গলা টিপে ধরেছে একটা নিগ্রো যোদ্ধা।

এক লাফে ছুটে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিগ্রোটার উপর। কিন্তু নিগ্রোটার ভাগ্য ভাল সে ছিটকে পড়ে পালিয়ে যেতে পারল। টারজান আর নজর করল না তার দিকে। সে পরিচারকটিকে

কোলে তুলে নিয়ে দেখে সে সাংঘাতিক আহত। একটা বর্শা তখনও বিঁধে রয়েছে তার বুকে। ঝট করে টারজান বর্শাটা তুলে ফেলে বলল—কি হয়েছে তোমার? তুমি এখানে?

তার কাছ থেকেই টারজান শুনল সব। জেনীকেও নিয়ে এসেছে লোকটা, তবে ছেলেটা তার নয়। জেনীকে সে নিরাপদে রেখেও দিয়ে এসেছে দূর একটা গাঁয়ে। কিন্তু কোথায় বলতে পারল না সে। সাংঘাতিক আহত ছিল লোকটা। তার আগেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। কিছুই করতে পারল না টারজান। তাকে সমাহিত করে ক্রুদ্ধ টারজান বেরিয়ে পড়ল জেনীর খোঁজে।

এদিকে লোকটা কিন্তু পড়েছিল আর এক জ্বালায়, টারজান তার পিছু নিয়েছে। অথচ জেনীকে এখনো পাওয়া যায়নি। রাগে তছনছ করে চলেছে সে গাঁয়ের পর গাঁ। আদিবাসীরা রাইফেলের সামনে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারেনি।

তারপর যাহোক খুঁজতে খুঁজতে এক গাঁয়ে জেনীকে দেখেই তো লোকটা রাগে চীৎকার করে উঠল—হতভাগী তুই এখানে! আর আমি সারা দুনিয়া তোলপাড় করছি? বলেই সে ছুটে এগিয়ে গেল সামনে।

কিন্তু জেনীও তো টারজানের স্ত্রী। এত সহজে ভয় পাবার পাত্রী সে নয়। সেও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠল—দাঁড়াও, পাজি, কোথাকার। মুখ সামলে কথা বলো। বলে একটু পেছিয়ে দাঁড়াল সে। তার কোলের ছেলেটা তখন আর বেঁচে নেই। হতভাগ্য শিশু।

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত বার করে হেসে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। ঠিক বলেছ। বলেই সে এক লাফে এগিয়ে এসে বলল—দাও, দাও ছেলেটাকে!

জেনী বলল—হ্যাঁ, নেবে তা জানি। কিন্তু আর তুমি তার কিছু করতে পারবে না। সে এখন সব কিছুর উর্দ্ধে।

—কি? সে নেই? বলেই সে চিৎকার করে উঠল—তবে তোকে

কে এবার রক্ষে করবে? বলেই সে জেনীর হাত ধরতে যেতে ছিটকে দূরে চলে গেল জেনী।

—খবরদার! আগে ছেলেটিকে সমাহিত করে যা বলবার বল। তার আগে নয়।

তাই করল লোকটা। তারপর সে জেনীকে জোর করে নিয়ে চলল তার শিবিরের দিকে। আদিবাসীরা কোন সাহায্যই করল না। তার রাইফেলকে তারা ভয় করে। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল তারা। জেনী অনেক কাকুতি মিনতি করল। কিন্তু লোকটা তার কোন কথাই শুনল না। নিজের আনন্দেই সে মশগুল। এবার টারজানকে বাগে পেয়েছি। তার স্ত্রীর ওপরই শোধ নেব।

কিন্তু সে তো আর জানে না যে তার যম টারজান ছুটে আসছে তার দিকে। এবার আর তার নিস্তার নেই।

খুঁজতে খুঁজতে টারজান ঠিক পৌঁছল এই গাঁয়ে। সেদিনই সন্ধ্যা-বেলায়। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত সে।

এদিকে আদিবাসী সর্দার খুব খুশি। তারাও তো নরখাদক। রাইফেলের ভয়েই তারা আগের দলটাকে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু এবার এই লোকটা একা। তাছাড়া আগের লোকটার কাছে এর কথা শুনেছিল সে। তাকে মারতে পারলে মোটা বকশিস পাবে। তাই সে ভাবল, এই লোকটাকে মেরেই ফেলবে তারা, রাত্রে ঘুমোলে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সর্দার তার বুড়ি স্ত্রীকে বার করে দিয়ে তার ঘরেই টারজানের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু টারজান এ ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়ে বলল—না, এই বুড়ির ঘরে নয়। একজন জোয়ানের ঘর দাও। একজনের খোঁজে এসেছি আমি। সে এক সাদা মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে। কাল ভোরেই আমি চলে যাব। তাদের দেখেছ তুমি?

—না না। সেরকম কাউকে দেখিনি তো! মাথা নেড়ে জানাল সর্দার।

দৈত্যের মত চেহারায় টারজানকে দেখে সে নরখাদক হলেও ভয় যে না হয়েছিল এমন নয়। তবে তার মতলব আলাদা। সে তাড়াতাড়ি আর একটা ঘরে টারজানের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিল।

টারজানও আর কোন কথা না বলে সেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত তখন অনেক। হঠাৎ কার হাতের ধাক্কায় সে ধরমর করে লাফিয়ে উঠে দেখে সেই বুড়ি। অবাক হয়ে টারজান জিজ্ঞেস করল—তুমি?

—হ্যাঁ। বুড়ি মুখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বলে ফিসফিস করে বলল—তুমি আমাকে ঘর থেকে তাড়াওনি, আমি কৃতজ্ঞ। তাই আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি। তুমি পালাও। তারা তোমাকে হত্যা করবে। এখন সব কুটির ফাঁকা। তারা সব অনুষ্ঠানে গেছে—ঐ শোন ঢাকের আওয়াজ।

টারজান কান পেতে শুনল, সত্যিই ড্রিম ড্রিম করে ঢাক বাজছে।

বুড়ি বলতে লাগল—তুমি যাকে খুঁজছ, তাকে লোকটা কোথায় নিয়ে গেছে আমি জানি।

—কোথায়? লাফিয়ে উঠল টারজান

—বলতে পারব না। বুড়ি বলল—তবে লোকটার শিবির আমি চিনি। এস আমার সঙ্গে। বলে তক্ষুণি বুড়ি টারজানকে নিয়ে ছুটল জঙ্গলের দিকে।

সেই লোকটা জেনীকে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সারাদিন সে তার উপর কোন অত্যাচার করতে সাহস পায়নি। কারণ এতগুলি নাবিক আছে সঙ্গে। কার মনে কি আছে সে তো জানে না। তাই সে ভেবেছিল গভীর রাত্রিতে নাবিকগুলি ঘুমিয়ে পড়লে সে একা জেনীর তাঁবুতে ঢুকবে।

তাই করল সে। গভীর রাত্রিতে নাবিকগুলি মদ খেয়ে ঢুলে পড়লে সে একটা রাইফেল নিয়ে ঢুকল জেনীর তাঁবুতে, একা।

গভীর চিন্তায় ঘুম আসছিল না জেনীর চোখে। বসে বসে ভাবছিল সে, কি করবে। ঠিক এমন সময় রাইফেল হাতে নিয়ে লোকটা ঢুকল তার তাঁবুতে। তাকে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জেনী।—কি, কি চাই ?

লোকটা মৃদু হেসে রাইফেলটা মাটিতে রেখে তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল—চাইব আবার কি ? প্রতিশোধ নিতে এসেছি। এবার তোমায় কে বাঁচায় দেখি !

তার কথা শেষ হবার আগেই ঝট করে মাটি থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়েই জেনী দড়াম করে লোকটার মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল—শয়তান ! এত বড় সাহস তোর !

আঘাতটা বেশ জোরেই হয়েছিল। লোকটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এই সুযোগ কি আর জেনী ছাড়ে ? সে তখন মরীয়া। রাইফেলটি হাতে নিয়ে তাঁবুর পিছনের কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল সে।

ছুটতে ছুটতে কোথায়, কতদূর চলে এসেছে কিছুই জানে না সে। তাছাড়া অন্ধকারে খুব একটা স্পষ্ট দেখাও যায় না সব কিছু। তবু ছুটে চলেছে জেনী। শেষে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল সে। কিছুটা সুস্থির হয়ে একটা গাছে উঠে রাত কাটিয়ে ভোর হতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে—আরে ! ঐ তো জাহাজটা। ভাসছে জলে। তাহলে সারারাত আমি সমুদ্রোপকূলে ছিলাম ! ঐ তো পড়ে লাইফ বোটগুলি। ওতে করেই তো লোকটা নাবিকদের নিয়ে এসেছে তীরে। তাহলে তো জাহাজে কেউ নেই। হয়ত দু'একজন আছে। রাইফেল দেখিয়ে তাদের দিয়েই জাহাজ চালিয়ে চলে যাব আমি। এই সুযোগ। বলে সে তরতর করে গাছ থেকে নেমে ছুটে গিয়ে একটা নৌকোয় পড়ে বাইতে লাগল জাহাজের দিকে। কিন্তু এত করেও বুঝি সে আর শেষ রক্ষা করতে

পারল না। পিছন ফিরে দেখে সেই লোকটা নাবিকদের নিয়ে প্রাণপনে নৌকা বেয়ে তার দিকে আসছে।

ভোর বেলা জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁবুর দিকে তাকিয়েই সে বুঝেছিল জেনী পালিয়েছে। তাই সে আর দেরী করেনি। নাবিকদের নিয়ে আন্দাজ করে ছুটে এসেছিল।

জেনী তাকে দেখে আরো জোরে নৌকো বাইতে লাগল জাহাজের দিকে।

লোকটা চিৎকার করে থামতে বলল জেনীকে।

কিন্তু জেনী কি আর থামে? কোনমতে জাহাজের কাছে গিয়ে একটা শেকল ধরে উপরে উঠেই সে দেখে দুটো নাবিক মদ খেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। সে তক্ষুণি তাদের খোঁচা মেরে জাগিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে রাইফেল তাক করে বলল—এই,জাহাজ চালাও।

—এঁ্যা! ধরমর করে লাফিয়ে উঠে জেনীর হাতে রাইফেল দেখে ঘাবড়ে গেল নাবিক দু'জন। কিন্তু কিছু করার নেই। তার আদেশ মতই এগুতে হল তাদের মেশিন ঘরের দিকে। পেছনে রাইফেল হাতে জেনী অনুসরণ করছে তাদের, আর মাঝে মাঝে নজর রাখছে সমুদ্রের দিকে—লোকটা এগিয়ে এসেছে আরও।

নাবিকদেরও হঠাৎ নজরে পরে যায় তাদের বন্ধুদের। তখন তারা যেতে যেতে হঠাৎ জেনীর এক অন্যমনস্কতার সুযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেল কেড়ে নিয়ে তাকে ধরে ফেলে।

একটু পরেই লোকটা দলবল নিয়ে জাহাজে উঠে ছুটে গিয়ে জেনীর হাত ধরে চিৎকার করে উঠে—শয়তানী! অনেক ছুটিয়েছ তুমি। আয়—। বলে সে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একটা কেবিনের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—এবার, এবার তোকে কে রক্ষে করে দেখি। বলে সে হাঁফাতে হাঁফাতে একটা চেয়ারে বসে বলে—রসিয়ে রসিয়ে প্রতিশোধ নেব। দাঁড়া, একটু বিশ্রাম করে নিই।

কিন্তু তার কপাল খারাপ। বিশ্রাম আর তার ভাগ্যে ঘটল না। হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়ল টারজান তার জন্তু-জানোয়ারের দল নিয়ে।

সেদিন টারজানকে নিয়ে বুড়ী যখন বেরিয়ে পড়েছিল গাঁ ছেড়ে তখন রাত খুব একটা বেশী ছিল না। তাছাড়া তার জন্তু জানোয়ার-দের ডেকে আনতেও গিয়েছিল কিছুটা সময়। সবাইকে নিয়ে সে যখন সেই লোকটার শিবিরে গিয়ে পৌঁছেছিল তখন লোকটা জেনীকে তাড়া করছে।

শিবিরে কাউকে না পেয়ে সে তক্ষুণি ছুটেছিল তাদের গন্ধ অনুসরণ করে সবাইকে নিয়ে। বন্য জীবনের, জন্তুদের মত, ঘ্রাণশক্তি তার এখনও আছে। সমুদ্রোপকূলে এসেই সে বুঝেছিল লোকটা গিয়ে জাহাজে উঠেছে। জেনীও আছে।

তারপর টারজান কি আর দেরী করে? তার দলবল নিয়ে গাঁয়ের আদিবাসীদের একটা ডোঙা করে উঠে আসে জাহাজে।

লোকটার নির্দ্দেশ মত জাহাজের নাবিকেরা জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করতেই ছিল ব্যস্ত। তারা অতটা খেয়ালও করেনি। কিন্তু যখন খেয়াল করল তখন আর কিছু করার ছিল না তাদের। 'মারে বাবারে' বলে যে যেভাবে পারে ছুটে পালাতে লাগল। এত আচমকা এতগুলি গরিলা ও চিতাবাঘ এসে তাদের আক্রমণ করবে স্বপ্নেও ভাবেনি তারা। হৈ চৈ চীৎকার চেঁচামেচি ও জানোয়ারের গর্জনে সারা জাহাজে হুলুস্থূল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অনেক নাবিক। টারজান খুঁজে বেড়াতে লাগল লোকটাকে, জেনীকে।

এদিকে লোকটা কেবিন থেকে হঠাৎ এত চিৎকার, চেঁচামেচি, গর্জন শুনে বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বেরিয়ে এল দরজা খুলে—কি, কি হচ্ছে সব? বলেও শেষ করতে পারেনি লোকটা, চিতাবাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কণ্ঠনালীটা ছিঁড়ে ফেলল এক টানে। দড়াম করে পড়ে গেল লোকটা।

টারজান দেখেও কিছু করতে পারে নি। সে ছুটে আসতে আসতে সব শেষ।



আর তক্ষুণি জেনী দরজার ফাঁক দিয়ে টারজানকে দেখে

'টারজা-আ-ন' বলে ছুটে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শান্তি ফিরে এল জাহাজে। টারজান সব জন্তু-জানোয়ারদের শান্ত করে যে নাবিকেরা বেঁচে ছিল তাদের ডেকে বলল—তোমরা যে অপরাধ করেছ তার শাস্তি কি তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। তবে আমি তোমাদের শাস্তি দিতে চাই না। আমি চাই এখন থেকে আমি যা বলব তা শুনবে। রাজী?

সানন্দে চিৎকার করে উঠল সবাই—হ্যাঁ, রাজী।

—বেশ। টারজান বলল—তবে শোন। আজ আমরা এখানে বিশ্রাম করে কাল ভোরে রওয়ানা হব লণ্ডনের পথে।

—কিন্তু! একজন বলে উঠল—জন্তু-জানোয়ারদের কি করবে?

হেসে ফেলল টারজান। বলল—না, ভয় নেই। যাবার আগে তাদের আমি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে যাব।

কেটে গেল দিন। এল রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে পশুর গর্জন। অন্যদিকে ভেঙে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ জাহাজের গায়ে।

নাবিকেরা নিশ্চিন্ত হলেও তবুও কোথায় যেন লেগে থাকে এক অশান্তি তাদের মনে জন্তুগুলির ভয়ে। সারা জাহাজেই ছড়িয়ে রয়েছে তারা, যদিও আর কিছু অত্যাচার করেনি। নাবিকেরা বুঝতে পারে না টারজান লোকটা মানুষ না অন্য কিছু। কি করে পোষ মানাল সে এতগুলি জন্তুকে! কিন্তু লোকটা যে ভদ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাদের।

এদিকে টারজানও ঘুমিয়ে রয়েছে পরম শান্তিতে এতদিন পর জেনীকে পেয়ে। কিন্তু শান্তি তার কপালে থাকলে তো!

চিতাবাঘের কবলে পড়ে সেই লোকটা শেষ হয়ে গেলেও তার সহকারী কিন্তু তখনও বেঁচে ছিল। জন্তু-জানোয়ারের কবল থেকে কোনমতে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে একটা লাইফবোট নিয়ে সে পালিয়ে যায় কূলে।

সেদিন রাত্রিতে তার গুরু যা পারেনি সেই টারজানের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় চুপিচুপি সে এসে জাহাজে উঠে। তার ভাগ্য ভাল জাহাজে উঠেই সে কোন গরিলার সামনে পড়েনি, পড়েছিল এক নাবিকের সামনে।

নাবিক তাকে দেখেই চিনে ফেলে। সে তক্ষুণি তার হাত চেপে ধরে বলল—তুমি ?

থতমত খেয়ে সাগরেদ বলল—হ্যাঁ, ভাই আর—আমি—।

—না—। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে নাবিক বলল—না, এক্ষুণি চলে যাও—তোমাকে আমরা চিনি। না হলে—।

—না ভাই। অনেক কাকুতি-মিনতি করে সাগরেদ বলল—আমি চলেই যাব। শুধু আমার কেবিন থেকে আমার কয়টা জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দাও।

—জিনিষপত্র ?

—হ্যাঁ, কয়টা জিনিসপত্র নিয়েই আমি চলে যাব।

কি মনে হল নাবিকটির। বলল—বেশ। চল। বলে সে নিজেই তাকে সঙ্গে করে তার কেবিনে পৌঁছে দিল। কিন্তু সে দাঁড়িয়েই রইল বাইরে। কারণ তারও তো ভয় আছে। সাগরেদকে অনেকেই চেনে। তাকে সাহায্য করছে বলে যদি কেউ তাকেও না বিশ্বাসঘাতক বলে ভাবে! তাই তাকে যত তাড়াতাড়ি পারে বিদেয় করতে পারলেই মঙ্গল।

একটু পরে লোকটা কতগুলি জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার নৌকো। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল নাবিক।

আর তারপরেই ঘটল বিস্ফোরণ।

তখন ভোর হয় হয়। অনেকেই উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। একটু পরেই জাহাজ ছাড়বে। সবাই খুশি। কতদিন পরে তারা যাবে তাদের নিজেদের দেশে। এমন সময় হঠাৎ এক বিস্ফোরণে চূর্ণ হয়ে

গেল জাহাজের একটা অংশ। ভাগ্যক্রমে জাহাজের ঐ অংশটাতে কেউ ছিল না তখন। আহত হয়নি কেউ। ভয়েছুটোছুটি করতে লাগল সবাই। বিশেষ করে টারজানের জন্তু-জানোয়ারের দল।

ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠেছিল সেই নাবিক। সে বুঝেছিল এটা সেই সাগরেদেরই কাণ্ড। নিশ্চয়ই সে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার অছিলায় কোন বিস্ফোরক পদার্থ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু সেকথা তো সে কাউকে বলতেও পারে না। হতভম্ব হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল টারজানও। ভাবছিল, আরও কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই না কাটাতে হবে তাকে। ছেলেটিকে পাওয়া গেল না এখন ও। কিন্তু মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করল না সে, পাছে জেনী ঘাবড়ে যায়।

এদিকে জাহাজে আগুন ধরে গেছে। আর ভাববার অবসর পেল না টারজান। তাড়াতাড়ি সে সবাইকে লাইফবোটে নিয়ে কূলে এসে পৌঁছল। কিন্তু জন্তুগুলি আগুন দেখে এত ভয় পেয়েছিল যে তারা পাড়ে নেমেই ছুটে পালিয়ে গেল জঙ্গলে।

তা দেখে জেনী টারজানকে বলল—এরা আর আসবে না টারজান?

জন্তু-জানোয়ারদের দিকে তাকিয়ে টারজানও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। জবাব দিল—কি জানি?

একজন নাবিক জিজ্ঞেস করল—স্যার! আমাদের কি হবে?

—কিছু না। টারজান বলল—আমি যখন আছি, তোমাদের কোন ভাবনা নেই। দরকার পড়ে বড় দেখে একটা নৌকো বানিয়েই না হয় চলে যাব আমরা। ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

সত্যি ব্যবস্থা একটা হয়েই গেল, তবে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে।

কেটে গিয়েছিল অনেকদিন। নাবিকেরা হয়ে উঠেছিল অসন্তুষ্ট. বিশেষ করে দুইজন নাবিক। ভাগ্যচক্রে সেই দুইজন বিশ্বাসঘাতক

নাবিকের সঙ্গে একদিন জঙ্গলে কয়েকজন জল দস্যুর দেখা হয়ে যায়। তাদের কাছ থেকেই তারা জেনেছিল যে তাদের একটা জাহাজ আছে, কিন্তু চালাবার লোক নেই। জাহাজটা তারা লুকিয়ে রেখেছে খাঁড়ির মধ্যে। তাদের মধ্যে একজন জাহাজ চালাতে পারত। তখন তারা দুজনে মিলে ঠিক করল, এই সুযোগ। টারজানের স্ত্রীকে জলদস্যুদের কাছে বিক্রি করে মোটা টাকা পেয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাব। দস্যুগুলি জাহাজ চালাতে জানে না বলে আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

টারজানও তার অনুগত আদিবাসী দলপতির অনুপস্থিতিতে একদিন তারা করলও তাই।

টারজান এসে সব শুনে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে শিবির থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন শ্বেতাঙ্গ এসে বাধা দিল তাকে—স্যার। আমি জানি, আপনি আপনার স্ত্রীর খোঁজে যাচ্ছেন।

—কি? বলে টারজান তার হাত চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল—কি বললে? তুমি জানলে কি করে? তুমি কে?

—আমি দেখেছি স্যার। লোকটা বলল—এখানে খাড়ির মধ্যে জলদস্যুদের একটা জাহাজ আছে আমি তাদের মধ্যেই ছিলাম। তারা জাহাজের সব অফিসারদের খুন করেছে। আমাকেও ধরতে এসেছিল। কিন্তু একটা লাইফবোটে আমি পালিয়ে এসেছি। আপনার স্ত্রীকে জাহাজে নিয়ে তুলেছে তারা। যদি চান আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

টারজান তখন তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ স্যার, আসুন।

—বেশ চল। বলে টারজান এগিয়ে যেতেই লোকটা দাঁড়িয়ে গেল।

—স্যার, একা? তাদের হাতে রাইফেল আছে স্যার। লোকটা বলল।

—ভয় নেই, এস। বলেই টারজান বিকট চিৎকার করে ডাক দিল তার জন্তুদের।

হুদ্দাড় করে সমস্ত বন ভেঙ্গে ছুটে এল তারা। ভয়ে কেঁদে উঠল লোকটা। টারজান লোকটার কাঁধে হাত রেখে বলল—ভয় নেই, আমার অনুগত। এস।

কিন্তু তবুও কি লোকটার ভয় কমে? সে যন্ত্র চালিতের মত চলতে লাগল টারজানের সঙ্গে।

তারপর টারজান যখন তার দলবল নিয়ে জাহাজে উঠল তখন দস্যুরা লড়াই করবে কি? দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল ভয়ে। বনের জন্তু জাহাজে এসে আক্রমণ করবে তারা কল্পনাও করতে পারেনি। বহু জলদস্যু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল গরিলা ও চিতার আক্রমণে। কিছু পড়ল ধরা টারজানের হাতে সেই বিশ্বাসঘাতক নাবিক দুজনও। জেনীকে পেয়ে গেল টারজান।

তারপর?

তারপর আর কি? তারপর টারজান জন্তু-জানোয়ারদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে শিবির থেকে সব নাবিকদের নিয়ে চলল লণ্ডনের পথে।

লণ্ডনে তার বাড়িতে এসে দেখে ধাই কোলে করে বসে আছে তার ছেলেকে। তখন টারজান ও জেনীর আনন্দ দেখে কে।

শুনল, যারা তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তারা সেই লোকটার হাতে তাকে তুলে দেয়নি। দিয়েছিল অন্য একটি শিশু। লোকটা ধরতে পারেনি। চোরগুলি তখন লর্ড গ্রেস্টোকের এটর্নীর কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে ফিরিয়ে দিতে যায় ছেলেকে!

আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল টারজান ও জেনীর দুজনেরই।



আরণ্যক টারজান ®

তখনও টারজান টারজান হয়নি, হয়নি সভ্য, হয়নি সংসারী জেনীকে নিয়ে, তার জন্মবৃত্তান্তের কিছুই জানে না সে, সেই সময় সে একদিন গাছের ডালে বসে দোল খাচ্ছে আপন মনে। ভরা যৌবন তার, চঞ্চলতা তার সর্বাঙ্গে। দোল খাচ্ছে আর লক্ষ্য রাখছে গরিলা দলটার দিকে। বিশেষ করে একটি মেয়ে গরিলার দিকে। গরিলাদের মধ্যে সে সুন্দরী।

গরিলার দলটা একটা ফাঁকা জায়গায় বসে কথাবার্তা বলছিল নিজেদের ভাষায়। দু'একটা কথা টারজানের কানেও আসছিল বটে, কিন্তু সে ততটা মনই দিচ্ছিল না। মেয়ে গরিলার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল নানা কথা। ছোটবেলারই সাথী সে। এখন বড় হয়েছে। হয়েছে সুন্দরী। ছোটবেলার সাথী আরও দুয়েকজন আছে দলটাতে, তারাও হয়েছে বড়। যেমন সবচেয়ে বড়, বিরাট আকারের গরিলাটা। ছোটবেলা থেকেই তো খেলছে তার সাথে। এখন হয়েছে বড়, বিরাট।

হঠাৎ বিরাট গরিলাটা মেয়ে গরিলাটার গা ঘেঁসে এসে বসতে গর্জন করে ছুটে এল টারজান।—না, এ আমার।

—কি, এতবড় কথা? বলে বিরাট গরিলাটা তেড়ে এল টারজানকে।

এমন ব্যবহারে টারজান কি আর ঠিক থাকতে পারে?—তবে রে! বলেই দুম করে সে বসিয়ে দিল এক ঘুঁসি তার বন্ধুকে। বান্ধবী সরে বসল।

লেগে গেল লড়াই বন জঙ্গল ভেঙ্গে।

এই ফাঁকে কোত্থেকে একটা চিতাবাঘ এসে লাফিয়ে পড়ল মেয়ে গরিলাটার সামনে। হৈ হৈ চিৎকার, চেঁচামেচি করে সব গরিলা পড়িমরি করে উঠে পড়ল গাছে। টারজানের বান্ধবীকে চিতা করল তাড়া! তা দেখে বন্ধুটি লড়াই ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়ল গাছে। কিন্তু টারজান গেল রেগে। কি এতবড় আস্পর্দা চিতাটার? বান্ধবীকে করবে তাড়া? সে তক্ষুণি ছুটল চিতার পেছনে। চিতাও তখন বিপদ বুঝে তার বান্ধবীকে ছেড়ে দাঁত খিঁচিয়ে এল টারজানের দিকে। টারজান তো এটাই চাইছিল। এই ফাঁকে বান্ধবী গিয়ে উঠল গাছে। আর টারজান কোমর থেকে ঘাসের দড়ির ফাঁসটা তুলে ছুঁড়ে দিল চিতাটার গলায়। চিতা পড়ল বিপদে। শিকার ধরা ছেড়ে দিয়ে এখন সে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এত

সহজে কি মুক্ত করতে পারে ? এই সুযোগে টারজানও উঠে পড়ল একটা গাছে। এদিকে বাঘটা কোনমতে দড়ি ছিঁড়ে হাওয়া।

বনের পশু হলেও বান্ধবী ভালবাসা বোঝে। বিপন্মুক্ত হয়ে বান্ধবী তখন চট করে গাছ থেকে নেমে টারজানের কাছে সরে এল। পাত্তাই দিল না বন্ধুকে। কিন্তু টারজান শত হলেও মানুষ। কতক্ষণ ভাল লাগবে পশুর সান্নিধ্য ? সে একটু পরে একা একাই চলে গেল বনে শিকার করতে। কিন্তু ফিরে এসেই আবার বন্ধু ও বান্ধবীকে একসাথে বসে থাকতে দেখে ব্যথা পায় মনে। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। মুখে মানুষের ভাষা নেই তার সত্য, কিন্তু মনটা তো আছে। কি মনে করে সে আবার চলে যায় বনে। ভাবে, আর ফিরবে না সে তাদের কাছে।

গাছ থেকে গাছে লাফাতে লাফাতে কোথায় যে সে চলে এসেছিল কিছুই মনে নেই তার। হঠাৎ সে দেখে এক জায়গায় কতগুলি আদিবাসী যোদ্ধা একটা কাঠের খোঁচা পেতে রেখে চলে গেল গাঁয়ে। সে বুঝতে পারল না কি এটা। কেনই বা তারা এটা রেখে গেল এখানে ? টারজান খানিকক্ষণ পর খুঁটিয়ে দেখে তাদের গন্ধ লক্ষ্য করে গিয়ে উঠল তাদের গাঁয়ের পাশে। সারারাত্রি সে লক্ষ্য করল তাদের উপর। ভোর হতেই শিকারীরা যখন চলল আবার, সেও তাদের পেছনে চলল অনুসরণ করে।

খাঁচাটা ছিল একটা ফাঁদ। একবার এটার ভিতরে কোন পশু পড়লে সে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। এমনকি গরিলা হলেও না। পারলও না, টারজানের বন্ধু।

টারজান চলে যেতে তার বন্ধুও চলে গিয়েছিল শিকারে একা। শিকার করতে করতেই সে এসে পড়েছিল এই খাঁচাটার সামনে। সে ছিল অত্যন্ত একরোখা। বাধা পেয়ে সে অত্যন্ত রেগে তার ভেতর দিয়েই চলে যেতে গিয়েছিল। কিন্তু পড়েছিল আটকে। টারজান তো এটা জানত না।

ফাঁদটাতে একটা গরিলা পড়েছে দেখে লোকগুলির কি উল্লাস। তারা খাঁচাটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল গাঁয়ে। টারজনও খুব খুশি। বান্ধবী এখন তার। সে আনন্দে লাফাতে লাফাতে গিয়ে উঠল বান্ধবীর কাছে।

বান্ধবী জিজ্ঞেস করল—বন্ধু কোথায় ?

টারজান বলল—আটকা পড়েছে বন্ধু। আদিবাসী যোদ্ধারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

—কেন ? আঁতকে উঠল বান্ধবী। কেমন যেন বিষাদ ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

চোখ এড়াল না টারজানের। বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে কি মনে করে সে তক্ষুনি ছুটে চলল আদিবাসীদের খোঁজে। গিয়ে পেয়েও গেল সে।

আদিবাসীরা তখনও ঠেলে নিয়ে চলেছে ফাঁদটা। এক-সময় পরিশ্রান্ত হয়ে তারা বিশ্রাম করতে লাগল। ক্ষিধেও পেয়েছিল তাদের। কিছু আদিবাসী চলেও গেল শিকার করতে। কয়েকজন বিশ্রাম করতে করতে পড়েছিল ঘুমিয়ে। একটু দূরে খাঁচাটার কাছে একজন বসে ছিল পাহারা দিয়ে।

টারজান হঠাৎ নিঃশব্দে নেমে এসেই পাহারাদারটার গলা টিপে তাকে অজ্ঞান করে ফিসফিস করে তাদের ভাষায় বন্ধুকে চুপ করতে বলল। তারপর খাঁচাটার কাঠের গরাদ ভেঙ্গে ফেলল অমানুষিক শক্তিতে। বেরিয়ে এল বন্ধু। তারপর পাহারাদারের অজ্ঞান দেহটা খাঁচাটায় ভরে দিয়ে টারজান বন্ধুকে বলল—তুমি চলে যাও বান্ধবীর কাছে। সে তোমার। আমি চাই না তাকে।

—কেন তুমি ? বন্ধু জিজ্ঞেস করল।

—না। তুমি গরিলা, বান্ধবীও গরিলা। টারজান মানুষ। সে একাই থাকবে। যাও। বলে টারজান বন্ধুকে ছেড়ে চলে গেল একা।

তারপর থেকে একা একাই সে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন পড়ল বিপদে।

সেদিন সে গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখে একটা গাছের নিচে কতকগুলি যোদ্ধা একটা বিরাট গর্ত খুঁড়ে তাতে মাটি ঘাস চাপা দিয়ে রাখছে। সে বুঝতে পারল না এটা কি? এটাও কি একটা ফাঁদ? কি জানি! সে চলে গেল সেখান থেকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার দেখা হল তার প্রিয় হাতিটার সঙ্গে। তার পিঠে উঠে সে শুয়েও রইল খানিকক্ষণ। তারপর চলেও গেল শিকার করতে। কিন্তু শিকারে আজ আর তার মন নেই। নানা কথা ভিড় করে এল তার মনে। তার বন্ধুর কথা, বান্ধবীর কথা, হাতিটার কথা।

অনেক দিনেরই বন্ধু তার হাতিটা। কি জানি, সে ভালবাসা বোঝে কিনা? উপকারীর প্রত্যুপকার করে সে? কিছুই ভাল লাগছিলনা টারজানের। গাছ থেকে গাছে লাফিয়েই বেড়াচ্ছিল সে। এমন সময় হঠাৎ কতগুলি আদিবাসীর চিৎকার শুনে সচকিত হয়ে সে দেখে তার হাতিটাকে তাড়া করেছে তারা। চকিতে মনে পড়ে গেল তার গর্তটার কথা। তবে কি হাতি ধরবার জন্য গর্ত খুঁড়ছিল তারা? সে আর দেরি করতে পারল না। তীর বেগে ছুটে গিয়ে হাতিটাকে থামিয়ে গর্তটা দেখিয়ে দিল তাকে। বুঝে গেল হাতিটা। আর তক্ষুণি সে ছুটল অন্যদিকে। টারজানেরই দুর্ভাগ্য তার বন্ধুকে সে বাঁচাল বটে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিজে পড়ে গেল গর্তে। এত উঁচু থেকে পড়ে হঠাৎ মাথায় আঘাত লেগে হয়ে গেল অজ্ঞান।

হৈ হৈ করতে করতে আদিবাসীরা এসে হাতি পেল না বটে, কিন্তু তার বদলে টারজানকে পেয়ে তাদের কি উল্লাস। এতদিনে তাদের অত্যাচারী বনদেবতাকে হাতে পাওয়া গেছে। তারা এক্ষুণি তাকে টেনে হিঁচড়ে গর্ত থেকে তুলে, হাত-পা বেঁধে নিয়ে গেল গাঁয়ে। আর তাকে দেখার জন্য সবাই এল ভিড় করে। অনেকে রাগে ঝাঁপিয়ে

পড়ল তার উপর। তখন সর্দার না বাধা দিলে কি হত টারজানের কেউ জানে না।

সর্দার হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলল—না, এখন না। আজ রাত্তিরে উৎসব হবে। তখন বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হবে তাকে। বলে টারজানকে নিয়ে সর্দার বন্দী করে রাখল একটা কুঁড়ে ঘরে। পাহারা দিয়ে রাখল দুজন।

কিন্তু সে টারজান। তাকে বন্দী করা এত সহজ নয়। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বলেই তারা তাকে বন্দী করতে পেরেছিল। তারা তাকে বন্দী করে চলে যাওয়ার খানিক পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল তার। তক্ষুণি সে বুঝে গিয়েছিল সে কোথায়, কারা তাকে ধরেছে, কি করবে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সে তাই সারা বিকেল ধরে অনেক চেষ্টা করে হাত-পায়ের বাঁধন আলগা করে ফেলেছিল!

সন্ধে বেলায় উৎসব জমে উঠতেই সেই দুজন পাহারাদার তাকে নিতে এসেছে, আচমকা সে এক ভীষণ চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর।

হতচকিত যোদ্ধারা ছিটকে পড়ল মাটিতে। হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠল সর্দার বর্শা হাতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। হতভম্ব যোদ্ধারা চিৎকার, চেঁচামেচিতে কিছু বুঝে উঠবার আগেই লেগে গেল হুলুস্থুল।

বন-বাদাড় ভেঙ্গে টারজানের প্রিয় হাতিটা ডাক শুনে ছুটে এসে তছনছ করে ফেলল সমস্ত গাঁ। দলে পিষে একাকার। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা পালাল। টারজান তখন হাসতে হাসতে হাতির পিঠে উঠেই চলে এল গাঁ ছেড়ে।

এভাবেই দিন যায় টারজানের। কখনো হাতির সঙ্গে খেলা করে, কখনো শিকার ধরে, কখনো তার বাবার ঘরে 'বই পড়েই দিন যায়। তার আস্তানায় সে যায় না বহুদিন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি মনে হতেই সে গিয়ে উঠল তার গরিলাদলের আস্তানায়। গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল তার বান্ধবীর কোলে ছেলে দেখে। কি সুন্দর বাচ্চাটা! খুব খুশি হয়ে টারজান হাত বাড়িয়ে তার বান্ধবীকে বলল—দাও না, বাচ্চাটাকে দেখি।

—না—না—। বলে চট করে সরে গেল বান্ধবী।

ছুটে এল বাচ্চাটার বাবা, টারজানের বন্ধু, দাঁত খিঁচিয়ে।

টারজান তক্ষুণি তার দড়ির ফাঁসটা তার বন্ধুর পায়ে গলিয়ে তাকে দিল আটকে গাছের ডালে। পরিত্রাহী চিৎকার করে তার বন্ধু ঝুলতে লাগল গাছে। মজা পেয়ে সবাই এল দেখতে। তার বান্ধবীটিও ছেলেকে মাটিতে এক জায়গায় রেখে এল দেখতে।

হৈ চৈ চিৎকার, চেঁচামেচিতে সরগরম জায়গাটা, এমন সময় হঠাৎ টারজান দেখে একটা ঝোপের আড়ালে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে একটা চিতাবাঘ ছেলেটাকে ধরবে বলে। সে তক্ষুনি ফাঁসটা তার বন্ধুর পা থেকে খুলে—হেই—বলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাটার উপর। চিতা তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে আক্রমণ করল টারজানকে। এই ফাঁকে বান্ধবী ছেলেটাকে কোলে তুলে এক লাফে গাছে।

মুহূর্তে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে বন্ধুও গিয়ে পড়ল টারজানের সাহায্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিতাটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না। তখন বিজয়োল্লাসে বিকট এক আওয়াজ করে টারজান গিয়ে সবার সামনে দাঁড়াতেই তার বান্ধবী এসে তার ছেলেটাকে তুলে দিল টারজানের হাতে। এতক্ষণ সে ভয় করছিল বলেই সে ছেলেকে দেয়নি টারজানের হাতে। এখন বুঝল টারজান বন্ধু—ভয় নেই টারজানকে। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে টারজান তো খুব খুশি। সে খানিকক্ষণ ছেলেটাকে আদর করে চলে গেল সেখান থেকে।

ইদানীং টারজানের যেন আর কিছু ভাল লাগছে না। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। তাই সে আজকাল তার বাবার ঘরেই থাকে।

ক্ষিধে পেলে শিকার করে এনে খায়, আর বই পড়ে। উচ্চারণ সে করতে পারে না, কিন্তু পড়তে পারে তেমনি একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা শব্দ দেখে চমকে উঠল সে—ঈশ্বর! ঈশ্বর কি? মন তোলপাড় করে উঠল তার। সে তক্ষুণি বই-টই ফেলে গরিলার আস্তানায় এক বৃদ্ধ গরিলাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কথাটার মানে। সে বলল—না, আমি জানি না। আদিবাসীরা আমাদের থেকে বুদ্ধিমান। তাদের মধ্যে হয়ত কেউ বলতে পারে।

টারজান আবার ছুটল গাঁয়ে। রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। সে গিয়ে পেয়ে গেল আদিবাসীদের যাদুকরকে। কি কারণে যাদুকর তখন মুখে মুখোস ও রঙ-চঙ মেখে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে কি করছিল সবার সামনে। টারজান চুপিচুপি তার পিছনে গিয়ে বলে উঠল—তুমি জান কে ঈশ্বর?

চমকে উঠল যাদুকর। কিন্তু কিছু না বলে বিকট চিৎকার করে উঠল সে। গাঁয়ের লোকেরা এর মধ্যে যাদুকরের প্রভাবে ভীত হয়েই ছিল, টারজানকে দেখে আরও ঘাবড়ে গেল তারা। আক্রমণ করবে কি, চুপচাপ ভয়ে কাঁপতে লাগল সবাই।

টারজান কিন্তু আরও এগিয়ে এসেছে যাদুকরের কাছে। যাদুকরও ভয়ে পেছুতে পেছুতে হঠাৎ এক দৌড়। কিন্তু টারজান ছাড়লে তো! সে গিয়ে ঠিক তার গলা টিপে ধরল। যাদুকর যায় আর কি? কিন্তু, হঠাৎ কি মনে করে 'ধ্যুৎ' বলে সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল ঝোপের আড়ালে।

যাদুকরের এই হেনস্থায় সর্দার কিন্তু গিয়েছিল খুব রেগে। কারণ এই যাদুকরের বুজরুকীর সাহায্যে সে আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছিল সবার উপরে। এখন সবই যে যায়। তাই সে চুপিচুপি গিয়ে ছুরি নিয়ে টারজানকে করল আক্রমণ। কিন্তু বুড়ো মানুষ টারজানের সঙ্গে পারবে কেন? চকিতে টারজান তাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে ছুরি বসাতে গিয়ে কি মনে করে ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগল—এটাই

কি ঈশ্বর ? এই যে আমি ছেড়ে দিলাম ? কি জানি ! ছুটে চলে গেল লোকটা। টারজান তার দিকে তাকিয়ে রইল।'

মনের অশান্তি কিন্তু তার গেল না। ঘরে এসে ভাবতে লাগল বান্ধবীর একটা ছেলে আছে, কিন্তু আমার ? আমার কই ?

অত্যন্ত অস্থির হয়ে কয়দিন কাটিয়ে একটা ছেলে যোগাড় করে ফেলল সে। দশ বৎসরের আদিবাসীদের এক ছেলে। সে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল নদীতে জল আনতে। টারজান হঠাৎ এসে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু ছেলেটাকে আনলে কি হবে ? সে মনমরা হয়েই থাকে। মাঝে মাঝে কাঁদে আর বলে—আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এস। খায় না, দায় না। রোগা হয়ে যায় ছেলেটি। তাকে দেখে কিছুদিন পর টারজান ভাবল, নাঃ একে রাখা যাবে না। তাকে দিয়েই আসব। নাহলে আরো রোগা হবে যাবে সে। তাই একদিন সে ছেলেটিকে নিয়ে রওয়ানা হল গাঁয়ের দিকে।

এদিকে তার মায়ের অবস্থাও তাই। দিনরাত কাঁদে সর্দারের পায়ে পড়ে—আমার ছেলেকে এনে দাও। যাদুকরকেও বলে সে। কিন্তু যাদুকর কোত্থেকে আনবে তাকে ? তাই একদিন সে পাহাড়ের উপরে বড় যাদুকরের কাছে যাবার অনুমতি চায় সর্দারের কাছে। সর্দার আঁতকে উঠে—ধমকে বলে—খবরদার ! ওখানে যাবি না। না ধমকে সে করবে কি ? গাঁয়ের যাদুকরকে ছেড়ে যদি বড় যাদুকরকে ধরে সে তবে তার আধিপত্য আর থাকবে ?

কিন্তু মায়ের মন, বুঝলে তো ! ছেলেটির মা একদিন গোপনে লুকিয়ে গিয়েই দেখা করল বড় যাদুকরের সঙ্গে।

বড় যাদুকর সব শুনে বলল—হ্যাঁ, এনে দেব তোমার ছেলে। কিন্তু তার জন্য পাঁচটা ছাগল, মাদুর ইত্যাদি এনে দিতে হবে আমাকে।

গরীব মা এসব পাবে কোথায়, তাই সে কাঁদতে কাঁদতেই ফিরে আসছিল গাঁয়ে। এমন সময়ই টারজান তাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটিকে

দিয়ে দেয় তাকে। এতদিন টারজানকে সে ভয়ই করে আসছিল, কিন্তু এখন তার দয়া দেখে তার পায়ে পড়ে বলে—প্রভু, তুমি আমার প্রভু।

টারজান তাদের কথা বোঝে না। কিন্তু মনটা তার আনন্দে ভরে উঠল মা ও ছেলের মিলনের দৃশ্যে। তাদের সে সঙ্গে করে দিয়েও এল গাঁয়ে।

বড় যাতুকর কিন্তু এত সহজে ছাড়ল না তাঁকে। একবার যখন লোভের সন্ধান পেয়েছে সে এত সহজে কি ছাড়তে পারে? তুদিন পরেই সে তাদের গাঁয়ে গিয়ে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল। তার জন্যই নাকি সে ছেলেকে ফিরে পেয়েছে। ছাগল তার চাই। কিন্তু ছেলেটির মা তা শুনবে কেন? ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছে বন দেবতা। তাকে ছাগল দেবে কেন? যাতুকরও শুনবে না। যাতুকর বলে কথা, সর্দার ঘাঁটাতেও ভরসা পায় না। এই টালবাহানার মধ্যেই বড় যাতুকর তার ছেলেকে চুরি করে তার গুহায় রেখে আবার চলে এল গাঁয়ে। কখন যে সে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল কেউ দেখতেই পায়নি। সর্দারও গেল ঘাবড়ে। মা ঘুরে ঘুরে কাঁদে আর বলে—আমার —শিগগীর—আমার ছেলে এনে দাও।

বড় যাতুকর মাথা নেড়ে বলে—আবার গেল চুরি? হুঁ, বুঝেছি বড় শক্ত ঠাঁইয়ে পড়েছে তোমার ছেলে। দশটা ছাগল এনে দাও, আমি এনে দেব তোমার ছেলে।

রুখে উঠে মা বলল—তবে তুমিই নিয়েছ আমার ছেলেকে। শিগগীর ফিরিয়ে দাও তাকে।

এই যাতুকরের জন্য নিজের আধিপত্য যায় দেখে সর্দারও রুখে উঠল গাঁয়ের যাতুকরকে নিয়ে। লেগে গেল তুই যাতুকরে ঝগড়া।

টারজান কিন্তু ছেলেটিকে ভালবাসত। অনেকদিন তাকে দেখেনি বলে সে সেদিন গাঁয়ে এসে সব শুনে বুঝল এ বড় যাতুকরেরই কাজ। সে তক্ষুণি ছুটে বড় যাতুকরের গুহায় গিয়ে দেখে যাতুকরের তুই

পোষা হায়েনার মাঝে বসে কেঁদেই চলেছে ছেলেটি। রাগে ফেটে পড়ে টারজান তক্ষুণি ক্যাক্ ক্যাক্ করে হায়েনাগুলিকে ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে গাঁয়ে এসে তুলে দিল তার মায়ের হাতে। সবাই হতবাক। ছেলেটির মা তো টারজানের পায়ে পড়ে কেঁদে উঠল—প্রভু, তুমিই বাঁচিয়েছ আমার ছেলেকে। গাঁয়ের লোকেরাও টারজানের উদারতা দেখে খুব খুশি। শত্রুতার কথা আর মনে এল না তাদের।

এই ফাঁকে বড় যাদুকর কিন্তু পালিয়েছে। সে বুঝল টারজানই তার বড় শত্রু। একে শেষ না করতে পারলে তার মান-ইজ্জত সবই যাবে। তাই সে তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তক্কে তক্কে রইল।

তার ভাগ্য ভাল সে পেয়েও গেল এক সুযোগ।

টারজান তো চারিদিকেই ঘুরে শিকার করে। সেদিনও সে শিকারে বেরিয়ে বড় যাদুকরের গুহার কাছে এসে পড়েছিল। এমন সময় হঠাৎ আরম্ভ হল ঝড়। আর সে ঝড়ে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে তার উপর পড়তেই সে মাটিতে আছড়ে পড়ে হয়ে যায় অজ্ঞান।

ঝড় কমলে বড় যাদুকর গুহার বাইরে এসেই পেয়ে যায় টারজানকে। তখন তার উল্লাস দেখে কে? মনের আনন্দে সে তক্ষুণি গুহা থেকে দড়ি এনে টারজানকে বেঁধে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে এনে গুহার বাইরে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখল।

একটু পরে টারজানের জ্ঞান ফিরতেই বড় যাদুকরকে দেখে সে হতবাক। এই বুড়োটা বেঁধেছে আমাকে? রাগে চেঁচিয়ে উঠল সে। কিন্তু চেঁচালে কি হবে? হাত-পা-ই তো সে নাড়তে পারছে না।

তার অবস্থা দেখে বুড়ো মিটিমিটি হেসে বলে—কি কেমন বুঝছ?

কিন্তু টারজান তার কথা বুঝতে পারলে তো! রাগে চেঁচিয়ে

উঠল টারজান—তবে রে বুড়ো, দাঁড়া একটু বাঁধনটা যদি খুলতে পারি তবে দেখাব মজা। বলে সে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করতেই মড়মড় করে উঠল খুঁটিটা।

যাছকরও তার ভাষা বোঝে না। সে বলল—না এমনিতে হবে না তোমার। হায়েনা লেলিয়ে দিলেই বুঝবে মজা। বলে সে হায়েনা আনতে চলে গেল গুহায়।

টারজান এই ফাঁকে খুঁটিতে হাতছুটি ঘসে বাঁধন আলগা করে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো তার হায়েনা ছুটিকে এনে টারজানের উপরে ছেড়ে দিতেই টারজান এক চীৎকার করে পটাং করে ছিঁড়ে ফেলল হাতের বাঁধন। আর তার পরেই সে ক্যাক করে হায়েনা ছুটিতে ধরে ছুঁড়ে মারল বুড়োর উপরে। আর যাবি কোথায়? হায়েনা ছুটি তো পশু, পোষ মানাই হোক আর যাই হোক। তারা ঘাবড়ে গিয়ে খ্যাক করে বুড়োর মুখে এক কামড় দিয়ে দে দৌড় টারজানের ভয়ে।

পরিত্রাহী চীৎকার করে উঠল বুড়ো। কিন্তু তবুও কি তার তেজ কমে? যন্ত্রণায় কোঁকাতে কোঁকাতেও উঠে ছুটে গেল টারজানের দিকে লাঠি নিয়ে। কিন্তু টারজানের সঙ্গে সে পারবে কেন? টারজান তক্ষুণি তাকে ধরে সেই খুঁটিটাতেই বেঁধে চলে গেল নিজের আস্তানায়। পরে একদিন এসে দেখেছিল সে তার পোষা হায়েনাগুলিই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

টারজানের যন্ত্রণার কি আর শেষ আছে? আর একদিন সে তার বাবার ঘরে বসে বই পড়ছে, হঠাৎ গরিলাদের চিৎকার শুনে সেখানে গিয়ে দেখে তার বান্ধবীর ছেলে পড়ে আছে মাটিতে, আর বন্ধুটি তার বুকে কান দিয়ে কি যেন শুনছে। অন্য গরিলারা সব গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। বান্ধবী নেই।

টারজান আসতেই সব সরে দাঁড়াল। টারজান জিজ্ঞেস করল বন্ধুকে—কি হয়েছে?

বন্ধু বলল—কি জানি! আমি এসে দেখি ছেলে পড়ে রয়েছে মাটিতে। তোমার বান্ধবী নেই, ছেলেটি বেঁচে আছে এখনও।

নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল টারজানের। গন্ধ শুঁকে বুঝল, অন্য এক দলের গরিলা এসে নিয়ে গেছে তার বান্ধবীকে। বলল—চল আমার সঙ্গে। আর তোমরা—। বলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে সে আদেশ করল—ছেলেটিকে দেখ। আমি আসছি। বলেই সে বন্ধুকে নিয়ে চলল গাছে গাছে লাফিয়ে।

ঠিকই ধরেছিল সে। অন্য একটা গরিলা এসেই ছেলেকে অজ্ঞান করে তার বান্ধবীকে নিয়ে গেছে।

নিয়ে আর যাবে কোথায়? বন্ধুকে নিয়ে টারজান ছুটতে ছুটতে ঠিক ধরে ফেলল তাদের। টেনে, হিঁচড়ে গরিলাটা নিয়ে চলছে তার বান্ধবীকে। সঙ্গে আর কয়েকটা গরিলাও আছে।

এ দেখে কি আর টারজান ঠিক থাকতে পারে? সে তক্ষুণি তার বন্ধুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। লেগে গেল তুমুল লড়াই। তার বান্ধবী তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে।

একে তো সে টারজান, হাতে আছে ছুরি। সঙ্গের বন্ধুটি আরও ভয়াবহ। এমন বিরাট চেহারা সচরাচর দেখা যায় না। অন্য দলের গরিলা তাদের সঙ্গে পারলে তো? টারজানের ছুরির ঘায়ে একটা গরিলা তো কাৎ। আর একটাকে জাপটে ধরছে তার বন্ধু। আর যেটা টারজানের বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিল তাকে তো ততক্ষণে টারজান ঘাড় মুচড়ে চেপে ধরেছে মাটিতে। পরিত্রাহী চিৎকার করে করে উঠল গরিলাটা।

তার চিৎকার শুনে তাদের দলটাই ছুটে এসে ঘিরে ধরল টারজান ও তার বন্ধুকে। প্রমাদ গুনল টারজান। এমন সময় তার বান্ধবী টারজানের কোমর থেকে ছিটকে পড়া একটা থলেতে কয়টা পাথরের মত শক্ত কি পেয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল গরিলাগুলির দিকে। আর কি আশ্চর্য্য! একটা পাথর একটা গরিলার বুকে লেগেই 'হুম' করে

ফেটে গেল আচমকা। তারপর আর একটা, আর একটা গরিলার পিঠে। ঘাবড়ে গেল সবাই। তারপর তাদের শত্রু গরিলাগুলি কি আর থাকে? পড়িমড়ি করে চোঁ চাঁ দৌড়।

টারজান লাফিয়ে পড়ে তার বান্ধবীর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, এগুলি কি?

—কি জানি? বলে বান্ধবীও সরে বসল থলেটা থেকে। তোমার কোমড় থেকেই তো ছিটকে পড়েছিল থলেটা।

—আমার কোমড় থেকে? বলে ভয়ে ভয়ে টারজান থলেটা হাতে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, তাই তো। এটা তো আমি আমার বাবার ঘরে পেয়েছিলাম।

আওয়াজ শুনে বন্ধুটিরও এতক্ষণে গলা শুকিয়ে কাঠ। তাদের কথাবার্তায় একটু সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করল—তোমার বাবার ঘরে?

—হ্যাঁ, একটা কাঠের বাক্সে ছিল। আমি জানি না এগুলি কি? কিন্তু দেখে খুব ভাল লেগেছিল বলেই থলেটা কোমড়ে বেঁধেছিলাম। এমন সময়ই তো তোমাদের চিৎকার শুনে ছুটে গিয়েছিলাম। যাকগে ভালই হল। চল। বলে টারজান থলেটা আবার কোমড়ে বেঁধে চলল তাদের নিয়ে।

আসলে এগুলি ছিল এক ধরনের পটকা জাতীয় বাজী। বন্য জন্তুদের ভয় দেখাবার জন্যই হয়ত তার বাবা রেখেছিল ঘরে।

মাঝে মাঝে টারজান তার দলের গরিলাদের ভয় দেখিয়ে মজা করতেও ছাড়ত না। সে একবার আদিবাসীদের গা থেকে একটা সিংহের শুকনো চামড়া চুরি করে এনে সিংহ সেজে তাদের ভয় দেখিয়েছিল। তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একযোগে যখন আক্রমণ করেছিল তখন টারজানের প্রাণ যায় আর কি? অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে যাত্রা সে রক্ষা পায়।

এরই মধ্যে একদিন টারজান দেখে একদল আদিবাসী একটা সিংহের ফাঁদ একজায়গায় রেখে চলে গেল। কাঠের খাঁচাটার মধ্যে

একটা ছাগল পরিত্রাহী চীৎকার করছে। রাগ হয়ে গেল টারজানের। কাপুরুষ সব। সিংহ শিকার করবি তো সামানা-সামনি কর। তা না, ফাঁদ পেতে সিংহ শিকার! দাঁড়া। বলে টারজান ছুটল তাদের সন্ধানে। গিয়ে পেয়েও গেল সে। গাঁয়ে পৌঁছায়নি তারা তখনো। সবাই এগিয়ে গেছে। বুড়ো মানুষ ভণ্ড যাত্নকরটাও একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছে। যাত্নকরটাকে টারজান ঘৃণা করত। এই সুযোগ। টারজান ঝট করে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে যাত্নকরটার গলা টিপে ধরে এক হ্যাঁচকায় তাকে তুলে ছুটে গিয়ে ফাঁদটায় ঢুকিয়ে দিল তাকে। চীৎকার করে উঠল যাত্নকর। কিন্তু কে কার কথা শোনে? টারজান ছাগলের জায়গায় তাকে রেখে ছাগলটাকে নিয়ে চলে গেল খাবে বলে।

তার পরদিন গ্রামবাসীরা খাঁচাটা দেখে তো অবাক! সিংহ একটা পড়েছে সত্য, কিন্তু যাত্নকর কি করে ঢুকল খাঁচায়? কোথায় সিংহ ধরে আমোদ-আহ্লাদ করবে তারা, না, এসে দেখল যাত্নকরের ছিন্নভিন্ন দেহ। এখন বুঝতে পারল তারা, তাই যাত্নকরকে কাল পাওয়া যায়নি গাঁয়ে। যাহোক, কি আর করবে তারা, বিমর্ষ হয়েই তারা খাঁচাশুদ্ধ সিংহটাকে নিয়ে গেল গাঁয়ে।

সবই লক্ষ্য রেখেছিল টারজান আড়ালে থেকে। তারা চলে যেতেই সে বুঝল, আজ রাতেই উৎসবের শেষে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে তারা সিংহটাকে হত্যা করবে। টারজান ভাবল, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

সে তক্ষুণি তার সিংহের চামড়াটা নিয়ে গাঁয়ের পাশে এসে লুকিয়ে রইল সারাদিন। তারপর রাত হতেই তাদের উৎসবের মাঝে চামড়াটা গায়ে দিয়ে সিংহ সেজে গর্জন করে গিয়ে পড়ল খাঁচাটার সামনে। চোখের উপর একটা খোলা সিংহ দেখে কোথায় উৎসব, কোথায় কি? দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল সবাই ঘরে। তারা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখে সিংহটা হঠাৎ দুই পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে খাঁচাটা খুলে দিয়েই ছুটে চলে গেল।

খাঁচা খোলা সিংহটা তখন রাগে লম্ফ-ঝম্প করে হঠাৎ একটা কুঁড়েঘরের সামনে একটা যোদ্ধাকে পেয়ে তাকে মুখে করে হাওয়া।

হায়! হায়! করে উঠল সবাই। কিন্তু তখন আর করার কিছু নেই। তারা বুঝল, এ নিশ্চয়ই বনদেবতার কাজ। টারজানই যে বনদেবতা সে সম্বন্ধে তাদের আর কোন সন্দেহই রইল না। সে-ই সিংহের রূপ ধরে সিংহটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। টারজানকে তো তারা ভয় করতই, সেদিন থেকে টারজানের প্রতি ভয়ের সঙ্গে ভক্তিও এসে মিশল তাদের মনে।

আদিবাসীরা যেমন টারজানকে ভয় করত, শত্রু ভাবত, তার নিজের গরিলাদলের মাঝেও তার শত্রু কম ছিল না। তারা ভাবত, কবে তাকে হাতে পেয়ে খুন করব। সুযোগ একদিন তাদের এসেও গেল।

এক চাঁদনী রাতে গাছের ডালে শুয়ে শুয়ে টারজান তার বন্ধুকে চাঁদের কলঙ্ক দেখিয়ে বলেছিল—জানিস্ এটা কি? এটা হল সিংহ। চাঁদের পাশে আগুন জ্বলছে তো, আগুনটা নিভে গেলেই সিংহটা চাঁদকে খেয়ে ফেলবে।

এই কথাটা বন্ধু একদিন দলের সবচেয়ে বুড়ো ও বুড়ী গরিলার কাছে বলেছিল। তা শুনে তারা বলেছিল, না, টারজানই একদিন চাঁদকে খাবে। সে সিংহের মাংস আমাদের খাওয়াতে আসে। সে আমাদের থেকে শক্তিমান। সে সিংহকে চাঁদের কাছে এনে রেখে দিয়েছে। সেই সিংহই যদি চাঁদকে খেয়ে ফেলে তবে আমরা চাঁদনী রাতে কি করে উৎসব করব? তাই আমাদের উচিত তাকে খুন করা।

—না না। তোমরা অত্যন্ত অন্যায় করছ। বলে গর্জন করে উঠল বন্ধু। কত বিপদ-আপদ থেকে সে আমাদের রক্ষা করেছে, একথা ভুলে গেলে? আমি এর মধ্যে নেই বলে সে রাগ করে চলে গেল।

কিন্তু সে রাগ করলে দলের কি? তারা কিন্তু ষড়যন্ত্রে মেতেই রইল। টারজান এসবের কিছুই জানত না।

তারই মধ্যে একদিন টারজান হাতির পিঠে শুয়ে আছে হঠাৎ গরিলাদলের মধ্যে চেঁচামেচি শুনে হাজির হয়ে দেখে একটা আদিবাসী যোদ্ধাকে ঘিরে ধরেছে সবাই।

লোকটাকে দেখেই টারজান চিনে ফেলল। এই লোকটা অত্যন্ত সাহসী। কোথায় থাকে সে টারজান জানে না। তবে কাল রাত্তিরে তাদের দল যখন সিংহের মুখে পড়ে ছত্রাখান তখন এই লোকটাই একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে তাড়া করেছিল একটা সিংহকে। এখন সেই লোকটাকে গরিলার দলটা যদি খুন করে ফেলে তাই সে চিৎকার করে উঠল—খবরদার! তার গায় হাত দিয়েছ কি—।

কিন্তু কথাও শেষ হল না তার গরিলাগুলি একসাথে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের উপরে। রুখে দাঁড়াল তার বন্ধু ও লোকটা বর্শা নিয়ে।

লোকটা তাদের ভাষা বোঝেনি, কিন্তু টারজান যে তার বন্ধু একথা সে বুঝে ফেলল।

তারা তিনজন এতগুলি গরিলার সাথে কি করবে? তবুও তারা লড়াই করে যাচ্ছিল। কিন্তু আর বুঝি পারছে না। টারজান বেগতিক দেখে বিকট চিৎকার করে ডেকে উঠল তার হাতি বন্ধুকে।

আর যাবি কোথায়? বন-বাদার ভেঙ্গে ছুটে এল হাতি। হাতি দেখে আর কি গরিলার দল থাকে টারজানের সামনে। পড়িমরি করে কিচমিচ করতে করতে কে কোথায় পালাল তার ঠিক ঠিকানা নেই।

টারজান তখন হাতির পিঠে উঠে চিৎকার করে বলল—তোমরা সব শোন। আমি আজ থেকে তোমাদের দল ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত। আর আসব না। আমি আমার বাবার ঘরেই থাকব। আমার বন্ধু ও বান্ধবী ছাড়া কেউ আমার কাছে যাবে না।



গেলে আর ফিরে আসবে না। মনে থাকে যেন। বলে সে সেই আদিবাসী লোকটাকে নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পরে এক চাঁদনী রাতে হঠাৎ টারজানের বন্ধুর নজরে এল চাঁদটাকে একটা ছায়া যেন ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলেছে। আসলে সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। তা তো আর তারা জানে না। তার বন্ধু তো তখন ভীষন ভয় পেয়ে সবাইকে ডেকে বলল—ঐ দেখ, টারজান ঠিকই বলেছিল, সিংহ খেয়ে ফেলবে চাঁদকে। দেখ, দেখ, খেয়ে ফেলছে সিংহটা।

ঘাবড়ে গেল সবাই। বলল—তাহলে উপায়?

বুড়ো গরিলাটা বলল—উপায় জানে টারজান। সে-ই তো সিংহ মারতে পারে। ডেকে নিয়ে এস তাকে।

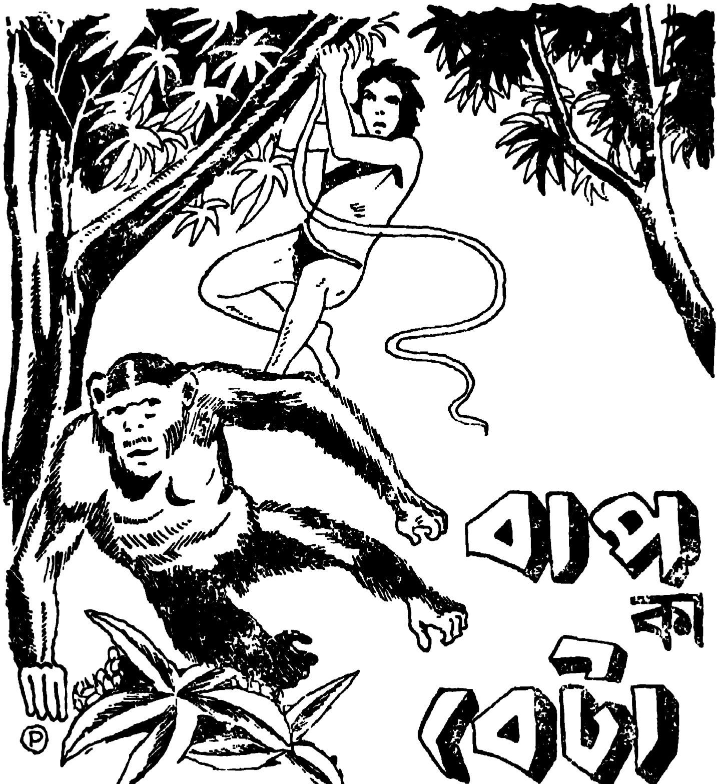
কিন্তু কে যাবে ডাকতে! অগত্যা ঠিক হল তার বন্ধুই যাবে। গেলও তাই।

টারজানও জানে না, এটা কি? তবুও সে তার বন্ধুর কথায় তীর ধনুক নিয়ে এল সিংহ মারতে। তখন তার কি খাতির।

কিন্তু টারজান কোনদিকে না তাকিয়ে একটা উঁচু গাছে উঠে পর পর তিনটা তীর ছুঁড়তেই একটা সিংহ গর্জন করে উঠল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।—ঐ, ঐ সিংহটা—ঘায়েল করেছে টারজান।

টারজানের ভাগ্য ভাল, তার একটু পরে গ্রহণ কেটে গিয়েছিল। পরিষ্কার চাঁদ আবার দেখা গেল আকাশে। জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল সবাই টারজানের নামে। কিন্তু টারজান বুঝল না কি করে হল এটা।



বন্য জীবনে মানুষ হলেও টারজান এখন সভ্য, লর্ড গ্রেস্টোক। কিন্তু তার ছেলে জ্যাকী লর্ড পরিবারে মানুষ হয়েও কেন যে তার জীবনে বন্য জীবনের প্রতিফলন দেখা যায় তা বাপ-মা দুজনেও বুঝে উঠতে পারে না। জেনী তো তার দুষ্টুমিতে মহা খাপ্পা।

এই তো সেদিনও কোথায় কে একজন একটা গরিলা এনে খেলা দেখাচ্ছে শুনে জ্যাকীর কি লাফালাফি। সে গরিলা দেখতে যাবে। কিন্তু তার বাপ-মা দুজনের কেউ রাজী নয়। অগত্যা সে যে কখন একটু রাত্রি হতেই তার গৃহশিক্ষককে ঘরে বন্দী করে রেখে গরিলা

দেখতে চলে গেছে তা টারজান ও জেনী কেউই জানে না। যখন জানল ততক্ষণে জ্যাকী গরিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে। অবশ্য এই বন্ধুত্ব পাতানোতে গরিলার কৃতিত্বই ছিল বেশী।

খেলা করতে করতে গরিলাটা হঠাৎ জ্যাকীকে দেখে ধীরে ধীরে তার কাছে এসে হাতে ধরে তাকে নিয়ে তুলে স্টেজে। জ্যাকী তো মহাখুশী। ভয়-ডর নেই তার। অন্য ছেলে হলে হয়তো কেঁদেই ফেলত এতবড় গরিলাটাকে দেখে। কিন্তু তার সাহস দুর্দান্ত। হোক না তার বয়স চৌদ্দ, দেখতে শক্তিশালী যুবকের মত, তবুও বালকই তো! একটুও ভয় পায়নি সে। দর্শকরাও হতভম্ব। গরিলাটার মালিকের তো কথাই নেই। গরিলাটা বারবারই জ্যাকীর মুখের দিকে চেয়ে যেন কি খোঁজে।

ঠিক এমন সময়েই হলে গিয়ে ঢুকল টারজান। গৃহশিক্ষককে বন্দী করে জ্যাকী পালিয়ে আসাতে খুব রেগে গিয়েছিল টারজান। গরিলা দেখবে বলে বায়না ধরেছিল জ্যাকী, তাই টারজান ছুটে এসেছিল এখানে। হলে ঢুকেই জ্যাকীকে স্টেজের উপরে দেখে 'জ্যা-অ্যা-কী' বলে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল টারজান স্টেজের উপরে। আর তক্ষুণি গরিলাটা জ্যাকীকে ছেড়ে লাফ দিয়ে টারজানের গলা জড়িয়ে ধরে কি আকুলি বিকুলি। প্রথমটায় থতমত খেলেও টারজান গরিলাটাকে দেখেই চিনতে পেরে 'আকা তুমি?' বলে চীৎকার করে উঠেছিল।

—হ্যাঁ টারজান, আমি। বলে গরিলাটা গরিলা ভাষায় টারজানকে বলতে লাগল—তোমাকে খুঁজতেই বেরিয়েছি। কত খুঁজেছি তোমাকে। এবার পেয়েছি। আর ছাড়ছি না।

গরিলাটা ছিল টারজানের সঙ্গী জঙ্গলে। গরিলাদের রাজা করে দিয়ে এসেছিল সে। সে যে কিভাবে এখানে এল, কিছুই বুঝতে পারল না টারজান। জিজ্ঞেস করল গরিলা ভাষায়—তুমি এখানে এলে কি করে?

—কেন ? বলে গরিলাটা মালিককে দেখিয়ে বলল—তার সঙ্গে চলে এসেছি। সেই তো নিয়ে এল আমায়।

ততক্ষণে সমস্ত হল ঘর ফেটে পড়েছে হাত তালিতে। দর্শকরা ভেবেছে এটাও বুঝি একটা নতুন খেলা। হতভম্ব জ্যাকীও তাকিয়ে রয়েছে তার বাবার দিকে।

এরপর সেদিন আর খেলা জমলই না। গরিলা টারজানকে ছেড়ে এক পা এগুলে তো! দর্শকরা উঠে চলে গেল। মালিক গেল চটে। কিন্তু টারজান ভ্রূক্ষেপও করল না। শুধু এক পা এগিয়ে এসে বলল—আমি টাকা দিয়ে গরিলাটা কিনে নেব। কত চাও ? যাকগে কাল বলো। বাড়ীর ঠিকানাটা দাও।

মালিকের তখন অর্থকষ্টে দিন কাটছিল। টাকার কথা শুনে সে একটু নরম হয়ে বলল—বেশ, কাল এসো। বলে সে তার ঠিকানা লেখা একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল টারজানের হাতে।

টারজান ঠিকানাটা নিয়ে গরিলাটাকে বলল—'আকা' তুমি আজ এই লোকটার সঙ্গেই বাড়ী যাও। আমি কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব। এসো জ্যাকী। বলে টারজান জ্যাকীকে নিয়ে চলে এল বাড়ী।

টারজান মালিককে চিনতে না পারলেও মালিক কিন্তু তাকে ঠিকই চিনতে পেরে গিয়েছিল। সেই তার গুরুকে চিতাবাঘ লেলিয়ে দিয়েছিল, তাকে জাহাজ ছাড়া করেছিল। রাগে জ্বলতে জ্বলতে সে ভাবছিল যেভাবেই হোক টারজানের উপর প্রতিশোধ নিতেই হবে তার।

জাহাজের সেই লোকটার সাগরেদ হিসেবে যে টারজান তাকে চিনতে পারেনি তাতে লোকটার মঙ্গলই হয়েছিল। না হলে যে-কি হত তা সে নিজেই জানে না। আর চিনবেই বা কি করে ? লোকটার কি আর দশ বছর আগেকার সেই চেহারা আছে ? রোগা, কঙ্কাল-সার চেহারা, চোখদুটি কোটরে ঢুকে গেছে। এই দশবছরে তো আর

টারজনের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। নিরুপদ্রবেই কেটেছে টারজানের।

নিরুপদ্রবে কাটবে না কেন? সে তো আর এখানে ছিল না। সে ছিল সেই আফ্রিকার জঙ্গলে। সেই যে টারজানের জাহাজে বিস্ফোরক পদার্থ রেখে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন থেকে সে তো ওখানেই। এই দশটি বছর। দশ বছর জঙ্গলে কাটিয়ে সে যে ফিরে এসেছে এই তো ঢের। সহায়হীন, সম্বলহীন, বন্যজন্তুর মাঝে, নরখাদকদের মাঝে, অসুখে-বিসুখে সে যে কিভাবে প্রাণে বেঁচেছে, সে-ই জানে। আর তখনই সে উদ্ধার পেয়েছিল একদল গবেষকের হাতে। তারা তখন একটা জাহাজ নিয়ে এসেছিল সেখানে। হঠাৎই সে তাদের নজরে পড়ে যায়। কঙ্কালসার রুগ্ন চেহারার এই লোকটাকে দেখে তাদের দয়া হয়েছিল। তারাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল জাহাজে। সে অবশ্য তাদের কাছে নাম ভাঁড়িয়েই বলেছিল।

তখনই সে একদিন সবার সঙ্গে শিকার করে ফিরে আসবার সময় একটা গাছের নীচে বসেছিল। হঠাৎ এই গরিলাটা কোত্থেকে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাই তো তা দেখে চোঁ চাঁ দৌড়। সেও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তবে গরিলার হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারেনি। কিন্তু গরিলাটা আর কিছু করছে না দেখে পরে তার একটু সাহসও হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, গরিলা-টাকে নিয়ে যদি শহরে চলে আসতে পারি, তবে অনেক টাকা রোজগার করতে পারব। তাই সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অনেক বলে কয়ে তাকে শহরে নিয়ে এসে পয়সা রোজগার করছিল। এমন সময়ই টারজানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ।

যাহোক টারজান তার পরদিন লোকটার সঙ্গে দেখা করে তাকে বহু টাকা দিয়ে গরিলাটা কিনে নিয়ে বলল—আজ গরিলাটা তোমার এখানেই থাকবে। আগামীকাল তাকে ডোভারে নিয়ে গিয়ে একটা আফ্রিকাগামী জাহাজে তুলে দিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে আসবার ব্যবস্থা

করবে। তারজন্য তোমাকে না হয় আরও কিছু টাকা দেওয়া যাবে।

লোকটা রাজী হয়ে গেল। আর টারজানও কষ্ট হবে বলে আকার সঙ্গে দেখা না করেই চলে এল বাড়ীতে। বাড়ীতে এসে জেনীর কাছে বললও সেকথা। আর তখনই আড়াল থেকে জ্যাকী সব শুনে মনে মনে ক্ষেপে গেল, কি? বাবা কিনে নিয়ে আফ্রিকা পাঠিয়ে দেবে গরিলাটাকে?

তারপরেই সে মনে মনে সব ঠিক করে বহুকষ্টে লোকটার ঠিকানা জোগাড় করে লোকটার সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকা দিয়ে বলল—আমি টারজানের ছেলে জ্যাকী। তোমাকে কষ্ট করে আর ডোভারে যেতে হবে না। আমিই গরিলাটাকে নিয়ে ডোভারে যাব। নাও এ টাকাটা রাখ। বলে জ্যাকী তার হাতে অনেক টাকাগুঁজে দিল।

লোকটা তো আনন্দে আত্মহারা। বলল—বেশ, বলছ যখন।

—হ্যাঁ। জ্যাকী বলল—আজই আমার স্কুল হস্টেলে যাওয়ার কথা। সন্ধ্যের পরই আমি আসব। তৈরী থেক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তৈরী থাকব। বলে লোকটা জ্যাকীকে বিদায় জানিয়ে বলল—তুমি এস। আর তখনি তার মাথায় জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার পরিকল্পনা। টারজানের ছেলেকে দিয়েই টারজানের উপর প্রতিশোধ নেব।

সেদিন রাত্রিতে জ্যাকী লোকটার বাড়ী এসে গরিলাটাকে বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করল—একি! একে এভাবে বেঁধে রেখেছ কেন?

লোকটা একগাল হেসে বলল—আর বল কেন, সে কি আর যেতে চায়? তাই বাঁধতে হয়েছে। তোমাকে তো নিয়ে যেতে হবে। যদি গণ্ডগোল করে—। বলে হঠাৎ লোকটা জ্যাকীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ফাঁসে তাকে বেঁধে চিৎ করে ফেলে দিল মাটিতে। তারপরেই সে গলা টিপে ধরল জ্যাকীর।

অপ্রস্তুত জ্যাকী বাধা দেবারও সুযোগ পেল না। তবুও যথাসাধ্য ঠেকিয়ে রাখতে চাইল তাকে।

গরিলাটা বাঁধা থাকলেও, সে তো গরিলা। প্রচণ্ড শক্তি তার। জ্যাকীর অবস্থা দেখে সে আপ্রাণ চেষ্টায় হাতের বাঁধন কোনমতে খুলে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। আর তারপরেই শেষ।

তারপর বহুকষ্টে জ্যাকীর হাতের বাঁধন খুলে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

জ্যাকী বুঝল যেভাবেই হোক এক্ষুনি তাকে পালাতে হবে গরিলাটাকে নিয়ে। না হলে লোকজন যদি এসে পড়ে—। ভাগ্যিস দরজা বন্ধ। কেউ দেখেনি।

মুহূর্তে সে মনে মনে সব ঠিক করে গরিলাটাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল ডোভারের দিকে। আর তারপরে সব ব্যবস্থা করে গরিলাকে বুড়ী ঠাকুমা সাজিয়ে জাহাজে।

এত সব কিছুর বিন্দুবিসর্গও কিন্তু জানে না টারজান। যখন জানল তখন জ্যাকী জঙ্গল উপকূলবর্তী এক শহরের ছোট্ট সরাইখানায়।

সেখানেও টাকার লোভে জ্যাকীর পিছনে লেগেছিল এক গুণ্ডা। কিন্তু গুণ্ডাটা রাত্রির অন্ধকারে জ্যাকীর উপর হামলা করাতে সেও শেষ হয়ে যায় গরিলার হাতে। জ্যাকী পড়ল আরেক বিপদে। তখন উপায়ান্তর না দেখে সে গরিলাটাকে নিয়ে সরাইখানার দোতলা থেকে গাছ বেয়ে নেমে জঙ্গলে দে দৌড়।

এদিকে টারজান কিন্তু খুঁজে চলেছে তার ছেলেকে গোপনে গোপনে। সেই লোকটার হত্যাকাণ্ডের পর যখন সে বুঝল যে তার ছেলে সেদিন ঐ লোকটার বাড়িতে গিয়েছিল তখন সে পুলিশের সাহায্য না নিয়ে নিজেই খুঁজে চলেছে তাকে।

জ্যাকী তখন আকাকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে দিনে দিনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে এই জীবনে। তার বাবার মত না হলেও মোটামুটি সেও হয়ে উঠেছে দুরন্ত। এখন সে তরতর করে গাছে উঠতে পারে, ঝাঁপিয়ে একগাছ থেকে আরেক গাছে চলে যেতে পারে গরিলার মত।

ভাষাও শিখেছে তাদের। এক দলের গরিলা রাজাকে হত্যা করে সে নিজেকে শক্তিশালী বলে প্রমাণও করেছে। আকা তার সঙ্গী।

শত হলেও জ্যাকী তো সভ্য জগতেই মানুষ হয়েছে। তাই মানুষের সঙ্গের প্রতি লোভ থাকা তার স্বাভাবিক।

দিনের পর দিন কেটে যায়। একদিন আকার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সে একটা আদিবাসী গাঁয়ের কাছে এসে পড়ে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের দেখে তার খুব ভাল লাগে। তাই সে সেদিন গাছ থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই কোত্থেকে একদল আদিবাসী যোদ্ধা এসে তাকে তাড়া করে। সে আকার সঙ্গে পালিয়ে যায় বটে, তবে একটি আদিবাসী যোদ্ধাকে হত্যা করে তার ছুরি ও বর্শাটা নিয়ে আসে। কিন্তু মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে।

অস্ত্র হাতে পেয়ে সে হয়ে উঠে আরও শক্তিশালী। কাউকে সে পরোয়াই করে না এখন। এমন সময় সে একদিন দেখে দুইজন ইংরেজ কতগুলি নিগ্রোর কাঁধে হাতির দাঁতের বোঝা চাপিয়ে চলেছে, বনের পথ দিয়ে। তাদের দেখে স্বজাতি হিসেবে তার খুবই ভাল লাগল। সে তখন তাদের দিকে বর্শা হাতে বন্ধুভাবে এগিয়ে যেতেই তারা ভয়ে চীৎকার করে তার দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। বনের আড়ালে গুলি অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, জ্যাকীও পালিয়ে যায়। তবে সেদিন সে মানুষের উপর বিশ্বাসই যেন হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু সে তো আর জানে না যে এই লোকগুলি ছিল আসলে স্বভাব দুর্বৃত্ত। তাই তাদের ব্যবহারে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

এই লোকদুটো এসেছিল ফরাসী সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের মেয়ের খোঁজে। তিনি তার মেয়ের উদ্ধারের জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

বহুদিন আগে কিছু আরবের খুন-খারাবি ও অত্যাচারের খবর পেয়ে ফরাসী সরকার তাদের দমন করতে সেনাবাহিনীর একজন

ক্যাপ্টেনকে এখানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এসে কয়েকজনকে ধরেছিলেন। বিচারে তাদের প্রাণদণ্ড হয়। তাই এক আরব শেখ তার মেয়েকে চুরি করে প্রতিশোধ নিয়েছিল। মেয়ের উদ্ধারের জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। টাকার লোভে অনেকেই এসেছিল, খোঁজ পায়নি কেউ, ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এই লোকগুলি যায়নি। তারা হাতির দাঁতের চোরা কারবার করতে লাগল। তারা ব্যবসা করতে লাগল বটে, কিন্তু তারা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। সে খবরও ফরাসী সরকার পেয়ে তাদের ধরবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কি আর এত সহজে ধরা পড়ে?

এদিকে আরব শেখ কিন্তু ক্যাপ্টেনের মেয়েকে এনে নিজের শিবিরেই রেখে দিয়েছিল। আর দিনরাত তার উপর অত্যাচার করত। কোন কাজে একটু গাফিলতি হলেই কিল, চড়, লাথি ঘুসি মারত। সে মেয়েটি কাঁদত। কিন্তু বুঝতে পারত না তার কি দোষ। এভাবেই সে দিনে দিনে বড় হয়ে উঠেছে।

সেদিন আরব শেখ শিবিরে ছিল না। মেয়েটি বিষন্ন মনে গেটের কাছে বসেছিল। এমন সময় জ্যাকী গাছে গাছে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে তাকে দেখে ভাবল, বাঃ বেশ মেয়েটি! কিন্তু এত বিষন্ন কেন? শিবিরে কেউ নেই বলে? আমি যাব? খানিকক্ষণ গল্প করলে হয়তো সে খুশি হবে। নাঃ, যদি ভয় পায়? কিছুই ঠিক করতে পারছিল না জ্যাকী। এমন সময় সে হঠাৎ গাছের উপর থেকে দেখে দুজন লোক নিয়ে শেখ আসছে। সে ভাবল, এবার হয়তো খুশি হবে মেয়েটি, বাবা যখন আসছে তার। কিন্তু না। শেখ এসেই চিৎকার করে উঠল তাকে দেখে—হতভাগী তুই এখানে বসে আছিস? তোকে না বলেছি বেরুবি না ঘর থেকে। বলেই এক লাথিতে মাটিতে ফেলে দিল মেয়েটিকে। কেঁদে উঠল মেয়েটি। রাগে আগুন হয়ে গেল জ্যাকী। তবে কি সে তার বাবা নয়? বলেই এক লাফে সে শেখের সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—তুমি তাকে মারলে কেন?

থতমত খেয়ে গেলেও ধৈর্য্য হারায়নি শেখ। সেও চিৎকার করে উঠল—মেরেছি, বেশ করেছি তুই কে?

—আমি? বলেই ঝট করে জ্যাকী এক ঘুসি মেরে বসল তার মুখে। ছিটকে পড়ে গেল শেখ। ততক্ষণে সঙ্গের লোকদুটিকেও সে ধরাশায়ী করে ফেলেছিল।

তারপর সে কি আর মেয়েটিকে ওখানে রাখে? সে তক্ষুনি তাকে কাঁধে তুলে গাছে গাছে লাফিয়ে চলে এল নিজের আস্তানায়। মেয়েটিও যেন আশ্রয় পেয়ে বেঁচে যায়। অনেকদিন মানুষের মুখ দেখেনি জ্যাকী। সেও যেন কথা বলতে পেয়ে বেঁচে যায়। দুজনে খুব ভাব। প্রথম প্রথম ভয় করলেও আমার সঙ্গেও মেয়েটির ভাব জমে যায়।

বনের রাজত্ব। কত বিপদ-আপদই লুকিয়ে থাকে বনে। দিন যায়। একদিন জ্যাকী ও আকা শিকার থেকে ফিরে এসে দেখে আস্তানা খালি। মেয়েটি নেই। গাছের ডালে ডালে কয়েকটা বাঁদর কিচমিচ করছে। জ্যাকী বুঝে উঠতে পারল না, কি করবে সে। কিন্তু আকা গরিলা। সে বাঁদরের ভাষা ভালই বুঝে। সে বাঁদরদের কথাবার্তায় বুঝল আরেকটা গরিলা এসে নিয়ে গেছে মেয়েটিকে। সে সেকথা জ্যাকীকে বলতেই লাফিয়ে উঠল জ্যাকী—কই, কোথায়?

—এস। বলে আকা জ্যাকীকে নিয়ে চলল বাঁদরদের দেখান পথে।

সত্যি, কিছুদূর গিয়েই তারা পেয়ে গেল গরিলাটাকে। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা গরিলা।

মেয়েটি জ্যাকীকে দেখেই চিৎকার করে উঠল—জ্যাকী, জ্যাকী, আমায় বাঁচাও।

জ্যাকী কি আর দেরী করে? হাতে ছুরি নিয়ে সে তক্ষুণি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গরিলার উপর।

গরিলাটাও মেয়েটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আক্রমণ করল তাকে। লেগে গেল যুদ্ধ। অন্য গরিলারা তাকিয়ে আছে। আকা তাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে।

জ্যাকী তো টারজানেরই ছেলে। একটু পরেই সে জ্যাকীর ছুরির ঘায়ে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

জ্যাকী তখন বিজয়োল্লাসে চিৎকার করে গরিলাদের বলল—আমি তোমাদের সবার থেকে শক্তিশালী। আমি এখন তোমাদের রাজা হতে পারি। কিন্তু আমি চাই আকা তোমাদের রাজা হবে। তোমরা তার কথা মেনে চলবে। বলে সে আকার দিকে ফিরে বলল—আকা তুমি তাদের নিয়ে যাও।

—তুমি যাবে না জ্যাকী, বিষণ্ণ মনে আকা বলল।

—না। আমি এখানেই থাকব মেয়েটিকে নিয়ে। তোমরা যাও। দরকার পড়লে এস।

মেয়েটি তো হতভম্ব। কিচির মিচির করে জ্যাকী কি বলল গরিলাদের এক বিন্দুও সে বুঝল না। বলল—জ্যাকী, তারা চলে গেল ?

—হ্যাঁ। জ্যাকী হেসে মেয়েটির হাত ধরে বলল—ভয় কি ?

সে বলল বটে, কিন্তু ভয় যে তার ঘনিয়ে এসেছে সে তো আর জানে না।

গরিলারা চলে যাওয়ার একটু পরেই কোত্থেকে কতগুলি আদিবাসী যোদ্ধা এসে তাকে মেরে ধরে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল। আহত হয়ে পড়ে রইল জ্যাকী।

জ্যাকীকে ছেড়ে আকা চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মনটা তার খুব খারাপ হয়েই ছিল। সবাইকে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ জ্যাকীর চিৎকার শুনে আকা ছুটে এসে চিৎকার করে উঠেছিল—জ্যাকী, জ্যাকী কে করেছে বল। মেয়েটি কোথায় ?

কিন্তু জ্যাকী তো তখন আর কথা বলতে পারে না। কি আর

করবে আকা। সে সযত্নে জ্যাকীকে তুলে নিয়ে আস্তানায় চলে গেল।

আদিবাসী যোদ্ধাদের দলপতি মেয়েটিকে দেখেই চিনেছিল এই মেয়েটিকেই সে শেখের বাড়ীতে দেখেছে। শেখকে মেয়েটির খবর দিলে শেখ তাকে বকশিস দেবে এই ভেবেই সে মেয়েটিকে নিয়ে এসে বন্দী করে একটা লোক পাঠিয়ে দিয়েছিল শেখের কাছে। কিন্তু তারই দুর্ভাগ্য। বখশিস আর পাওয়া হল না তার। তার পাঠান লোকটি ধরা পড়ে যায় সেই দুইজন দুর্বৃত্তের হাতে। দুর্বৃত্তরা লোকটির কাছে মেয়েটির কথা শুনে বুঝতে পারে এই মেয়েটির খোঁজেই তারা এসেছিল। তবে তাদের আনা ফটোর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতবড় সুযোগ কি আর তারা ছাড়তে পারে? তারা তক্ষুনি যাত্রা করল গাঁয়ের দিকে। তাদের রাইফেল আছে বটে, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে যে তারা জ্যান্ত ফিরে আসবে না তাও তারা জানে। তাই তারা ঠিক করল কৌশলে আদিবাসীদের ঠকিয়েই আনতে হবে মেয়েটিকে।

তারা করলও তাই। গাঁয়ে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একদিন বলল—না, এখানে তো আর থাকতে পারি না আমরা। কাজ কারবার আছে। এদিকে শেখও মারা গেছে।

কথাও শেষ করতে পারেনি তারা, দলপতি চিৎকার করে উঠল —কি, কি বললে? শেখ নেই?

—না, নেই। তারা যেন বিস্মিত! বলল—কেন?

—শেখের জন্য একটি মেয়ে রেখেছিলাম। দলপতি যেন ভেঙ্গে পড়ল—এখন কি হবে? তোমরা নেবে মেয়েটিকে? আমি বেচে দেব।

—না, না, মেয়ে নিয়ে আমরা কি করব, পথের বোঝা। তাছাড়া ও তো বুড়ী।

—কে বলল? দলপতি বলল—না, সে বুড়ী নয়। —তোমরা নিজের চোখেই দেখ। বলে সে ঘরের ভিতর থেকে এনে দেখাল মেয়েটিকে।

হ্যাঁ সেই মেয়েই বটে। দুর্বৃত্ত দুজন নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে—যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেই কিনে নিল তাকে।

মেয়েটি কিন্তু তাদের দেখেই চিনে ফেলেছিল। লোকগুলি ভাল না। শেখের বাড়িতে একবার গিয়েছিল তারা। শেখ তাড়িয়ে দিয়েছিল ওদের। কিন্তু মেয়েটি কি আর করবে। যেতেই হল তাদের সঙ্গে তাদের শিবিরে।

আর তারপরেই লাগল দুর্বৃত্ত দুইজনের তুমুল ঝগড়া তাকে নিয়ে। দুজনেই তাকে অধিকার করতে চায়। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপরে হাতা-হাতি। পরে রিভলভার নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজন দুজনের উপরে। একজন তো তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাল। ঠিক এমন সময়েই এলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক তার নিগ্রো ভৃত্য নিয়ে। গুলির আওয়াজ পেয়েই ছুটে এসেছিলেন তিনি। এসেই তিনি ধরে ফেললেন লোকটিকে। চিনেও ফেললেন। বললেন—ও তুমি?

—না স্যার বিশ্বাস করুন—। বেকায়দায় পড়ে লোকটি বলতে লাগল—আমি স্যার কিছু জানি না—ঐ লোকটা—।

বলেও শেষ করতে পারেনি সে, চিৎকার করে উঠল মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে—না জানে না। এই লোক দুইজনই আমাকে নিয়ে এসেছে। তারপর—।

—বুঝেছি, বুঝেছি—। বলে ইংরেজ ভদ্রলোক লোকটিকে বললেন—তোমাকে আমি চিনি। অনেক কুকীর্তিই তোমরা করেছ। একটা গেছে। তোমার শাস্তি কি তা তুমি ভালই জান। যাহোক এবারের মত তোমাকে ছেড়ে দিলাম এক শর্তে। তুমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাবে। আর কোনদিন যেন এখানে তোমার মুখ না দেখতে পাই, বুঝেছ? না হলে, আমি কে বুঝবে। যাও, উঠ। এক্ষুণি। বলে তিনি তাকে তার শিবির তুলিয়ে রওনা করিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে চলে এলেন নিজের বাড়িতে। তার স্ত্রী অত্যন্ত আদরেই আশ্রয় দিলেন তাকে।

এদিকে জ্যাকী একটু সুস্থ হয়ে তার গরিলা দলবল নিয়ে গিয়ে হানা দেয় সেই আদিবাসীদের গাঁয়ে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও পায় না মেয়েটিকে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে আদরে যত্নেই দিন কাটে মেয়েটির। কিন্তু কাটলে কি হবে, দুর্ভাগ্য তখনও তাকে তাড়া করে চলেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার কয়েকদিন পরেই কয়েকজন ভদ্রলোক এসে অতিথি হন সেখানে। তাদের মধ্যে একজন অবিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েটির ভাব জমে যায়। এটাই হল তার কাল। মেয়েটির তখন আনন্দেই দিন কাটে। তাদের সঙ্গে কখনও সে বেড়াতে যায়, কখনও যায় শিকারে।

একদিন শিকারে গিয়ে সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় সে একজন সিংহ শিকারীকে দেখে আঁৎকে উঠে। কোথায় যেন সে তাকে দেখেছে! কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না।শিকারীও তাকে লক্ষ্য করেছিল।

যাহোক, দলের সঙ্গে সে পরে বাড়িতে চলে এসেছিল। ভুলেও গিয়েছিল সে সেই শিকারীর কথা। কিন্তু শিকারী ভুলেনি। ঠিক সে লক্ষ্য রেখেছিল তার উপর। দুদিন পরেই সে ভোল পাল্টে গিয়ে উঠেছিল সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়ি শিকারের অনুমতি চাইতে। তার অনুমতি ছাড়া এখানে শিকার করা যায় না একথা সবাই জানে। দুদিন পরেই সে চলে যাবে।

এরই মধ্যে সেই লোকটি পরিকল্পনামাফিক কাজে লেগে গেল। যেমন রোজ যায়, মেয়েটি অবিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পড়ল সিংহের মুখে। ভদ্রলোক তো নিজের প্রাণ বাঁচাতে তক্ষুণি ছুটে পালালেন ঘোড়া নিয়ে। মেয়েটি কোনমতে গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাল। এই সময়ই নতুন শিকারী তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপরেই বাড়ীর কর্তার কানে ঢালল বিষ সেই অবিবাহিত ভদ্রলোক সম্বন্ধে। কর্তা রেগে গেলেন খুব। কিন্তু অতিথি মানুষ সেই ভদ্রলোক,

গালাগালি তো করতে পারেন না। তার পরদিন তিনি মিষ্টি কথায়ই বিদায় করলেন ভদ্রলোককে।

ভদ্রলোকের তো আর করার কিছু নেই। মনমরা হয়েই বিদায় নিলেন তিনি। মনটা খারাপ হয়েই রইল মেয়েটির জন্য।

এটুকুই কাজে লাগাল সেই শিকারী। সে সেই ভদ্রলোকের শিবিরে গিয়ে বলল—আপনি মন খারাপ করছেন কেন মেয়েটির জন্য? একজনকে দিয়ে তাকে একটা চিঠি লিখে দিন না বরং।

—তাতে আর কি হবে? হতাশ হয়ে ভদ্রলোক বললেন—সে কি আর আসবে?

—আসবে, আসবে। আপনি ভাবছেন কেন? শিকারী বলল—লিখে দিন যেখান থেকে আপনি সেদিন চলে এসেছিলেন সেখানেই সে যেন সন্ধ্যেবেলায় এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে। আর সেখানেও আপনার যাওয়ার দরকার নেই। আপনার একজন ভৃত্য নিয়ে আমিই না হয় তার সঙ্গে দেখা করব। তারপর তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আপনারভৃত্যের সঙ্গে তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

—যা ভাল হয় করুন। আমি আর ভাবতে পারছি না কিছু। বলে ভদ্রলোক এলিয়ে পড়লেন বিছানায়। তারপর একটা চিঠি লিখে একটা ভৃত্যকে পাঠিয়েও দিলেন তিনি মেয়েটির কাছে।

ঠিক এল মেয়েটি চিঠি পেয়ে। ততক্ষণে শিকারী কিন্তু অপেক্ষা করে আছে তার জন্য ঘোড়া নিয়ে। সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের একজন নিগ্রো চাকরকেও অবশ্য এনেছিল লোক দেখানো। তবে তাকে অনেক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে এসেছিল সে।

মেয়েটি এসে তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি?

লোকটি হেসে বলল—হ্যাঁ, আমি। ভদ্রলোক আপনাকে না দেখতে পেয়ে খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন। তাই নিজে আসতে পারলেন না, আমাকে পাঠিয়েছেন। আসুন।

মেয়েটি আর সন্দেহ না করে চলল তার সঙ্গে। কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না। সারারাত চলে ভোরবেলায় সে একসময় লোকটিকে জিজ্ঞেস করল—আর কতদূর ?

—এই তো, এসে গেছি। লোকটি হেসে বলল—বনের পথ তো, দেরী হয়ই। ঐ তো দেখা যাচ্ছে শিবির, নদীর ওপারে।

সামনে নদী দেখে মেয়েটি বলল—নদীর ওপারে ? ঐ শিবির ?

—হ্যাঁ, আসুন। ডিঙি বাঁধা আছে। বলে লোকটি ঘোড়া বেঁধে তাকে নিয়ে গিয়ে উঠল শিবিরে।

কিন্তু শিবিরে গিয়েই সন্দেহ হল মেয়েটির। কেউ কোথাও নেই। শিবির ফাঁকা। মেয়েটি বলল—কই, কোথায় ভদ্রলোক ?

হা হা করে হেসে লোটি বলল—কেন ? আমি তো আছি। দেখুন তো চিনতে পারেন কি না ? বলেই সে একটু এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি পায় পায় পিছিয়ে যেতে যেতেই বুঝে ফেলল সব। চিৎকার করে উঠল—ও তুমি ? শয়তান। বলেই সে দরজার দিকে একটা লাফ দিতেই ঝট করে ধরে ফেলল লোকটি।

তারপরই ধ্বস্তাধস্তি। কিন্তু মেয়েটি কি তার সঙ্গে পারে ? তবুও একসময় লোকটার রিভলবারটা তার হাতে ঠেকে যেতে তড়াক করে এটা টেনে নিয়েই ঘোড়া টিপে দেয় সে। কিন্তু রিভলবারে গুলি ছিল না। খট করে আওয়াজ হল শুধু।

লোকটি হেসে বলল—আরে কি কর ? ওতে কি গুলি আছে ! গুলি তো ঐ বাক্সে। বলে সে তাঁবুর কোনে একটা বাক্স দেখিয়ে দিল মেয়েটিকে।

হতাশ হয়ে রিভলবারটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটি পাশে দাঁড় করানো রাইফেলটার দিকে তাকাতেই লোকটি বলল —না, ওতেও কোন গুলি নেই। তার চেয়ে তুমি পরিশ্রান্ত, এই

বিছানাটায় বসে একটু জিরিয়ে নাও। বলেই সে মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে দিল বিছানায়।

মেয়েটি বিছানায় গড়িয়ে পড়ল বটে, কিন্তু বুদ্ধি সে হারায়নি। ছোটবেলা থেকেই সে দুঃখ কষ্টে মানুষ। সেও কম দুর্দান্ত নয়। বিছানায় গড়িয়ে পড়েই আচমকা সে এক লাফে উঠে রাইফেলটা হাত বাড়িয়ে তুলেই তার বাঁটটা বসিয়ে দিল লোকটার মাথায়। লোকটা কল্পনাই করতে পারেনি।

—ও ববাপ। বলে লুটিয়ে পড়ল লোকটি মাটিতে। পড়েই অজ্ঞান। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাথা দিয়ে।

আর কি মেয়েটি সেখানে দাঁড়ায়? সে এক লাফে বিছানা থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়েই দে ছুট। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘরে ঢুকে গুলির বাক্সটা খুলে কয়টা গুলি নিতে গিয়ে দেখে এক কোনে একটা ফটো, ছোট্ট মেয়ের। পাশে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরো। থতমত খেয়ে যায় সে। ফটোটা কার! আমার! এখানে কেন? যাহোক ঝট করে সে কয়টা গুলি রিভলবারে পুরে ফটো আর কাগজগুলি নিয়ে ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে এসে একটা ডিঙি পেয়ে একলাফে ডিঙিতে উঠে ভাসিয়ে দেয় ওপারের দিকে। উত্তেজনা তখনো কমেনি তার। বার বার পিছন ফিরে তাকায় আর দাঁড় বায়।

প্রায় পাড়ের কাছ এসে বুঝি আর পারল না সে। দেখে, সেই লোকটা রক্তমাখা মুখে আর একটা ডিঙি বেয়ে আসছে তার দিকে। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল লোকটির। তারপরই সে ছুটে চলে আসে নদীর পাড়ে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকটি—হেই থাম। নইলে গুলি করব। বলেই সে গুলি করে বসল মেয়েটিকে। স্রোতের টান, টলছিল ডিঙি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলিটা।

ততক্ষণে মেয়েটি পাড়ে উঠে পড়েছে। আর ঠিক এই সময়েই

সেই ভদ্রলোক কোত্থেকে এসে থতমত খেয়ে বলেন—আরে তুমি ?

হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়েটি বলে—হ্যাঁ আমি। বলেই সে নদীর দিকে দেখিয়ে বলে—ঐ দেখুন, কে আসছে আমাকে ধরতে।

—অ্যাঁ ! কে ? বলে ভদ্রলোক নদীর দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠেন—জোচ্চোর ! জোচ্চোরটা—। বলেই তিনি ছুটে নদীর পাড়ে নেমে ঝট করে একটা গুলি ছুঁড়ে মারলেন লোকটার দিকে।

ঠিক লাগল গুলিটা লোকটার হাতে। কিন্তু তবুও কি তার তেজ যায় ! টাল খেয়ে নৌকোর উপর পড়তে পড়তে সেও ছুঁড়ল এক ঝাঁক গুলি ভদ্রলোকের দিকে।

পায়ে গুলি লেগে ভদ্রলোকও ছিটকে পড়লেন একটা ঝোপের আড়ালে। গুলি করার আর সাধ্য নেই তার।

লোকটাও বিপদ বুঝে কোনমতে ডিঙি বেয়ে পালাল শিবিরে।

এই ফাঁকে মেয়েটি যে কোথায় পালিয়েছে দেখেননি ভদ্রলোক।

ঠিক এই সময়েই তিনি ধরা পড়েন জ্যাকীর হাতে। জ্যাকীও তো হন্যে হয়ে খুঁজছিল মেয়েটিকে এ কয়দিন ধরে। সেদিন গুলির আওয়াজেই সে তার হাতির পিঠে চড়ে ছুটে এসেছিল এখানে।

বনের মধ্যেই সে এই হাতিটিকে পেয়েছিল। ভাব হয়ে গিয়েছিল তার হাতিটির সঙ্গে। তারপর থেকে সে যেখানেই যায় হাতির পিঠে চড়েই যায়। গরিলার দল থাকে পেছনে।

ভদ্রলোকই জ্যাকীকে বলল সব কথা। মেয়েটিকে নদীর ওপারেরা লোকটি নিয়ে গিয়েছিল। তিনিই এসেছিলেন তাকে উদ্ধার করতে কিন্তু লোকটা তাকে—।

অত শোনার কি আর জ্যাকীর ধৈর্য্য আছে। সে তক্ষুণি হাতির পিঠে চড়ে নদী পার হয়ে লোকটিকে গিয়ে ধরল তার শিবিরে। পালাতে পারল না লোকটি। সামনে হাতি। হাতি দেখে তার ভৃত্যরাও ততক্ষণে ছুটে পালিয়ে গেছে দূরে। তার কাছেই মেয়েটির সব পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারল না জ্যাকী কি করবে। ঠিক এমন

সময় হঠাৎ হাতিটা এক বিকট চিৎকার করে ছুটে গিয়ে লোকটাকে দলে পিষে মাংসপিণ্ড বানিয়ে দিল। কিছুতেই থামাতে পারল না জ্যাকী। তারপরেই হঠাৎ তাকে পিঠে তুলে সাঁতরে নদী পার হয়ে ভদ্রলোক যেখানে পড়েছিলেন সেই ঝোপটার পাশে এসে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই বুঝতে পারল না জ্যাকী হাতিটা এমন করল কেন? আর তক্ষুণি তার মনে পড়ল ভদ্রলোকের কথা। আরে! ভদ্রলোক কোথায়? তাকিয়ে দেখে চারিদিকে অনেক পায়ের ছাপ। ঝোপঝাড় লণ্ডভণ্ড। তবে কি তিনি বিপদে পড়েছেন? হতভম্ব হয়ে একমুহূর্ত পরেই জ্যাকী ছুটল আবার হাতি নিয়ে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে। তাকে যে তার চাই। তিনিই জানেন মেয়েটির কথা।

এদিকে মেয়েটি কিন্তু পালাতে গিয়ে আবার পড়েছে শেখের খপ্পরে। ভদ্রলোকও তাই।

চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল শেখ। সেদিনও সে নিজের কাজেই যাচ্ছিল দলবল নিয়ে। হঠাৎই সে পেয়ে যায় মেয়েটিকে। তারপর তাকে নিয়ে আসতে আসতে ভদ্রলোককে দেখে যখন মেয়েটি চিৎকার করে উঠে, তখনই শেখ বুঝেছিল তার সঙ্গে পরিচয় আছে মেয়েটির। তখন সে কি আর ছাড়ে ভদ্রলোককে? তাকেও বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল শিবিরে।

হাতি নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে জ্যাকী পেয়েও গেল শেখের শিবির। এক জায়গায় অনেকগুলি তাঁবু। কিন্তু কোনটাতে যে ভদ্রলোক আছে ঠিক বুঝতে না পেরে জ্যাকী হাতিটাকে বনের আড়ালে রেখে একটা গাছে উঠে লক্ষ্য করতে লাগল। হঠাৎ একটা তাঁবু থেকে মেয়েলী চিৎকার শুনে সে নিঃশব্দে তাঁবুটার পেছনে গিয়ে উঁকি দিয়েই মাথায় রক্ত উঠে গেল তার। হাত-পা বাঁধা ভদ্রলোক পড়ে আছেন একদিকে আর একদিকে মেয়েটিকে হাতে ধরে চাবুক দোলাচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর লোক।

মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁবুটার ভেতর। জ্যাকী নিঃশব্দে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল লোকটার বুকে। একটা চিৎকার করারও অবসর পেল না লোকটা। তার ভৃত্য দুটি ছুটে চলে গেল শেখকে খবর দিতে।

জ্যাকীকে দেখেই চিৎকার করে উঠেছিল মেয়েটি।—জ্যাকী, আমায় বাঁচাও।

বিদ্যুৎগতিতে জ্যাকী দুজনেরই বাঁধন কেটে তাঁবুর সামনে দুটো ঘোড়ায় তুলে দিয়ে বলল—তোমরা পালাও।

—আর তুমি জ্যাকী? মেয়েটি কেঁদে উঠল।

—একটু পরে আসছি আমি। শেখের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে। তোমরা যাও। বলেই সে ঘোড়া দুটিকে আঘাত করে ছুটিয়ে দিল। লাফিয়ে চলে গেল ঘোড়া দুটি বনের আড়ালে।

আর ঠিক তক্ষুণি একদল আরব দস্যু জ্যাকীর উপর চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দী করে ফেলল তাকে। সামনে দাঁড়িয়ে শেখ। একটা লাফ দেওয়ারও সুযোগ পেল না জ্যাকী।

হা হা করে শেখ হেসে বলল—কি? খুব চালাক, না—আ? বলেই সে চিৎকার করে উঠল—এই, তোরা তাকে নিয়ে তাঁবুর সামনের খুঁটিতে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দে।

কোন জারিজুরি খাটল না জ্যাকীর। দস্যুগুলি তার হাত-পা খুঁটিতে বেঁধে দিল আগুন জ্বালিয়ে। জ্যাকী বুঝল আর রক্ষে নেই তার। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল হাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে সে এক বিকট চিৎকার করে ডাক দিল হাতিটাকে।

কেউ কিছু বুঝতেই পারল না, হঠাৎ যেন বনটাই এসে ঝাপটে পড়ল সেখানে। লোকজন দলে পিষে, তাঁবু ভেঙ্গে, আগুন ছড়িয়ে ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিল সব হাতিটা। মা-রে, বাবা-রে করে দস্যুরা যে যেদিকে পারে লাগল ছুট। তারপর হাতিটা জ্যাকীকেশুদ্ধ খুটিটা এঁকটানে উপড়ে পিঠে ফেলেই দে ছুট বনের আড়ালে। ছুটছে তো

ছুটছেই। হাত-পা বাঁধা জ্যাকী কোনমতে আঁকড়ে ধরে রাখল তার পিঠ।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর বাড়ির কর্তা ইংরেজ ভদ্রলোকও খুঁজছিলেন তাকে। সেদিনই হঠাৎ তিনি পেয়ে গেলেন তাকে, সঙ্গে সেই ভদ্রলোক। ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল তারা।

বাড়ির কর্তাকে দেখেই একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েটি হাউ হাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ে।—আমি অন্যায় করেছি কর্তা। যে শাস্তি আমাকে দেবেন দিন, কিন্তু জাকীকে বাঁচান।

—জ্যাকী! বিস্মিত হলেন কর্তা।—কি বলছ তুমি? জ্যাকী কোথায়?

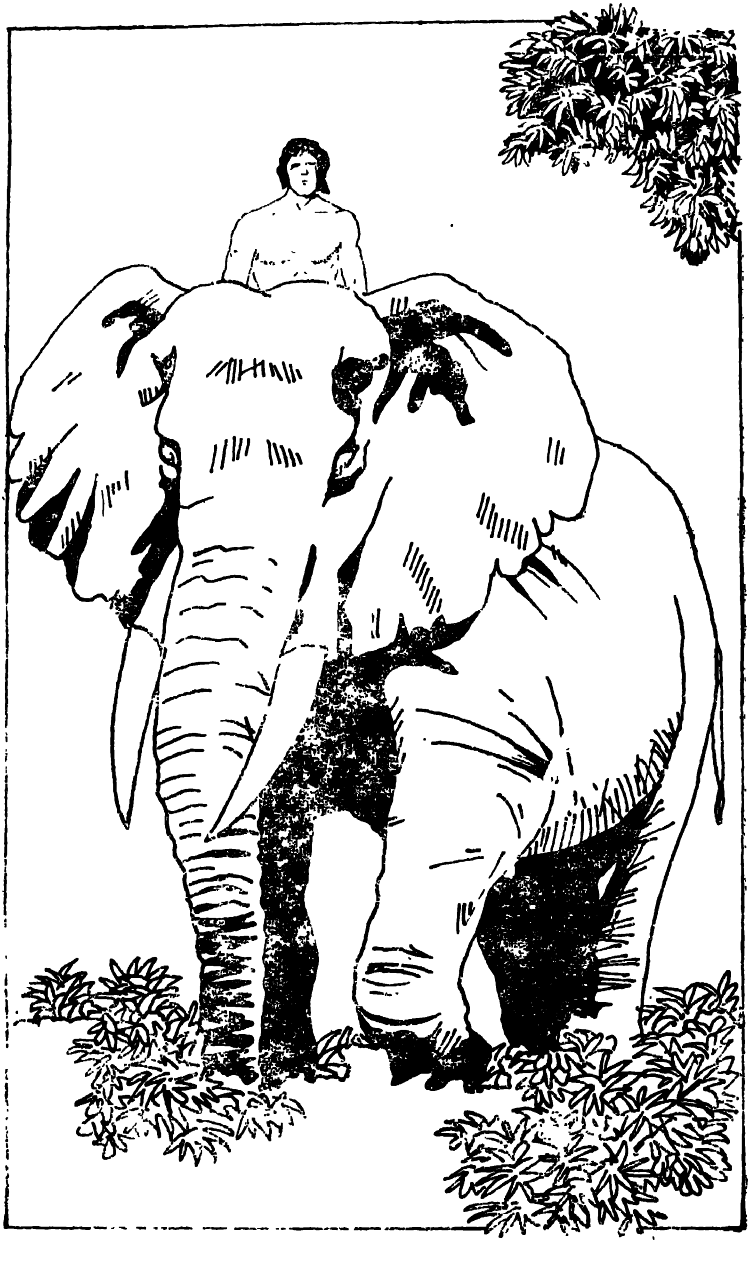
—শেখের তাঁবুতে। একা। আমাদের উদ্ধার করে সে একা রয়ে গেছে সেখানে।

—উম্! কি বলছ তুমি? চিন্তিত হলেন কর্তা। শেখকে তিনি চিনতেন। পরক্ষণেই বললেন—ঠিক আছে। তোমরা যাও। দেখছি আমি। বলেই তিনি তার ভৃত্যদের সঙ্গে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ছুটে চলে গেলেন একা।

সবার সঙ্গে মেয়েটি বাড়ি চলল বটে, কিন্তু জ্যাকীর জন্য মনে তার শান্তি নেই। যেতে যেতে বাড়ীর কাছে এসে সে আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে ভদ্রলোককে বলে উঠল—আপনি যান। আমি জ্যাকীকে না নিয়ে ফিরছি না। বলেই সে একলাফে ঘোড়া থেকে নেমেই দে ছুট বনের আড়ালে। হতভম্ব ভৃত্যরা ছুটেও ধরতে পারল না তাকে।

তার ভাগ্য ভাল। ছুটতে ছুটতে সে একজায়গায় এসে পেয়ে গেল জ্যাকীকে। খুঁটিশুদ্ধ জ্যাকীকে মাটিতে নামিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল হাতিটা।

জ্যাকীকে দেখে মেয়েটি 'জ্যাকী জ্যাকী' বলে চিৎকার করে তার কাছে ছুটে যেতেই তেড়ে এল হাতিটা। ছিটকে দূরে সরে গেল মেয়েটি।



জ্যাকী বলল—একটু দাঁড়াও। হাতিটা শান্ত হলে ধীরে ধীরে এসে আমার ছুরিটা দিয়ে আমার হাত-পায়ের বাঁধনগুলি কেটে দিও।

কিন্তু বললে হবে কি, হাতিটা তাকে জ্যাকীর কাছে যেতে দিলে তো! একবার বিরক্ত হয়ে মেয়েটি জোর করে যেতে গিয়েই লাগাল বিপদ। হাতিটা আর ছাড়বে না তাকে। ছুটল তার পিছনে। চিৎকার করে জ্যাকীও থামাতে পারল না হাতিটাকে।

মেয়েটি তখন পরিত্রাহী চিৎকার করে ছুটেছে বনজঙ্গল ভেঙ্গে—বাঁচাও, বাঁচাও। আর একটু হলে বোধহয় হাতিটা ধরেই ফেলত তাকে। হঠাৎ কে যেন—হেই—বলে কোত্থেকে লাফিয়ে পড়ল হাতিটার পিঠে। মুহূর্তে থেমে গেল হাতিটা। যেন পোষা কুকুর।

অবাক বিস্ময়ে মেয়েটি বলে উঠল—কর্তা, আপনি! বলে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এভাবে তো সে কর্তাকে আর কখনো দেখেনি। সুন্দর, সুঠাম, পেশীবহুল খালি গায়ে, পরণে একটা হরিণের ছাল, কোমড়ে ছুরি, হাতির পিঠে বসে আছে তার উদ্ধারকর্তা।

একটু দূরে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে শুয়ে জ্যাকীও কম বিস্মিত নয়।

এক লাফে টারজান হাতির পিঠ থেকে নেমে মেয়েটিকে নিয়ে ধীরে-ধীরে জ্যাকীর কাছে গিয়ে বলে উঠল— জ্যাকী!

—বাবা, তুমি?

টারজান হেসে কোমড় থেকে ছুরি বার করে জ্যাকীকে মুক্ত করে বলল—কোথায় লেগেছে জ্যাকী?

—না বাবা লাগে নি। এই হাতটা থাকতে শেখের সাধ্য কি কিছু করে আমার? তবে বাবা, আজ বুঝলাম বনে টারজান একজনই।

টারজান তার পিঠে চাপড় মেরে বলে উঠল—দূর বোকা, নে আয়। বলে তারপর টারজান দুজনকেই হাতির পিঠে উঠিয়ে চললেন বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে টারজান মেয়েটি ও জ্যাকীকে হাতির

পিঠ থেকে একটা ঝোপের আড়ালে নামিয়ে দিয়ে জ্যাকীকে বলল—এই পোশাকে বাড়িতে যাবি কি? তোর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি পোষাক দিয়ে। এখানে অপেক্ষা কর তোরা। বলে টারজান হাতিটা রেখে জেনী, জেনী, বলে ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন বাড়িতে।

বাড়ীর সব ভৃত্যরা তো অবাক! কর্তাকে তো তারা এমন পোষাকে আর কখনো দেখে নি।

জেনী বেরিয়ে এসে বলল—টারজান তুমি? এ পোষাকে?

—কথা পরে হবে। তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে এস। এগিয়ে এসে জেনীর মাথার চুলগুলি এলোমেলো করে দিল টারজান।

—কই কোথায়? বলে জেনী লাফিয়ে উঠতেই টারজান বলল—শুধু ছেলে নয়, পুত্র-বধুকেও। যাও, যাও। দু প্রস্থ পোষাক নিয়ে যাও, বাড়ির সামনে বড় ঝোপটার আড়ালে।

—পুত্রবধূ! জেনী বিস্মিত।

—হ্যাঁ গো! তোমাকে বলিনি। সেই যে মেয়েটি আমাদের বাড়িতে ছিল, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি সে জংলী মেয়ে নয়। ফরাসী সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। বংশ পরিচয়ে সে আমার সমগোত্রীয়।

—সত্যি? জেনী বলল।

—হ্যাঁ। যাও, যাও। নিয়ে এস গিয়ে তাদের। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে প্যারিসে দার্নোকে লিখে তার বাবাকেউ আনাব দেখো।

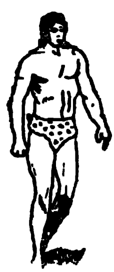
তারপর জেনী কি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? মহা সমারোহে চাকর-বাকর নিয়ে তাদের নিয়ে এল সে। তারপর দুদিন বাড়িতে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দ হবে না কেন? টারজান যে এরই মধ্যে স্থানীয় এক চার্চে নিয়ে গিয়ে তাদের বিয়েও দিয়ে দিয়েছে।

কয়দিন পরে লণ্ডনে ফিরেই টারজান দার্নোকে চিঠি লিখে মেয়েটির বাবাকে আনাল বাড়িতে।

তারপর পিতা-পুত্রীর মিলনটাও কম মধুর হয়নি।

পিতা তো ঘরে ঢুকেই মেয়েকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। পুত্রীর প্রথমটা দ্বিধা এলেও পরক্ষণে সেও 'বাবা, বাবা' বলে জড়িয়ে ধরল পিতাকে। টেবিলের উপর মেলে রাখা বনের দুবৃত্তের বাক্স থেকে আনা তার ছোটবেলার ফটোটা ও খবরের কাগজের টুকরোগুলি তার হাতের ধাক্কায় পড়ে গেল মেঝেতে।

টারজান একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করল আনন্দে।





ভয়ংকর টারজান

বিচিত্র মানুষের মন। কেউ বা হাসায়, কেউবা কাঁদায় আবার কেউবা হিংসায়, ঈর্ষ্যায়, শত্রুতায় সভ্যতাকে ফেলে সীমাহীন অসুবিধেয়। ব্যতিক্রম নেই কোথাও। কি সভ্য, কি বন্য সবাই এক।

টারজানের জীবনেও তাই দেখি কত না লড়াই। লড়াই করে চলেছে সে জীবনের প্রতি পদে।

আজ ছয়মাস সে ঘুরছে বনে বনে তার স্ত্রী জেনীর খোঁজে। কোন সুদূর থেকে একদল জার্মান সৈন্য এসে তার বাংলো ছারখার

করে তার জেনীকে নিয়ে গেছে তারা। কোথায়? খোঁজ পায়নি টারজান। ঘুরেই চলেছে সে দিনরাত ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। কিন্তু তার চরিত্রের গঠন কঠোর। হার মানবে না সে। মানেওনি। আশায় আশায় উন্মাদ হয়ে খুঁজছে সে জেনীকে। কেউ বলে তাকে নিয়ে চলে গেছে তারা। কেউ বলে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোন এক গভীরতম প্রদেশে। কিন্তু কোথায়? খুঁজে বার করতেই হবে তাকে।

এমনি করেই সে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক জায়গায় এল যে এখানে আগে আর কোনদিন যায়নি। অদ্ভুত সব বনের গাছপালা, অদ্ভুত সব জন্তু। খুব সাবধানেই চলেছে সে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে হলে গাছে উঠে বিশ্রাম করে। রাতে তো তার গাছই সম্বল।

এমনি একদিন দিনের বেলায়ই গাছে উঠে বিশ্রাম করছে, হঠাৎ সে দেখে তারই মত সাদা চেহারার একটা লোক খড়্গ হাতে চিৎকার করে ছুটে আসছে। অদ্ভুত গড়ন লোকটার। সারা গায়ে লোমের আধিক্য, পেছনে একটা লেজ। ছুটছে সে এক সিংহের তাড়ায়। সিংহটাও দেখতে ঠিক তার দেখা সিংহের মত নয়।

সে যাহোক্ সিংহের ডাক শুনলেই তার রক্ত চনমন করে ওঠে। ছুটতে ছুটতে লোকটা ততক্ষণে গাছের নীচে এসে পড়েছে আর সিংহটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। টারজান আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। এক চিৎকার করে সে লাফিয়ে পড়ল সিংহের ঘাড়ে। আর তারপরেই লাগল সিংহ মানুষে মরণ-পণ যুদ্ধ। লোকটাও তা দেখে ছুটে এসে করল সাহায্য খড়্গ নিয়ে। তারপর সিংহটাকে ঘায়েল করে দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্মিত হয়ে।

নীরবতা ভঙ্গ করে টারজানই প্রথম কথা বলেছিল তার সঙ্গে। কিন্তু লোকটির ভাষা সে বোঝেনি। লোকটাও তাই। টারজানের ভাষাও তার অজানা। কিন্তু সাধু ইচ্ছে থাকলে সবই হয়। ভাষা

প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা দুজনেই দুজনের বন্ধু হয়ে গেল। তাতে টারজানেরই হল সুবিধে অজানা অচেনা পরিবেশে। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বন্ধু সে জানে না। কেন যে এসেছে তাও বোঝাতে পারেনি সে বন্ধুকে। কোথায় যে থাকে বন্ধু তাও সে জানে না।

এমনি একদিন দুই বন্ধুতে মিলে একটা হরিণ শিকার করে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছে হঠাৎ কোত্থেকে ঠিক বন্ধুর মতই কে একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধুর উপরে। এক ঘুষিতেই বন্ধু অজ্ঞান। লোকটা দেখতে যেন আরও ভয়ঙ্কর। যেমন কালো লোমশ গরিলার মত দেখতে, দাঁতগুলিও ধারাল।

বন্ধুকে মাটিতে ফেলেই সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজানের উপরে। এত আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা যে টারজান কিছু বুঝেই উঠতে পারল না। কিন্তু তবুও সে টারজান। সেও তক্ষুণি জড়িয়ে ধরল নতুন লোকটিকে। কেউ কম যায় না। লড়াই করতে করতে দুজনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঠিক এমন সময় কোত্থেকে এক সিংহ এসে আক্রমণ করল তাদের। মুহূর্তে টারজান কালো লোকটিকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহের উপরে। কালো লোকটিও এই বিপদে ছুটে গিয়ে টারজানকে সাহায্য করে দুজনে মিলেই শেষ করে দিল সিংহটাকে। তারপর ঠিক সাদা লোকটির মতই সেও হয়ে গেল তার বন্ধু।

টারজান দুজন বন্ধু পেল বটে, কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে যে সদ্ভাব নেই তা সে প্রতি পদেই বুঝছে। বুঝছে এখানেও সেই সাদা ও কালোর তফাৎ। সবাই মনে করে সাদাই শ্রেষ্ঠ

যাহোক এমনি করেই দিন চলে যায়। তাদের ভাষায় শব্দ সংখ্যা কম। টারজান ইতোমধ্যে তাদের ভাষাটাও শিখে ফেলেছে। পরিচয়ও পেয়েছে তাদের।

সাদা মানুষটি থাকে সামনে যে পাহাড়টি আছে তারই এক

জায়গায় সমতলভূমির একটি নগরে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নগরটি। সেখানে রাজার সৈন্যদলে কাজ করে সে। তাদের রাজ্য রাজার শাসনে চললেও তাদের দেবতার পুরোহিতদের দাপটই বেশী। সে রাজার মেয়েকে ভালবাসে। রাজকুমারীও তাই। কিন্তু রাজা চায় তারই অধীন এক সর্দারের হাতে মেয়ে দিতে। তাই রাজা তাকে মারতে চায়। লোকও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাকেই মেরে ফেলেছে সে। কাজেই রাজা এরপর তাকে পুরোহিত পদে বরণ করতে চায়। পুরোহিত হলে সে আর বিয়ে করতে পারবে না। তাই নিয়ম। তাই সে পালিয়েছে রাজ্য থেকে। তার বাবা—মা, ভাই বোন সবাই নগরীতেই থাকে।

কালো মানুষটি থাকে সামনের পাহাড়েরই আর একপাশে। তাদের কোন রাজ্য নেই। তারা স্বাধীন। তবে তাদের দলপতি আছে। আর তারা থাকে পাহাড়েরই গায়ে অনেক গুহা আছে সেই গুহাতে। সেখানেও সে একটি মেয়েকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের দলপতি তাকে চায়। তাই সে চলে এসেছে। তার ইচ্ছে, যেভাবেই হোক দলপতিকে হত্যা করে সে দলপতি হবে। মেয়েটিকেও বিয়ে করবে। তার বাবা-মা, ভাই-বোন আসেনি।

টারজান সব শুনে বলল—ঠিক আছে, আজ থেকে আমি তোমাদের সাহায্য করব। তোমরাও করবে আমাকে সাহায্য। কারণ আমি আমার স্ত্রীকে খুঁজছি! জানি না সে কোথায় আছে। সব সময় আমরা তিনজন একসাথে লড়ব। রাজী?

—হ্যাঁ, রাজী। বলে দুজনেই হাত মেলাল টারজানের সঙ্গে।

দুর্জয় সাহস তিনজনেরই। নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে তারা প্রথমে কালো মানুষটির সঙ্গেই যেতে লাগল তাদের জায়গায়। খাড়াই পাহাড়। পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে কালো মানুষটিই উঠতে লাগল প্রথমে। পেছনে উঠছে টারজান ও সাদা মানুষটি।

কালো মানুষটির ইচ্ছে ছিল সে প্রথমে তার প্রিয় মেয়েটির সঙ্গেই

দেখা করে। তাই সে তার খোঁজে তার গুহাটার মাথায় পা দিয়েই দেখল সামনে সর্দার। সর্দারও তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ ছুটে এসে আক্রমণ করল কালোকে। কালোও প্রস্তুত হয়েই ছিল। লেগে গেল যুদ্ধ। হাতাহাতি। এই নিয়ম। তাদের চিৎকারে গুহা থেকে আরও কালোর দল ছুটে এসেছিল সর্দারের সাহায্যে। কিন্তু বাদ সাধল সাদা মানুষটি ও টারজান। দুয়েকজন ঘায়েলও হয়ে গেল তাদের হাতে।

সর্দারের বয়স হয়েছিল। সে কালোর সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারল না। কালোর এক ধাক্কায় পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে প্রাণ হারাল। দলপতি হল কালো। সবাই মেনেও নিল তাকে; তবে বিদেশী দুজনকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। বিচার হবে তাদের। তাদের রাজ্যে বিদেশীর স্থান নেই।

—না—আ—। হুঙ্কার দিয়ে উঠল কালো।—পরিবর্তন হবে সব এখানে। পরিবর্তন হয়েছে দলপতির। নিয়মেরও হবে পরিবর্তন। আজ থেকে কোন রক্তক্ষয় হবে না এখানে। সুখে, শান্তিতে বাস করবে তোমরা। যে আমার কথা শুনবে না, প্রাণ হারাবে সে। যাও।

সুড়সুড় করে চলে গেল সবাই। একটি কথাও কেউ বলল না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল টারজান ও সাদা।

সবই হল, কিন্তু তারপর তারা মেয়েটির গুহায় গিয়ে তাকে পেল না।

উন্মাদের মত হয়ে গেল কালো।—কৈ, কোথায় সে?

টারজান লাফ দিয়ে তার হাত ধরে বলল—দাঁড়াও বন্ধু, দাড়াও। দেখছি আমি। বলে সে তার ঘ্রাণশক্তির কথা তাদের বুঝিয়ে বলে বলল—এখানে সেই দলপতি এসে হানা দিয়েছিল তাই মেয়েটি পালিয়েছে। এস আমার সঙ্গে। বলে সে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে ছুটল গুহা পেরিয়ে।

সত্যিই তাই। তারা এখানে আসবার একটু আগেই সর্দার এসে

ঢুকেছিল মেয়েটির গুহায়। তাকে জোর করেই সে নিয়ে যাবে আজ। কিন্তু মেয়েটিও কম নয়। তাকে সর্দার ধরতে যেতেই সে সর্দারের মাথায় হঠাৎ এক লাঠি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে গিয়েছিল। লাঠির আঘাতে কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সর্দার। তারপরে বেরিয়েই পড়েছিল কালোর সামনে।

যাহোক টারজান সবাইকে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে খানিক এগিয়েই দেখতে পেল কারা যেন ছুটে আসছে চিৎকার করে। তার পিছনে একদল সৈন্য।

কালো দেখেই চিনল সবাইকে। মেয়েটির বাবা ও ভাইকে তাড়া করেছে তাদের শত্রু রাজ্যের লোক। তারা প্রায়ই এসে হানা দিয়ে এই রাজ্য থেকে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে রাখে।

যাহোক মেয়েটির খোঁজে আর যাওয়া হল না তাদের। শত্রুদেরই রুখে দাঁড়াতে হল। ইতোমধ্যে কালো একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে লোক আনবার জন্য।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে টারজান অজ্ঞান হয়ে পড়তেই শত্রুরা তাকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। অন্যদিকে যুদ্ধ করতে করতে সাদা ও কালো টেরই পেল না।

টারজানকে তারা বন্দী করল বটে; কিন্তু রাখতে পারল না। সেদিন রাত্রেই সে কারাগারের প্রহরীকে হত্যা করে পালিয়ে গেল বনে। কিন্তু পথঘাট চেনে না কোথায় যাবে সে? ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে মেয়েটির গন্ধ পেয়ে ভাবল, আরে! মেয়েটি এখানে কোত্থেকে এল! যাহোক গন্ধ লক্ষ্য করে ছুটে একটা গুহায় ঢুকেই দেখতে পেল একটা বিরাট গরিলার মত মানুষ ধরতে যাচ্ছে মেয়েটিকে। চিৎকার করছে মেয়েটি।

তা দেখে টারজান কি আর স্থির থাকতে পারে? সেও তক্ষুণি গিয়ে আক্রমণ করল গরিলাকে। লেগে গেল ভীষণ যুদ্ধ। যুদ্ধ করতে করতেই চিৎকার করে মেয়েটিকে বলল—চুপ করে বসে থাক। আমি

কালোর বন্ধু। তোমায় বাঁচাতে এসেছি।

গরিলার সঙ্গে যুদ্ধে টারজানের অভ্যাস আছেই। সে হঠাৎ তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল গরিলাটার বুকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল গরিলাটা। আর হঠাৎ তার ধাক্কা লেগে টারজান ছিটকে পড়ল গুহা থেকে নীচে।

ভাগ্যিস খাদে পড়ে যায়নি টারজান, তাই রক্ষে। টারজান পড়ে যেতেই মেয়েটিও ছুটে নিচে গেল। কিন্তু ততক্ষণে টারজান উঠে দাঁড়িয়েছে।

—কোথাও লাগেনি তো তোমার? মেয়েটি টারজানের হাত ধরল।

—না, গরিলাটা কোথায়? জিজ্ঞেস করল টারজান।

—শেষ। ঠোঁট উল্টে মেয়েটি বলল—জান, এরা অর্দ্ধেক পশু, অর্দ্ধেক মানুষ। খালি হাতে তুমি তাকে—।

টারজান থামিয়ে দিল তাকে।—না, না এমন আর কি? যাও, তুমি ঘুমিয়ে থাকগে এখন। আমি থাকব পাহারায়।

সেদিন রাত্রিটা কাটিয়ে তার পরদিন থেকেই আরম্ভ হল তাদের যাত্রা। পথঘাট কিছুই জানা নেই টারজানের। কিন্তু মেয়েটিকে নিয়ে যেতেই হবে তাকে তার বন্ধু কালোর দেশে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই তারা। পথ যেন আর শেষ হয় না। এমনি একদিন তারা খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে একটা গাছে উঠে বিশ্রাম করছে হঠাৎ কোত্থেকে তাদের গাছের নীচে বিকট বিশাল জন্তু এসে হাজির। এমন জন্তু টারজান কখনও দেখেনি। ঘাবড়ে গিয়ে সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল—এটা কি?

মেয়েটি বলল—একে বলা হয় গ্রীফ। সাংঘাতিক জন্তু এরা। একবার মানুষের সন্ধান পেলে এরা তাকে না ধরে ছাড়ে না। কোথাও গিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ঠিক গিয়ে হাজির হবে। আমাদের শত্রুরা কিন্তু এদের বেশ পোষ মানিয়ে কাজে লাগায়।

বলতে না বলতেই কোত্থেকে একটা গরিলার মত মানুষ এসে 'হুই' করে চিৎকার করে একটা লাঠি দিয়ে জন্তুটার মাথায় আঘাত করে তার পিঠে উঠে তাকে চালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মানুষের সন্ধান সে পেয়েছে, সে কি আর তার কথা শোনে? সে ঠিক গাছের উপর দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি ততক্ষণে গাছের উপরে তাদের দেখে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। টারজান দেখল মহা বিপদ। তার চিৎকারে যদি অন্য কেউ এসে পড়ে তবে বিপদ। তাই তক্ষুনি টারজান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসা ধনুকে তীর লাগিয়ে ছুড়ে মারল লোকটার বুকে। পড়ে গেল লোকটা, আর উঠল না। জন্তুটা তখনও গাছের নীচ থেকে গেল না দেখে টারজান মেয়েটিকে বলল —বুঝতে পারছি এটা যাবে না। এক কাজ কর। তুমি পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাক। আমি গাছে গাছে অন্যদিকে চলে যাব। এটাও তখন ছুটে যাবে আমার পেছনে। সেই ফাঁকে তুমি গুহাতে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। যেভাবেই হোক আমি দেখা করব তোমার সঙ্গে। আর যদি আমি না আসি তুমি চলে যেও।

তাকে ফেলে মেয়েটি কি যেতে চায়? কিন্তু তবুও যেতে হল তাকে। এদিকে টারজান বহু চেষ্টা করেও জন্তুটাকে ফাঁকি দিতে না পেরে হঠাৎ কি মনে-করে একটা লাঠি নিয়ে 'হুই' করে চিৎকার দিয়ে ছুটে গিয়ে জন্তুটার মাথায় করল আঘাত। কি আশ্চর্য! জন্তুটা যেন পোষ মেনে গেল। টারজান তক্ষুণি একলাফে তার পিঠে চেপে চলল মেয়েটির সন্ধানে। কিন্তু পেল না সে মেয়েটিকে গুহায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

তারপর টারজান আর কি করে? সে জন্তুটার পিঠে চেপেই যেতে লাগল এগিয়ে। ভাবল, এটার পিঠে চেপেই সে তার কালো বন্ধুর দেশে গিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। সে তখন মনের আনন্দেই যাচ্ছিল বন জঙ্গল ভেঙ্গে। পথে হঠাৎ একদল সাদা যোদ্ধা তাকে এই ভয়ঙ্কর জন্তুটার পিঠে চেপে যেতে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল

ভয়ে। জন্তুটাও তাদের করেছিল তাড়া, না পালিয়েই বা করবে কি তারা ?



যাহোক সেদিন রাত্রিতে টারজান গাছের উপরেই কাটাল জন্তুটাকে গাছের নীচে রেখে। কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে সে দেখে—

পালিয়েছে জন্তুটা। জন্তুটার পিঠে চেপে এলেও ভয় তারও ছিল। এটা পালিয়ে যাওয়াতে সে এখন নিশ্চিন্ত হয়েই পথ চলতে লাগল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে সে কখন যে সাদা মানুষের নগরীর কাছে এসে পড়েছে খেয়াল নেই তার। হঠাৎ দুজন সাদা যোদ্ধা এসে তার পথ রোধ করাতে চমকে উঠে সে বলল —এই যে, তোমাদেরই খুঁজছিলাম আমি।

—আমাদের খুঁজছিলে? কেন? বলে তাকিয়ে রইল যোদ্ধারা।

—তোমাদের রাজার কাছে আমাকে নিয়ে চল। হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান।

—তুমি কে? জিজ্ঞেস করল একজন যোদ্ধা। —শত্রু বা ক্রীতদাস ছাড়া এখানে কেউ আসে না।

—না, আমি ক্রীতদাস বা শত্রু কোনটাই নই। আমি তোমাদের দেবতার কাছ থেকে আসছি। নিয়ে যাবে কি না বল? বলেই সে দিল আর এক হুঙ্কার।

টারজানকে দেখেই তাদের খটকা লেগেছিল। লোকটার লেজ নেই। তারপর আবার হুঙ্কার। ভয়ে ভয়েই তারা তাকে নগরীর ভিতর নিয়ে গেল। কিন্তু আরও অনেক যোদ্ধা এসে তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করাতে ভীষণ চটে গেল টারজান—অপদার্থ তোমরা। তোমাদের এত সাহস, তোমাদের দেবতার পুত্রকে অবিশ্বাস?

এরপর তাদের ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে তাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবে না? রাজারও অবশ্য প্রথমটা খটকা লেগেইছিল—সে কি সত্যি দেবতার পুত্র? কিন্তু তার যোদ্ধাদের কথায়, সে যে গ্রীফ জন্তুর পিঠে চড়ে এসেছে এ কথায়, তার গড়ণ দেখে রাজার অবিশ্বাস আর রইল না। সভাসদরাও গদগদ হয়ে পড়ল টারজানের প্রতি।

রাজা তারপর তাকে খাতির করে রাজপ্রাসাদের চারদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে। কিন্তু মন্দির ঘুরিয়ে দেখাতে গিয়ে লাগল গেরো। প্রধান পুরোহিত এত সহজে বিশ্বাস

করতে চাইল না। তবুও একটা খটকা লেগেই ছিল তার।

মন্দিরের কাজে কতজন ক্রীতদাস দেখে টারজান প্রশ্ন করে বসেছিল—এরা কারা?

প্রধান পুরোহিত জবাব দিলেন—একথা তো আপনার অজানা নেই প্রভু।

হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল টারজান—দেবতার মুখের উপর প্রশ্ন?

পুরোহিত ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—আজ্ঞে, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় একজন ক্রীতদাসের রক্ত দিয়ে মন্দিরের বেদী ধুইয়ে দেওয়া হয়।

—না—আ। হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান। আর হবে না আজ থেকে। দেবতা রক্ত চায় না। ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দাও এক্ষুণি।

পুরোহিত আর কি করে? দিতেই হল তাকে তাদের মুক্ত করে। ক্রীতদাসরা টারজানকে প্রণাম করে চলে গেল। তারপর পুরোহিত টারজানকে সব ঘুরিয়ে দেখাল। কিন্তু একটা ঘর দেখাল না কিছুতেই।

টারজান জিজ্ঞেস করল—এ ঘরটা দেখালে না?

—না প্রভু। পুরোহিত ঢোক গিলে বলল—এটা এমনি পড়ে আছে। ঘরটা ফাঁকা।

টারজান তাতে কিছু বলল না বটে, কিন্তু খটকা রইল তার।

সব দেখে শুনে সে চলে এল। সে বুঝল পুরোহিতের সন্দেহ যায় নি। যাহোক তার সম্মানে রাজা সেদিন রাত্রিতে একটা ভোজেরও আয়োজন করেছিলেন।

তার পরদিন ভোরবেলায় টারজানের সঙ্গে রাজকুমারীর দেখা হয়ে যায় একটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগানে। বেড়াতে বেড়াতে খেয়াল করেনি সে। দাসীকে নিয়ে রাজকুমারী বসেছিল বাগানে। হঠাৎ দাসীটিই তাকে দেখতে পেয়ে ডেকে উঠে 'টারজান' বলে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টারজান। দেখে দাসীটি আর কেউ নয়,

সেই কালো মেয়েটি, যাকে সে খুঁজছিল। টারজান ভাবল, আরে, এ এখানে এল কি করে? সাদা মেয়েটিই বা কে?

সাদা মেয়েটি কালোটিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি তাকে চেন?

টারজান তক্ষুণি তাকে ঈশারা করে কথা বলতে নিষেধ করল।

কালো বললে—কেন? আপনি কি জানেন না রাজদরবারে কে এসেছিলেন?

—ও, তিনিই সেই? দেবতার পুত্র?

ততক্ষণে টারজান এগিয়ে এসে সাদাটিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে?

—আমি? সাদাটি বলল—আমি রাজকুমারী।

—ও, তুমিই তার ভাবী পত্নী?

—কার কথা বলছেন প্রভু। রাজকুমারী তার পায়ে পড়ে গেল।

—তাকে তুমি ভালবাস। তবে তাকে পেতে হলে তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে। এক, এই দাসীটিকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর দুই, সব ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে হবে।

—তা তো আমি পারব না প্রভু। বাবা রাগ করতে পারেন। তাছাড়া আপনি জানেন না—।

—না, আর জানার দরকার নেই। বলে এমন সময় রাজা পেছনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—আপনার এখানে আসা ঠিক হয়নি প্রভু। এ নিষিদ্ধ বাগান। এখানে আপনাদেরও প্রবেশাধিকার নেই। যাকগে, আসুন—।

—কোথায়? বিস্মিত টারজান।

—গেলেই দেখতে পাবেন। বলে রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন—তাতে আমার কোন দোষ নেবেন না প্রভু। প্রধান পুরোহিত সব জানেন।

টারজান বুঝল বিপদে পড়ে গেছে সে। পুরোহিত নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র করে তাকে শাস্তি দিতে চায়।

সত্যিই তাই। টারজানকে যেতেই হল রাজদরবারে।

টারজান গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই ফেটে পড়ল পুরোহিত রাগে। সে উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বলল—এই সেই অপরাধী? সে ভণ্ড, প্রতারক। দেবতার পুত্র বলে ঠকিয়েছে আমাদের। এখানে আসবার আগে তাকে লোকে টারজান বলত. খবর পেয়েছি আমি ক্রীতদাসদের কাছ থেকে। রাজকুমারীর দাসীটিকে ভয়ঙ্কর জন্তুর হাত থেকে উদ্ধার করে সে যখন আসছিল তখনই সে আমাদের হাতে ধরা পড়ে। এ দ্বারাই প্রমাণ হয় সে ভণ্ড।

মনে মনে প্রমাদ গুনল টারজান। কিন্তু মনে সাহস এনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে—তোমরা সবাই বিশ্বাস কর একথা? বল, বল। না হলে, না হলে—।

বলেও শেষ করেনি সে রাজার এক সামন্ত বলে উঠল—না, ক্রীতদাসের কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

পুরোহিত বিশ্বাস না করলেও অন্ধ-কুসংস্কারে উপস্থিত অনেকেই ভয় পেয়ে গেল টারজানের হুঙ্কার শুনে।

টারজান আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—কে, কে আমার বিচার করবে?

পুরোহিতের মনেও ভয় ছিল। তবুও বলল—আমিই করব তোমার বিচার।

—না—আ। আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান। যে অভিযোক্তা সে বিচার করতে পারে না।

সবাই বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

পুরোহিত বেগতিক দেখে তক্ষুণি বলে উঠল—বেশ। একে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিচার করব। কই, কে আছিস? তাকে বেঁধে নিয়ে চল মন্দিরে। পুরোহিতের কথার উপর কথা চলে না। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না ভয়ে।

সবার হাবভাব দেখে সাহস ফিরে এসেছিল টারজানের। বলল—

চল, আমি নিজেই যাচ্ছি। বলে সে সবার সঙ্গে গিয়ে উঠল মন্দিরে। কিন্তু মন্দিরে গিয়েই লাগল তুলকালাম।

মন্দিরে গিয়েই পুরোহিত চিৎকার করে সবাইকে আদেশ করল—খুন কর এই ভণ্ডকে।

কিন্তু পুরোহিতের দল ছাড়া এগিয়ে এল না কেউ। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে পুরোহিত তখন নিজেই এল একটা ছুরি নিয়ে।

মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল মন্দিরে। এক ঝটকায় টারজান একজন পুরোহিতকে তুলে ছুঁড়ে ফেলল প্রধান পুরোহিতের মাথায়। ছিটকে পড়ল পুরোহিত। আর তার পরেই সে একলাফে হাওয়া।

এদিকে লড়ায়ের শেষে সাদা ও কালো টারজানকে না দেখতে পেয়ে যখন বিষণ্ণ মনে যাচ্ছিল গুহায় তখন হঠাৎ এক বিদেশীকে রাইফেল হাতে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনেই। বিদেশীও কম অবাক হয়নি। বুঝতে পারছিল না, তারা শত্রু না মিত্র। কিন্তু বিদেশী টারজানের মতই দেখতে বলে শত্রুতা তারা করেনি। বরং সে টারজানকে খুঁজছে দেখে তারা তাকে খাতির করে নিয়ে চলল আপন গুহায়। ঠিক হল, তার পরদিনেই তারা বের হবে টারজানের খোঁজে। বের হলও তাই একশজন যোদ্ধা নিয়ে। আর পাহাড় পেরিয়েই তারা পেয়ে গেল সাদা মানুষটির দেশের একদল যোদ্ধাকে। কোথায় যাচ্ছিল তারা যুদ্ধ করতে। কিন্তু তাদের আর যাওয়া হল না। সাদা ও কালোর হাতেই তারা পড়ল ধরা।

তাদের কাছ থেকেই তারা জানতে পারল টারজানের বিপদের কথা। একথা শুনে বিদেশী কি আর স্থির থাকতে পারে? সে তাদের ফেলে ছুটে চলে গেল নগরীর দিকে।

টারজান পুরোহিতের কবল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, চলেও যেতে পারত, কিন্তু কালো মেয়েটির কথা ভেবে যেতে পারল না সে। তাছাড়া জেনীকেও তো সে পায়নি। কোথায় যে আছে সে তাও তো জানে না। তবে একটা সন্দেহ তার মনে বারবারই পাক

খাচ্ছিল। পুরোহিত মন্দিরের পাশের ঘরটা দেখাল না কেন? পালিয়ে গিয়েও তাই সে নিষিদ্ধ বাগানে এসে লুকিয়ে রয়েছিল। সে জানে এখানে কেউ আসবে না এক রাজকুমারী ছাড়া।

দেখাও হয়েছিল তার রাজকুমারীর সঙ্গে। কিন্তু রাজকুমারী তখন নিজের চিন্তায়ই বিভোর। সে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? তার বাবা তো তাকে কালকেই বিয়ে দিয়ে দেবে আর একজনের সঙ্গে।

টারজান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা! যে বিদেশিনী মহিলাকে আটকে রেখেছে শুনেছিলাম, তাকে কোথায় রেখেছে বলতে পার?

—হ্যাঁ। রাজকুমারী বলল—সে তো মন্দিরের পাশে ফাঁকা ঘরটাতেই আছে। কেন?

—না, এমনি। বলে টারজান ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

চলে গেল রাজকুমারীও।

তারপর রাত্রি অন্ধকার হতেই সে গিয়ে দিয়েছিল হানা সেখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, ভুলে সে গিয়ে পড়েছিল পাশের ঘরে। সেখানে ছিল একটা গ্রীফ। টারজানকে দেখেই তো সে এল ছুটে। টারজান তখন প্রাণ বাঁচাতে দেয়ালের একটা ফোকর দিয়ে গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। বাঁচানো হল না তার জেনীকে।

এদিকে জেনী পড়েছিল আরেক বিপদে। তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে পুরোহিত তাকে চায়। রাজারও ইচ্ছে তাকে রাণী করে। রাজার ভয়ে দিনের বেলা আসে না পুরোহিত জেনীর সঙ্গে দেখা করতে, তাকে বোঝাতে। রাত্রিবেলায়ই সে আসে। সেদিনও এসেছিল সে। বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল জেনী। এমন সময় রক্ষে পেয়ে গেল সে রাজার সামন্তের আবির্ভাবে।

পুরোহিত ও সামন্ত দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক! কিন্তু

পুরোহিত কি হাল ছাড়ে? সে সামন্তকে নিয়ে আলোচনার জন্য পাশের ঘরে যেতে উদ্যত হতেই লাফিয়ে পড়ল জেনী। না, যাবেন না আপনি। পাশের ঘরে গ্রীক আছে। মেরে ফেলবে আপনাকে। বলে জেনী ছুটে এসে সামন্তের হাত ধরতেই পালিয়ে গেল পুরোহিত।

সামন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জেনীকে,—আপনি আমাকে বাঁচালেন কেন?

জেনী বলল—আপনাকে বীর মনে হয়েছিল তাই।

সামন্ত বলল—বেশ। কোন ভয় নেই আপনার। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। বলে সে তাকে নিয়ে রাজকুমারীর কাছে রেখে এল।

এদিকে প্রাসাদের ভোজকক্ষে আরম্ভ হয়ে গেছে আরেক গণ্ডগোল। রাজা সেদিন যে সর্দারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন তার সম্মানে দিয়েছিলেন এক ভোজ। সর্দার নিজেও উপস্থিত ছিলেন সেই ভোজসভায়। ভোজসভা চলছে, হঠাৎ ছেলেটি নেশার ঘোরে হত্যা করে রাজাকে। সামন্তের অনুগামী সৈন্যরা তক্ষুণি 'মার-মার' করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপরে। কিন্তু তারা পালিয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য গিয়ে ঢোকে রাজ-অন্তঃপুরে। বাপ তো জেনীকে দেখে মুগ্ধ। সে তক্ষুণি জেনীকে জোর করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর ছেলে যেই রাজকুমারীর দিকে এগিয়েছে কালো মেয়েটি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। ছেলেটি রাগে তখন ছুরি খুলে কালো মেয়েটিকে যেই মারতে যাবে হঠাৎ টারজান এসে তার মুখে মারল ঘুসি। এক ঘুসিতেই সে কাৎ। আর উঠল না।

টারজান তক্ষুণি সব শুনে আবার ছুটল সর্দারের পেছনে। জেনীকে উদ্ধার করে এসে সে তাদের উদ্ধার করবে।

টারজানের অশান্তির যেন আর শেষ ছিল না। গ্রীকের হাত থেকে পালিয়ে গোপনে মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে

পেয়েছিল প্রধান পুরোহিতের ষড়যন্ত্র। নগরে লোক পাঠিয়ে উত্তেজিত করেছিল সৈন্যদের। তারা যেন সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। সেই সর্দারকে রাজা হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে পুরোহিত পাঠিয়েছে। পুরোহিতের কথা শুনে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে আগে জেনীর, রাজকুমারীর ও মেয়েটির উদ্ধারের ব্যবস্থাই করতে গিয়েছিল সে। আর তখনই সে পেয়ে গিয়েছিল সর্দারের ছেলেকে।

টারজান সর্দারের পেছনে ছুটল বটে, কিন্তু অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে সিংহদরজার কাছে আসতেই সৈন্যরা এসে ঘিরে ধরল তাকে। একা এতজনের সঙ্গে লড়বে কি করে সে? তাই সে পুরোহিতের ষড়যন্ত্রের কথা তাদের বুঝিয়ে বলে চলে গেল সে। তার কথা অবিশ্বাসও করতে পারল না তারা। তাকে দেবতা বলেই অনেকে মানে যে।

পাহাড়, চড়াই, উৎরাই ভেঙ্গে ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে সর্দারের প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছতেই ভয় পেয়ে গেল সৈন্যরা। কারণ তাকে তারা আগেও দেখেছে। এ লোকটা যে কি ঠিক বুঝতে পারছে না তারা। সর্দারেরও ভয় লেগে গেল সে এসেছে শুনে।

টারজান সরাসরি গিয়ে সর্দারকে জেনীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই ঘাবড়ে গেল সে। বলল—আজ্ঞে, তিনি তো পথেই পালিয়ে গেছেন।

—পুরোহিত দুজন যে এসেছিল তারা কোথায়? হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান।

—আজ্ঞে, তারা মন্দিরে আছে। বলেই তার মাথায় এক কুবুদ্ধি এল।—আসুন না, আসুন। বলে সর্দার তাকে নিয়ে মন্দিরের এক ঘরে ঢুকিয়ে বন্দী করে ফেলল।

কিন্তু সে টারজান। তাকে বন্দী করবে এক সামান্য সর্দার? খানিক পরেই সেই ঘরের জানালা ভেঙ্গে পালিয়ে গেল সে। জানতেই পারল না সর্দার।

সর্দার আর যাই করুক জেনী যে পালিয়ে গিয়েছে সে কথাটা

কিন্তু সে ঠিকই বলেছিল। জেনী পালিয়েই গিয়েছিল সর্দারের হাত থেকে। জেনীকে নিয়ে নৌকো করে হ্রদ পেরিয়ে যখন সে আসছিল তখনই জেনা পালিয়েছিল নৌকো থেকে। জানতেই পারেনি সর্দার।

পালিয়ে সে জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর তখনই সে ধরা পড়ে যায় এক জার্মান সৈন্যের হাতে। তাকে চিনত জেনী। এই সৈন্যটিই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জার্মান শিবির থেকে পালিয়েছিল তাকে নিয়ে। তারপরেই জেনী ধরা পড়ে সেই অদ্ভুত লেজওয়ালা মানুষের হাতে। জার্মান সৈন্যটি পালিয়ে যায়।

তাকে দেখে প্রমাদ গুনল জেনী। কিন্তু তখন সে মরীয়া। একদিন সৈন্যটিকে একটা গাছের ডাল দিয়ে আচমকা আহত করে আবার সে পালিয়ে যায়। সৈন্যটি ধরতে পারে না তাকে।

সেই অবস্থায়ই ঘুরতে ঘুরতে টারজানকে পেয়ে যায় জেনী। টারজানও তো খুঁজেই বেড়াচ্ছিল তাকে। তার ঘ্রাণশক্তির জোরেই সে জেনীকে এক গাছের উপরে এসে পায়। জেনী তো আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিল। তারপর দুজনের কত কথা।

এত আনন্দের মধ্যেও টারজান কিন্তু তার কর্তব্য ভোলেনি। কালো মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হবে তার, রাজকুমারীর বিয়ে দিতে হবে তার সাদা বন্ধুটির সঙ্গে।

তাই একদিন সে জেনীকে নিয়ে গিয়ে উঠল সে সাদা বন্ধুর বাবার রাজ্যে। সেই তো ছিল রাজার সামন্ত। সামন্তকে টারজান ভালই চিনত। নানাভাবে সে-ই টারজানকে সাহায্য করেছিল আগে।

টারজানের প্রতি সামন্তেরও ছিল শ্রদ্ধা। বিশেষ করে পুরোহিতের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে তার সৈন্যদের করেছিল সাহায্য। একথা জানত সামন্ত। প্রকারান্তরে রাজপ্রাসাদের সৈন্যদের দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। রাজার অবর্তমানে সামন্ত রাজ্যটাকে ঠিক রাখতে চেয়েছিল বলে পুরোহিতের বিষ নজরে পড়ে যায় সে। তখন থেকেই সে উত্তেজিত করেছিল অনেক সৈন্যকে।

টারজান জেনীকে নিয়ে তার কাছে যেতেই সামন্ত অত্যন্ত আদরে অভ্যর্থনা করেছিল তাকে। আগ্রহ করেই সে জেনীকে নিয়ে অন্তরপুরে রেখে দিল রাজকুমারী ও কালো মেয়েটির সঙ্গে। এই দুইজনকেও সে উদ্ধার করে এনে রেখেছিল তার অন্তঃপুরে।

তার পরদিনই তারা করল যুদ্ধযাত্রা পুরোহিতের বিরুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। পথে পুরোহিতের দলের দুয়েকজন সৈন্যও এসে যোগ-দিল তাদের সঙ্গে! এগিয়ে চলেছে তারা। আর বেশী দূরেও নেই নগর। পুরোহিতের বুঝি রক্ষে নেই আর।

কিন্তু আসলে পুরোহিত ছিল কৌশলী ও কুচক্রী। টারজান ও সামন্ত একদিকে যুদ্ধযাত্রা করেছে, আর একদিকে পুরোহিত চর পাঠিয়ে সামন্তের পুরোহিতের মধ্যে কয়েকজনকে তাদের দলে এনে অন্তঃপুর থেকে জেনীকে চুরি করে নিয়ে গেল।

টারজানরা প্রাসাদ নগরীর চতুর্দিক থেকেই আক্রমণ করবে এ পরিকল্পনাই তাদের ছিল। আর টারজান যাবে সুড়ঙ্গ পথে। রাত্রির অন্ধকারেই আক্রমণ করবে তারা।

তারা করলও তাই। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত নগরীতে বাধা দেওয়ারও কেউ ছিল না তখন। তবু যুদ্ধ বলে কথা। প্রথমটায় না পারলেও একটু পরেই হৈ হৈ করে লেগে গেল মহা গণ্ডগোল। এই ফাঁকে মশাল নিবিয়ে সুড়ঙ্গপথে টারজান এগিয়ে যেতেই সে দেখে পুরোহিতের দল কাকে যেন মুখ-হাত-পা বেঁধে নিয়ে চলেছে ধরে। মুহূর্তে টারজানের মনে হল, জেনী নয়ত? তক্ষুণি সে ছুটল তাদের পেছনে। যে করেই হোক রক্ষা করতেই হবে তাকে।

এদিকে পুরোহিতের দলও কম চালাক নয়। তাদের মশালের আলোতেই বুঝল ছুটে আসছে টারজান। যাহাতক মনে হওয়া, আর কি তারা দাঁড়ায় সেখানে? পড়িমরি করে তারা গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে। আর তক্ষুণি গিয়ে টারজানও হাজির। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না সে। ঘরে ঢুকে কোনদিক দিয়ে তারা পালিয়ে গেছে বুঝতে

না বুঝতেই সে দেখে দুপাশের দুইটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে পড়ল আটকা। রাগে ছুটে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। কিন্তু পাথরের দরজা একটু নড়লও না। তক্ষুণি কানে এল তার দরজার ওপাশ থেকে কে যেন বলছে—নিয়ে এসেছি প্রভু বিদেশী মহিলাকে।

উত্তরে শোনা গেল প্রধান পুরোহিতের গলা—বেশ করেছ। কিন্তু টারজানকে যদি আনতে পারতে।

কথাও শেষ হয়নি তার সেই লোকটি বলে উঠল—এনেছি তো প্রভু! পাশের ঘরে আটকে রেখেছি।

—তাই নাকি? আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল প্রধান পুরোহিত। —তাহলে আগামীকালই তাকে বলি দেবার জন্য দেবতার হাতে তুলে দেব। তিনি নিজেই বলি দেবেন।

—দেবতা বলি দেবেন! অবাক হয়ে টারজান ভাবল, সে কে?

সে ছিল সেই জার্মান সৈন্য। জেনীর কাছে আহত হয়ে সে আর জেনীকে ধরতে যেতে পারেনি। পরে সুস্থ হয়ে সে একা একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বনে। এ অঞ্চলে তো সে অনেকদিনই এসেছে। লেজওয়ালা মানুষগুলিকেও দেখেছে সে। তাদের হাবভাব চালচলন সবই সে জানে। মাঝে দুয়েকদিন দুয়েকজনের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয়নি তাও নয়। মোটামুটি তাদের ভাষাটাও রপ্ত করেছিল সে। তাই একদিন সে ভেবেছিল, এভাবে আর কতই বা ঘুরব? তার চেয়ে এখন কিছুদিন না হয় সাদা লেজওয়ালা মানুষের দেশে দেবতা পরিচয় দিয়ে আরামে থাকি, তারপরে একদিন সুযোগমত তাদেরই কাউকে সঙ্গে নিয়ে বন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব।

তাই সে সুস্থ হয়েই সাদা লেজওয়ালা মানুষের নগরের দরজায় গিয়ে নিজেকে দেবতা পরিচয় দিতেই ছুটে এসেছিল অনেকেই। অবাক হয়ে গিয়েছিল তারা, কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

প্রধান পুরোহিত ছিল মহা ধুরন্ধর। বিশ্বাস করেনি সে-ও। কিন্তু ভেবেছিল, একেই কাজে লাগাতে হবে। আমি প্রধান

পুরোহিত। আমার কথা কে অবিশ্বাস করবে? তাই সে নিজে জার্মান সৈন্যটিকে খাতির করে দেবতা বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সবার কাছে। তাতে পুরোহিতের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল নগরে।

মজাতেই ছিল সৈন্যটি। আর তাছাড়া সে নিজেও ছিল নিষ্ঠুর। পুরোহিতের কথামত সে খুনও করে যাচ্ছিল ক্রীতদাসদের একের পর এক। তাতে সবাই তাকে ভয়ই করত। সে মজা পেত।

এমন সময়েই টারজান ও জেনী পড়েছিল ধরা। আর এদিকে সামন্ত হেরে গিয়েছিল যুদ্ধে। তার সৈন্যরা সব পালিয়ে গিয়েছিল। সে-ও পড়েছিল ধরা।

পুরোহিতের তখন আনন্দ দেখে কে। সে তার পরদিনই সবাইকে বেঁধে নিয়ে গেল মন্দিরে। বিচার আর নেই। বলি হবে সবার। জার্মান সৈন্যটিকে দেবতা সাজিয়ে এর আগেই সে নিয়ে গেছে সেখানে। চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা খোলা চত্বর। সামনে উঁচু বেদী। এই বেদীতেই বলি হবে সবার। দেবতা খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সামনে। তিনি নিজেই বলি দেবেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য।

একটু পরে পুরোহিতরা সবাইকে বেঁধে বেদীর সামনে আনতেই চমকে গেল জার্মান সৈন্য টারজানকে দেখে। দারুণ ভয় করত সে তাকে। তার দাপটে তাকে অনেক দুর্ভোগই পোয়াতে হয়েছিল। তবে বাঁচোয়া, এখন সে কিছু করতে পারবে না। হাত-পা বাঁধা। একটু পরেই বলি দিয়ে দেব তাকে।

চিনেছিল টারজানও। জার্মান সৈন্যটির দিকে তাকিয়ে চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল সে—শয়তান, তুই?

এদিকে প্রধান পুরোহিতের আর তর সয়না। বলে উঠল—প্রভু! মেয়েটিকেও কি এখানে বলি দেবেন?

—না! একে নিয়ে যাও। তার কথা পরে বিবেচনা করব।

বলে জার্মান সৈন্যটি খড়্গ দিয়ে টারজানকে দেখিয়ে বলল—একে আন। একেই প্রথমে বলি দেব।

টারজান বুঝল আর রক্ষে নেই তার। হাত-পা-গুলিও এমন করে বেঁধেছে এরা, যে, নড়বারও উপায় নেই তার। নিজের জন্য সে ভাবে না, কিন্তু জেনীকে উদ্ধার করে যেতে পারল না বলেই তার যত কষ্ট। নীরবে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই তার।

পুরোহিতরা প্রভুর আদেশ পেয়ে ধরাধরি করে টারজানকে এনে শুইয়ে দিল বেদীতে। চোখ বুজে ফেলল টারজান। এর পরে কি হবে সে তো জানেই।

প্রভুও টারজানকে হাতের কাছে পেয়ে উল্লাসে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ে মাথার উপর তুলল খড়্গ। মুহূর্তে কি হয়ে গেল। খড়্গটা সে মাথার উপর তুলতেই দুম করে কোথায় একটা রাইফেলের আওয়াজ হল। 'অ্যাঁক্' করে খড়্গ হাতেই ছিটকে পড়ল প্রভু বেদীর নীচে। পরক্ষণেই আবার 'দুম'। পড়ে গেল প্রধান পুরোহিত। আবার আওয়াজ হল একটা। পড়ে গেল সেই সর্দার। সেও এসেছিল বলি দেখতে।

থতমত খেয়ে গেল সবাই। তাকিয়ে দেখে টারজানের সাদা বন্ধু ও সামন্তের ছেলের সঙ্গে রাইফেল হাতে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কে একজন বিদেশী। দেবতার মত দেখতে।

পাঁচিলের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সামন্তের ছেলে—দেখে যাও সব, বিচার কাকে বলে। স্বয়ং দেবতাই এসেছেন তোমাদের বিচার করতে।

বলেও শেষ করেনি সে প্রধান পুরোহিতের কুচক্রী অনুচর কোত্থেকে ছুটে এসে মাটি থেকে খড়্গ তুলেই ছুটল আবার বেদীর দিকে। টারজানকে বলি দেবে সে। কিন্তু দু'পা-ও যেতে পারল না। আর একটা গুলিতেই ছিটকে পড়ল সে।

ভয় পেয়ে সবাই তক্ষুণি মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করতে লাগল।

পুরোহিতরা পালাতে আরম্ভ করল। কিন্তু কেউই পারল না পালাতে। সামন্তের ছেলের আদেশে তাদের সবাইকে ধরে ফেলল জনসাধারণ।

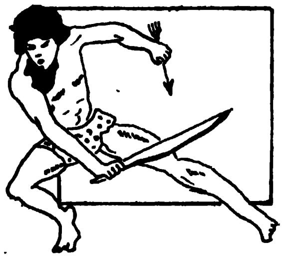
তারপরেই সামন্তের ছেলে ও বিদেশী ছুটে এসে সবার বাঁধন খুলে দিয়ে দাঁড়াতেই টারজান চিনে ফেলল বিদেশীকে। সে তার ছেলে জ্যাকী।

'জ্যাকী'—বলে টারজান ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে। জেনী এসে ছেলের মাথায় হাত রেখে বলল—এতদিন কোথায় ছিলি বাবা?

তারপর আনন্দে মেতে উঠল সবাই। টারজানকে প্রভু বলেই মেনে নিল জনসাধারণ। এখন থেকে মন্দিরে আর রক্তপাত চলবে না, এ আদেশও মেনে নিল তারা।

তারপর টারজান এখানে কিছুদিন থেকে সামন্তকেই এই রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে, তার সাদা ও কালো বন্ধুদের রাজকুমারী ও কালো মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সবাইকে নিয়ে চলল নিজের দেশে।

একটা গ্রীফের পিঠে চড়েই বনটুকু পেরিয়ে গেল তারা। বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে গেল সামন্ত ও তার সাদা ও কালো বন্ধু দুজনেই অনেক সৈন্য নিয়ে এসে বনের সীমান্তে।





ধ্বংস নগরীর রত্ন ও টারজান

টারজানের জীবনটাই যেন কঠোরতায় ভরা। বিপদ প্রতি পদে পদে। ছিল বন্য, হয়েছে সভ্য, হয়েছে সংসারী, তবুও যে কেন বিপদের কাল ছায়া ঘনিয়ে আসে বারবার তার জীবনে; কিছুই বুঝতে পারে না সে। না হলে কঙ্গোর অরণ্য অঞ্চলে খামার বাড়ীতে বেশ চলেছিল জীবন জেনীকে নিয়ে। প্রভাব, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব ছিল না তার। ছেলে তো লণ্ডনেই আছে। কিন্তু হঠাৎ কেন সব তছনছ হয়ে গেল তার ?

বেলজিয়াম সেনাবাহিনীর একজন নির্বাসিত অপরাধী

ল্যাফটন্যান্ট কাঙ্গোর ঘাঁটির এক ক্যাপ্টেনকে হঠাৎ হত্যা করে পালিয়ে যায় বনে। পালিয়ে গিয়েও সে রক্ষা পেল না। পড়ল গিয়ে সেখানকার এক ভয়ঙ্কর আরব দুর্বৃত্তের হাতে। সেনাবাহিনীর যন্ত্রণায় সে তার কাজ কারবার চালাতে পারত না বলে তাদের সে ঘৃণা করত।

ধরা পড়েই সে এক মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলল সেই দুর্বৃত্তকে। সে নাকি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কারণ বেলজিয়াম সৈন্যবাহিনী থেকে তাকে নাকি বিতাড়িত করা হয়েছে। তাকে খুঁজেও বেড়াচ্ছে তারা। তাই বেলজিয়ামরা তার শত্রু। সে একজন সৈনিক। সৈন্য-দলের নিয়ম-কানুন সে ভালই জানে। তাই সে তার দলের হয়ে তার শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়।

—কিন্তু—। দুর্বৃত্ত বলল—তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর ?

—আমার জীবন বাজি। ল্যাফটন্যান্ট তাকিয়ে রইল তার দিকে।

—বেশ। বলে দুর্বৃত্ত দলের সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সেইদিনই সে তাকে দলে নিয়ে নিল।

দিন যায়। দিনে দিনে দুর্বৃত্তের হয়ে লড়াই করে ল্যাফটন্যান্ট তার বিশ্বাসও উৎপাদন করল।

দুর্বৃত্ত খুব খুশি। একদিন সে ল্যাফটন্যান্টকে একা ডেকে বলল—ল্যাফটন্যান্ট, আমি ভাবছি, এখানে লর্ড গ্রেস্টোকের যে বাংলোটা আছে সেখানে গিয়ে লুণ্ঠন করে আসি।

—কেন ? ল্যাফটন্যান্ট যেন আঁতকে উঠল। কারণ লর্ড গ্রেস্টোক বা টারজানকে এখানে কে না জানে। অত্যন্ত শক্তিশালী। আদিবাসী যোদ্ধা তো আছেই, বনের পশু পর্যন্ত তার কথা শোনে। বলতে গেলে এখানকার অভিবাবকই যেন সে। অত্যন্ত প্রভাবশালী সরকারের দপ্তরেও।

—কেন কি হে ? হা হা করে হেসে উঠল দুর্বৃত্ত।—তার দাপটে তো কাজ কারবার প্রায় লাটেই উঠল। একে একটা শিক্ষা না দিলে

তো আর চলছে না। কয়দিন আগে তুমি গিয়ে সুলুক-সন্ধান জেনে আমাকে খবর দিলেই আমি দলবল নিয়ে যাব। আপত্তি আছে? যেন ধমকে উঠল দুর্বৃত্ত।

—না, আপত্তি কিসের—। মাথা চুলকে ল্যাফটন্যাণ্ট বলল—তবে—।

—তবে? জিজ্ঞেস করল দুর্বৃত্ত।

—তবে ভাবছিলাম, আমার বখশিষ।

হা হা করে হেসে উঠল দুর্বৃত্ত। বলল—পাবে, পাবে। মোটা বখশিষই পাবে তুমি।

তারপর একদিন ল্যাফটন্যাণ্ট কয়েকজন অনুচর নিয়ে একজন পথ-হারানো শিকারী পরিচয় দিয়ে টারজানের বাংলোতে গিয়ে উঠল।

টারজান এসব ভ্রুক্ষেপই করে না। বলল—ঠিক আছে। কয়েকদিন থেকে তুমি বিশ্রাম কর। তারপর আমার অনুচর গিয়েই পথ দেখিয়ে দেবে তোমায়।

দিন যায়। ল্যাফটন্যাণ্ট কোন ব্যবস্থাই করতে পারে না। এমন সময় একদিন রাত্রিতে সে শুনল, টারজান তার স্ত্রীকে বলছে—জেনী, টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গেছে। আমি ভাবছি, ধ্বংস নগরী থেকে আবার কিছু সোনাদানা নিয়ে আসি গিয়ে। কালই যাব।

—না, না টারজান। জেনী যেন আঁতকে উঠল। বলল—না টারজান, আর যেও না তুমি। বড় বিপদ ধ্বংস নগরীতে।

টারজান হেসে বলল—না জেনী, মিথ্যে ভাবছ তুমি। পথঘাট সবই আমার চেনা। কিছু হবে না আমার। যাব আর আসব। পঞ্চাশজন যোদ্ধা নিয়ে যাব। ল্যাফটন্যাণ্ট শুনে ভাবল, ও এই কথা। ধ্বংস নগরী থেকে সোনাদানা পাও? কিন্তু ধ্বংস নগরীটা কোথায়?

যাহোক সেদিন রাত্রিতে সে ঠিক করে ফেলল, সে টারজানকে অনুসরণ করেই যাবে, একা। আর দুর্বৃত্তকে সব জানিয়ে একটা চিঠি লিখে একজন অনুচর পাঠিয়ে দেবে।

কাজেও সে করল তাই। তার পরদিন টারজান পঞ্চাশজন আদিবাসী যোদ্ধা নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর সেও বেরিয়ে পড়ল কয়েকজন অনুচর নিয়ে সান্ত্রীদের ধাপ্পা দিয়ে। একটা চিঠি লিখে একজন অনুচর পাঠিয়ে দিয়ে নিজে অনুসরণ করে চলল টারজানকে।

একটুখানি পথ তো নয়! অনেক দিনের পথ। টারজানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মুস্কিল। তবু চলতেই হল তাকে। ভয়ও আছে, কেউ না দেখে ফেলে।

টারজানের তো পথঘাট সবই চেনা। কোন কষ্টই হয়নি তার। চড়াই, উৎরাই ভেঙ্গে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে লতা বেয়ে তরতর করে ঠিক উঠে গেল সে ধ্বংস নগরীর প্রাচীরের সামনে। তারপর প্রাচারের একটা সুড়ঙ্গ পথে ঢুকেও গেল নগরীতে। ল্যাফট-স্যাণ্টও উঠে এসেছিল ঠিক, কিন্তু পরিশ্রান্ত হয়ে ঠিক তক্ষুণি সে ভরসা পেল না নগরীতে ঢুকতে। অনুচরদের সে নিয়ে এসেছিল বটে, তবে তারা যে পথে কখন হারিয়ে গেছে সে নিজেও জানে না

এদিকে ধরা পড়ার ভয়। একটা ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে থেকে ভাবল, নাঃ, আর কিছুক্ষণ যাক। টারজান যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে!

সত্যিই তাই। হঠাৎ টারজান দুই হাতে দুই তাল সোনা নিয়ে বেরিয়ে এসে তার পঞ্চাশজন অনুচরকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে সেই পঞ্চাশজনও এক একজন দুই হাতে দুই তাল সোনা নিয়ে বেরিয়ে এসে নিচে নেমে গেল। কিন্তু টারজান বেরিয়ে এল না।

এত সোনা একসঙ্গে দেখে ল্যাফটস্যাণ্ট যেন আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না। ভয় ডর সব চলে গেল তার। সে তক্ষুণি চট করে ঢুকে পড়ল সেই সুড়ঙ্গ পথে। কোথায় যে যাচ্ছে সে কিছুই জানে না। এ গলি, ও গলি করে সে ঠিক পেয়ে গেল সেই স্বর্ণভাণ্ডার। টারজান সেখানে নেই। তারপর তার কি উল্লাস।

এদিকে টারজান তার প্রয়োজনমত সোনা নিয়ে চলে গিয়েছিল অন্যদিকে। ভাবছিল সে অতীতের কথা। এখানেই তো প্রধানা পুজারিণী তাকে থাকতে বলেছিল। এসব ভারতে ভাবতেই সে একটু পরে ফিরে আসছিল সুড়ঙ্গ পথের দিকে। ঠিক এই সময়ই হঠাৎ বিরাট আওয়াজ করে হুড়মুড় করে পড়তে লাগল পাথরের চাঁই দেয়াল থেকে। মাটিটাও যেন কাঁপছে। ঠিক বুঝতে না বুঝতেই হঠাৎ একটা পাথর ছুটে এসে তার মাথায় পড়তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে অজ্ঞান হয়ে।

স্বর্ণভাণ্ডারে ল্যাফটন্যান্টের অবস্থাও তথৈবচ। তবে সে আটকা পড়েনি ঘরে, আঘাতও পায়নি কোথাও। ভয়ে দিশাহারা হয়ে সোনার আশা ত্যাগ করেই সে পাগলের মত বেরিয়ে এল পালাবার জন্য। কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ। পাথরের স্তুপে পথ বন্ধ, টারজান পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। সে আর ভাবতে পারল না কিছু। হঠাৎ উল্টোদিকে ছুটে চলে গেল সে—যদি একটা পথ পাওয়া যায়।

সে পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল বলি উৎসর্গের ঘরে। আর তক্ষুণি সে পড়ল ধরা অর্দ্ধেক গরিলা অর্দ্ধেক মানুষ পূজারীদের হাতে। তাদের চেহারা দেখেই তো তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল সে। কিন্তু তাতে কি আর পূজারীদলের মন ভেজে? তারা তাকে ততক্ষণে পিছমোড়া করে বেঁধে বেদীতে নিয়ে ফেলেছে। ডেকে নিয়ে এসেছে ছুরিহাতে প্রধানা পুজারিণীকে এদিকে টারজানের ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু কিছুই সে বুঝতে পারল না। কোথায় সে এসেছে? কেন? সেই—বা কে? কিছুই মনে নেই তার। স্মৃতিভ্রংশ টারজান ক্যালক্যাল করে স্তুপ স্তুপ পাথরের দিকে তাকিয়ে উঠে হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘরে ঢুকে দেখে অনেকগুলি জালা ঢাকনা দেওয়া। সে তাড়াতাড়ি একটা জালার ঢাকনা খুলে দেখে জালা ভর্তি রঙবেরঙের পাথর। ভারী মজা লাগল তার। একটা থলে ছিল তার কোমড়ে। কি মনে করে থলে

ভর্তি করে অনেক পাথর নিয়ে বেরিয়ে এসেই সে শুনতে পেল কারা যেন চিৎকার করে গরিলা ভাষায় কথা বলছে। কেমন যেন চেনা কথাগুলি। সেও তক্ষুণি গরিলা ভাষায় কি এক চিৎকার করে সেদিকে ছুটে গিয়েই পড়ল বলির ঘরে। আর তক্ষুণি। চারদিক থেকে পূজারীর দল উঠল চিৎকার করে—এটাকেও ধর।

তড়াক করে রক্ত উঠে গেল টারজানের মাথায়।—কি? আমাকে ধরবি? তবে এই দেখ। বলেই সে এক লাফে একটা পূজারীর হাত থেকে তার খড়্গ নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটল তাদের মাঝে। ধরা-ধবর কচুকাটা হয়ে পড়ে গেল কয়টা তক্ষুণি। ততক্ষণে টারজান প্রায় পাগল হয়ে গেছে—আমায় ধরবি, আয়, আয়—। বলে আবার ছুটল সে আর কয়টাকে লক্ষ্য করে। পড়ে গেল কয়টা। তারপরে পূজারীদের মধ্যে লাগল ত্রাস। পালাতে পারলে বাঁচে। 'ধর ধর' বলে টারজান তারপর সব কটাকে তাড়িয়ে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে গিয়ে উঠল বেদীর উপরে। সামনে পূজারিণী ছুরি হাতে।

পূজারিণী তাকে দেখেই চিনেছিল। তাকে তো এখানেই রেখে দিতে চেয়েছিল সে। বলল—টারজান, তুমি এসেছ?

—টারজান? কে টারজান? স্মৃতিভ্রংশ টারজান তাকে চিনতেই পারল না। হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান।—শয়তানী, এই লোকটাকে বলি দিতে নিয়ে এসেছ? বলেই সে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে ল্যাফটন্যাণ্টের হাতে পায়ের বাঁধন কেটে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল।

ছুট, ছুট, ছুট,। ছুটতে ছুটতে এঘর ওঘর, এ বারান্দা, ও গলি পেরিয়ে ল্যাফটন্যাণ্টকে হাতে ধরে প্রাচীল টপকে একেবারে বনে। খাঁড়াটা কিন্তু তখনও হাতেই আছে টারজানের। বনের একজায়গায় এসে ল্যাফটন্যাণ্টের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—বস। খাঁড়াটা রেখে দিল পাশে।

বাঁচল ল্যাফটন্যাণ্ট। পরিশ্রমে সে আর নড়তে পারছে না

যেন। ধপ করে বসে ফ্যালফ্যাল করে সে টারজানের দিকে তাকিয়ে



ভাবতে লাগল—তবে কি টারজান আমাকে চিনতে পারেনি?

স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে তার আঘাতে ? টারজানের হাব-ভাবেও তার মনে হল তাই। টারজান তাকে চিনতে পারেনি। একটু আশ্বস্ত হয়ে গুছিয়ে বসে ভাবতে লাগল ল্যাফটন্যাণ্ট, এখন কি করি ? এমন সময় হঠাৎ সে দেখে টারজান আপনমনে কোমড় থেকে একটা থলে বার করে উপুড় করে দিল মাটির উপর। ছড়িয়ে পড়ল রঙবেরঙের পাথর।

এগুলি দেখেই তো ল্যাফটন্যাণ্টের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। —আরেব্বাস ! হীরা, মাণিক সব ! চিৎকার করে উঠল সে— কোথায় পেলে ? দেখি, দেখি। বলে একলাফে কাছে আসতেই হুঙ্কার দিয়ে হামলে উঠল টারজান—খবরদার !

একলাফে ছিটকে সরে গেল ল্যাফটন্যাণ্ট।

—এক পা এগিয়েছ কি শেষ করে ফেলব। বলে তাড়াতাড়ি পাথরগুলি থলেতে ভরে ফেলল টারজান।—এগুলি সব আমার। রঙবেরঙের পাথর।

ল্যাফটন্যাণ্ট বুঝল এগুলির মূল্যও টারজান জানে না। ভাবতে লাগল, এগুলি হাতাতেই হবে। কিন্তু কি করে ? বনের কোথায় যে আছি তাই তো জানি না। ফিরবই বা কি করে ?

ঠিক এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে টারজানেরই যোদ্ধার দল সোনা হাতে আসছে দেখে টারজান এক টানে ল্যাফটন্যাণ্টকে একটা ঝোপে নিয়ে ফিসফিস করে বলল—লোকগুলি ভাল না। শত্রু, সব শত্রু। তাদের শেষ করতে হবে। চুপিচুপি এস। বলে সে তাকে নিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

শাপে বর হয়ে গেল ল্যাফটন্যাণ্টের। সে ভাবল এই যোদ্ধার দল তো বাংলোর দিকেই যাচ্ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে যদি বাংলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, তবে সেখান থেকে দুর্বৃত্তের শিবিরে যাওয়ার কষ্ট হবে না। কিন্তু তার আগে পাথরগুলি তো নিতে হবে। ভাবতে ভাবতেই সে চলল টারজানের সঙ্গে চুপিচুপি।

বাংলোর দিকে তো চলেছে তারা; কিন্তু বাংলোতে যে কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে তা তো আর তারা জানে না।

ল্যাফটন্যাণ্টের চিঠি পেয়ে দুদিন পরেই সেই আরব দস্যু তার দলবল নিয়ে এসে লুণ্ঠন তো করেছেই, বাংলোতে আগুন লাগিয়ে টারজানের স্ত্রীকে ধরে নিয়ে চলে গেছে বিক্রীর জন্য। বাংলোতে তখন যোদ্ধা বেশি ছিল না। দস্যুদের রাইফেলের গুলির সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি। দস্যুরা তাদের স্ত্রীদেরও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হতাহত হয়েছে বহু যোদ্ধা। তাদের মধ্যে একজন আহত প্রভুভক্ত যোদ্ধা প্রতিশোধস্পৃহায় ছুটে গেছে তাদের অনুসরণ করে। একা যে সে কি করবে কিছুই জানে না সে। তবুও সে মরীয়া। প্রভুপত্নীকে উদ্ধার করতেই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই টারজানের যোদ্ধারা এসে পৌঁছাল বাংলোর সামনে। কিন্তু বাংলো কোথায়? তারা তো থ। একি! কে করলে এই সর্বনাশ? বাংলোর ধ্বংসাবশেষটুকু দাঁড়িয়ে আছে শুধু! যে কয়জন তখনও ছিল সেখানে তাদের কাছে সব শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সব যোদ্ধা।—কি এতবড় আস্পর্দা এই আরব দস্যুটার? রাগে ফেটে পড়ল সব। তাড়াতাড়ি একটা গর্ত খুঁড়ে সব সোনা লুকিয়ে তারা ঠিক করল আজকের দিনটা বিশ্রাম করেই তারা গিয়ে ধরবে দস্যুটাকে।

ল্যাফটন্যাণ্টও কিন্তু এতটা আশা করেনি। কিন্তু যোদ্ধাদের হাবভাব দেখে তারও ভয় লেগে গেল। সর্বনাশ, আদিবাসী যোদ্ধা এরা। আরবটাকে না শেষ করে এরা ছাড়বে না। তক্ষুণি যদি সে গিয়ে তাকে খবর দিতে পারে তবে হয়ত বেঁচও যেতে পারে সে। কিন্তু টারজানের থলেটা—! ভাবল, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আজ রাত্তিরেই এটা হাতিয়ে সরে পড়বে সে টারজান ঘুমোলে।

টারজানের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কিছু। তার বাংলো, স্ত্রীর কথা কিছুই মনে নেই তার। একটু রাত্রি হতেই সে দুপুরে শিকার করা

একটা হরিণের খানিকটা কাঁচা মাংস খেয়ে তাকিয়ে রইল সে ল্যাকটান্যান্টের দিকে। ল্যাকটন্যান্ট ঘুমোচ্ছে দেখে সে চুপিচুপি উঠে একটা গর্ত খুঁড়ে থলেটা লুকিয়ে রেখে পাশে শুয়ে পড়ল তার। আর পড়েই ঘুম।

ল্যাকটন্যান্ট কিন্তু এতক্ষণ ঘুমোয়নি। মটকা মেরে পড়েছিল শুধু। থলের চিন্তায় কি তার ঘুম আসে? সব দেখেছিল সে। এরপর আর কি সে এখানে দাঁড়ায়? চটপট উঠে গর্ত খুঁড়ে থলেটা নিয়ে ছুটে সে চলে গেল বনে সেই রাত্রিতেই।

তার পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে আদিবাসী যোদ্ধা বা ল্যাকটন্যান্ট কাউকে দেখতে না পেয়েও টারজানের কোন ভাবান্তর হল না। যোদ্ধাদের প্রতি তার প্রতিশোধ স্পৃহাও আর ছিল না। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে সে চলে গেল বনে। আর গিয়েই পড়ল সে সেই ধ্বংস নগরীর পূজারীদের হাতে। তারা তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিল। প্রধানা পূজারিণীই তাদের নিয়ে এসেছিল এখানে। এত আচমকা তারা টারজানকে ঘিরে ধরে বেঁধে ফেলেছিল যে টারজান বুঝতেই পারেনি।

তখন প্রধানা পূজারিণী তার হাতের ছুরিটা দোলাতে দোলাতে টারজানকে বলল—কি টারজান, আসবে আমার সাথে, না মরবে?

—চুলোয় যাও তুমি। হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান।

—বেশ। পূজারিণী হেসে বলল—তাহলে তৈরী হও বলির জন্য। বলেই সে সবাইকে ডেকে বলল—এসো তোমরা।

বলেও শেষ করতে পারেনি সে···,কোত্থেকে একটা পাগলা হাতি ছুটে এল সব তছনছ করতে করতে। পালাল পূজারীর দল। হতভম্ব পূজারিণী।

টারজান তখন হেসে বলল—কি? হাতিটা তোমায় বাঁচাবে? বলেই সে চিৎকার করে বলল—যদি বাঁচতে চাও আমার বাঁধন কেটে দাও।

বাঁচতে কে না চায়! পূজারিণী চটপট তার বাঁধন কেটে দিতেই একটা হুঙ্কার দিয়ে টারজান তাকে কাঁধে তুলে গাছে উঠে গেল। চলে গেল হাতিটা।

পূজারিণী বাঁচল বটে, কিন্তু ভয়ে জড়সড় হয়ে সে টারজানকে বলল—টারজান, তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি বলে পূজারীর দল হত্যা করবে টারজান।

—কি? এতবড় আস্পর্দা। বলেই একটা হুঙ্কার দিয়ে টারজান পূজারিণীকে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পূজারীদের ডেকে বলল—শোন তোমরা, আমি না বাঁচালে তোমাদের রাণী বাঁচত না। তাকে নিয়ে চলে যাও। মনে রেখ, তার উপর যদি কোন অত্যাচার হয়, বনের পশুদের নিয়ে আমি তোমাদের শেষ করে আসব। একটিও বাঁচবে না তোমরা। সে তোমাদের রাণীই থাকবে। কিছুদিন পরেই আমি আবার গিয়ে দেখে আসব। যাও।

একটা কথাও বলতে পারল না এরা। টারজানের কথায় রাজী হয়ে পূজারিণীকে নিয়ে মাথা নীচু করেই চলে গেল তারা।

তারা চলে যেতে টারজানও চলে এল তার নিজের জায়গায়, যেখানে সে পাথরগুলি লুকিয়ে রেখেছিল। একসময় ইচ্ছে হতে সে থলেটা তুলতে গিয়ে দেখে গর্ত ফাঁকা।—কি? রেগে গেল টারজান। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যখন পেল না তখন মনে হল, তবে তো ল্যাফটন্যান্টই নিয়েছে সেটা। যাহাতক মনে হওয়া, তক্ষুণি সে ছুটল ল্যাফটন্যান্টের খোঁজে।—হতভাগা, হতভাগাকে খুনই করে ফেলব আমি। আমার পাথর চুরি!

ছোটবেলা থেকেই বনে থেকে থেকে টারজানের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল খুব প্রবল। সে সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল ল্যাফটন্যান্টের খোঁজে।

এদিকে সেই আদিবাসী যোদ্ধা কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে ঠিক এসে পড়েছে ছুব্‌ত্তের শিবিরের কাছে। দিনের বেলা একা শিবির

থেকে প্রভুপত্নীকে উদ্ধার করতে পারবে না ভেবে রাত্রির অপেক্ষায় সে একটা গাছে উঠে লুকিয়েছিল। এমন সময় ল্যাফটন্যান্টকে এই শিবিরে ঢুকতে দেখে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল যোদ্ধা।—তবে তুই-ই বিশ্বাসঘাতক, সব সর্বনাশের মূল? কিন্তু দিনের বেলায় কি করবে সে? মনের রাগ মনে রেখেই চুপচাপ বসে থাকতে হল তার।

ল্যাফটন্যান্ট শিবিরে ঢুকতেই দুর্বৃত্ত একগাল হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—এস, এস। কিন্তু সোনাগুলি কোথায়?

—আছে, আছে। সব আছে। বলে সে তাকে সোনাগুলির সব হদিশ দিয়ে বিশ্রাম করতে চলে গেল।

শত হলেও আরবটা তো দস্যুই। এত সহজে কি সে বিশ্বাস করে? তখন কিছু না বললেও ঠিক লক্ষ্য রাখল সে ল্যাফটন্যাণ্টের উপর। এক সময় তার হীরে-মাণিকের থলেটাও দেখে ফেলল সে। ল্যাফটন্যান্টও কম নয়। সেও বুঝল যে ধরা পড়ে গেছে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হতে ল্যাফটন্যান্ট চুপি চুপি পালিয়ে গেল শিবির থেকে। ইচ্ছে ছিল তার টারজানের স্ত্রী জেনীকে নিয়ে সে পালাবে। কিন্তু হল না। জেনী যে কখন পালিয়ে গেছে শিবির থেকে তারা কেউ জানতেই পারেনি। অবাক হয়ে সে ভাববারও সময় পেল না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সে তক্ষুণি ছুটে পালাল বনে।

কিন্তু পালাবে কোথায়? দস্যুও টের পেয়ে তক্ষুণি চারিদিকে চর পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে ধরবে বলে। নিজেও বেরিয়ে পড়েছে একটা ঘোড়া নিয়ে।

ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। ল্যাফটন্যান্টও ছুটতে ছুটতে গিয়ে পড়ল এক সিংহের মুখে। সিংহ করল তাড়া। সে তখন পড়িমরি করে কোনমতে একটা গাছে উঠেছে কি উঠেনি, দস্যুর এক অনুচর ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে উপস্থিত। সিংহটা তৎক্ষণাৎ নতুন শিকারের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। ল্যাফটন্যান্ট সৈনিক। উপস্থিত

বুদ্ধি সে হারায় নি। সেও তক্ষুণি গাছ থেকে ফাঁকা ঘোড়াটার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে দে ছুট।

এদিকে ল্যাফটন্যান্টের খোঁজে দস্যুরা সব শিবির থেকে চলে যেতে আদিবাসী যোদ্ধাটি নেমে এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল শিবিরটি। কিন্তু কোথাও প্রভু পত্নীকে না পেয়ে সে 'লেডী, লেডী' করে চিৎকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বনে বনে।

এমন সময় টারজানও ফিরছিল শিবির থেকেই। পায়নি ল্যাফটন্যান্টকে। কিন্তু একটা অন্য চেনা গন্ধ যেন উতলা করে দিয়েছিল তাকে। তাই সে তাকে ও ল্যাফটন্যান্টকে খুঁজতে খুঁজতেই দেখতে পায় যোদ্ধাটিকে। কিন্তু সে চিনতেই পারে না তাকে। যোদ্ধাটি চলে যায় ছুটতে ছুটতে।

কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ। খানিক দূর গিয়েই সে ধরা পড়ে যায় আবিসিনীয় সম্রাটের সৈন্যদলের হাতে। বনের দুর্বৃত্তকে ধরতেই সম্রাট পাঠিয়েছিলেন সৈন্যদল। একটু আগে ল্যাফটন্যান্ট ধরা পড়েছিল তাদের হাতে। তাকে নিয়েই ফিরে চলেছিল তারা। এমন সময় যোদ্ধাটি পড়ে ধরা।

যোদ্ধাটি ল্যাফটন্যান্টকে দেখেই তো চাপা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল—শয়তান। এবার তোকে বাগে পেয়েছি। দেখি সুযোগ মত তোকে কিছু করতে পারি কিনা। পেয়েও গিয়েছিল সে সুযোগ তার পরদিন। তবে সান্ত্রীর আওতায় তাকে মারতে পারেনি সে। নিজের নিরাপত্তাও তো চাই। ল্যাফটন্যান্টের চামড়ার থলির পাথরগুলি ঢেলে নিয়ে তাতে পাথর ভরে পালিয়ে গিয়েছিল; জানতেও পারেনি ল্যাফটন্যান্ট। সৈন্যদলও অবশ্য খুব একটা মাথা ঘামায়নি তার পালানো নিয়ে। তবে ল্যাফট-ন্যান্টকে তারা ছাড়ল না।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সব জায়গাতেই আছে। ল্যাফটন্যান্ট নিজেও তো একজন বিশ্বাসঘাতক। তাই সে সেনাপতিকেও পেয়ে

গেল তার দলে। টারজানের বাড়ীর সামনে সেই লুকোনো সোনার হদিশ দিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে সেনাপতি তার সৈন্যদল নিয়ে ছুটে গেল তারপর দিনই।

এদিকে জেনী পালিয়ে গিয়েও রক্ষা পেল না। আবার সে ধরা পড়েছিল দস্যু সর্দারের হাতে। ল্যাফটন্যান্টকে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে আসছিল সে তখনই সে পেয়ে যায় জেনীকে।

এমন সময় কতগুলি গরিলা নিয়ে টারজানও এসে পড়েছিল সেই চেনা গন্ধ লক্ষ্য করে। কিন্তু কাছেই ঘেঁষতে পারেনি সে। মুহুর্মুহু গুলি করে টারজান ও গরিলাদলকে আহত করে জেনীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল দুর্বৃত্ত।

গুলি খেয়ে টারজানের রোখ বেড়ে গিয়েছিল আরও। তক্ষুণি উঠে চলে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণায় উঠতেই পারল না। সারাটা দিনই কেটে গেল তার। তারপর অনেক রাত্রিতেই গিয়ে হানা দিয়েছিল দুর্বৃত্তের শিবিরে গরিলাদের নিয়ে। তাকে পেলে ছিঁড়ে ফেলবে সে। কিন্তু কোথাও পেল না সে তাকে। তখনই মনে পড়ল তার মেয়েটার কথা। চেনা গন্ধটাও পাচ্ছে যেন। সে তক্ষুণি ছুঁটে গেল মেয়েটির সন্ধানে। কিন্তু পেল না তাকেও। তবে একটা গরিলার গন্ধ সে পেল ঘরটাতে। সামনে দুইজন প্রহরী মুর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। তক্ষুণি সে বুঝল তার দলের একটা গরিলাই তাকে নিয়ে চলে গেছে। রাগে জ্বলে উঠল সে। এতবড় আস্পর্দা গরিলাটার? তক্ষুণি সে ছুটল গরিলাটার সন্ধানে.

শত হলেও সে তো মানুষ। এতবড় জঙ্গল, কোথায় খুঁজবে টারজান? তবুও খোঁজার তার বিরাম নেই। কিন্তু কোথাও পেল না জেনীকে। তাছাড়া হঠাৎ এক দমকা বাতাসে চেনা গন্ধটাও ফেলেছিল হারিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে তার বাংলোর কাছে এসেই মনে হল সেই সোনাগুলির কথা। আরে! দেখি তো সোনাগুলি। কিন্তু সে ছুটে গিয়ে গর্তটা ফাঁকা দেখেই রেগে জ্বলে উঠেছিল। যাকে

এসে লেগেছিল অনেক লোকের গন্ধ। তক্ষুণি সে 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করে ছুটল বনে। জেনীর কথা তখন তার মনেই নেই। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই গুলির আওয়াজে থমকে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখে, কতগুলি লোক যুদ্ধে মেতে উঠেছে। হতাহত হয়ে পড়ে গেল অনেক। আহত অনেক পালিয়ে গেল মুহূর্তে। তার মধ্যে হঠাৎ দুটি লোক ছুটল একদিকে ঘোড়ায় করে। এরা কারা? ভাবতে ভাবতেই যেতে লাগল টারজান। কিন্তু হঠাৎ কতগুলি নিগ্রো যোদ্ধা দেখে লুকিয়ে পড়ল গাছে। তারা যে তারই যোদ্ধার দল সে কথা তো তার মনেই নেই। তারা চলে যেতেই সে আবার ছুটল চোর ধরতে। ঐ লোক দুটিই কি চোর? বারুদের গন্ধে সে ঠিক করতে পারছিল না কিছু। তবুও ছুটল সে।

আসলে ঐ লোক দুটি ছিল সেই দুর্বৃত্ত ও ল্যাফটন্যাণ্ট। আবেসিনীয় সম্রাটের সৈন্যদলকে নিয়ে ল্যাফটন্যাণ্ট যখন সব সোনা তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই এসে পড়েছিল সেই দুর্বৃত্ত। ল্যাফটন্যাণ্টকে দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল সব। আর তারপরেই লেগেছিল যুদ্ধ। এক ফাঁকে দুর্বৃত্ত ল্যাফটন্যাণ্টকে তাড়া করে ছুটে যায়। দুর্বৃত্তদলই জিতে গিয়েছিল যুদ্ধে। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি টারজানের যোদ্ধারা এসে পড়েছিল বলে পালিয়ে যায় তারাও। সোনা নিতে পারেনি!

দুর্বৃত্ত ও ল্যাফটন্যাণ্ট কেউ কারো থেকে কম যায় না। দুজনেই দুজনকে গুলি করতে করতে যাচ্ছিল এগিয়ে। এক সময় দুটি ঘোড়াই গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়াতে দুজনেই লাফ দিয়ে গাছের আড়াল থেকে চালাচ্ছিল গুলি। ল্যাফটন্যাণ্ট বেগতিক বুঝে একসময় তার থলেটাও ছুঁড়ে দিয়েছিল দুর্বৃত্তকে। কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। থলেটাতে পাথর দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে একপা এগিয়ে যেতেই ল্যাফটন্যাণ্টের একটা গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর উঠে না। বিপন্মুক্ত ল্যাফটন্যাণ্ট তক্ষুণি ছুটে গিয়ে থলেটা খুঁজতে থাকে, কিন্তু পায় না।

ঠিক এমন সময় জেনী এসে তাকে অভিনন্দন জানাতেই বিস্মিত ল্যাফটন্যাণ্ট বলল—আপনি এখানে ?

—হ্যাঁ। এখানেই তো ছিলাম। গাছের ওপরে। কাল রাত্তিরে একটা গরিলা আমাকে চুরি করে নিয়ে আসে। তখন আমি মুর্ছিত। জ্ঞান ফিরতেই ভোরবেলা দেখি একটা সিংহ গরিলাটাকে খেয়ে ফেলেছে। আমি গাছের ওপর ছিলাম বলে আমাকে ধরেনি। কিছুক্ষণ পরেই দেখি আপনারা তুজন। ভাবছিলাম, আপনি যদি জিততে পারেন তবে আমার মুক্তির উপায় হবে। আপনি তো আমাদের বাংলোটা চেনেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কথা কটি বলল বটে ল্যাফটন্যাণ্ট, কিন্তু ততক্ষণে সে তার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে। মহিলাটি যখন নিজে থেকেই ধরা দিলেন তখন সব গেলেও মন্দের ভাল—একে নিয়েই চলে যাব। এখন তাকে নিয়ে শিবিরে রাখব। তুর্বৃত্ত তো আর নেই। ভয় নেই আর।

কিন্তু সে জানে না, তুর্বৃত্ত নেই বটে, কিন্তু তার সাগরেদ আছে। সাগরেদ তাকে একা দেখেই বুঝেছিল তুর্বৃত্ত আর কোনদিনই আসবে না। তাই সে ল্যাফটন্যাণ্টকে গোপনে ডেকে বলল—মহিলাটিকে যখন পেয়েছ তখন তাকে বিক্রী করে টাকাটা তুজনেই নেব। ভাল হবে না ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলে ল্যাফটন্যাণ্ট তখনকার মত চলে গেল শিবিরে। কিন্তু বুঝল সাগরেদের যখন চোখ পড়েছে তখন সে ছাড়বে না।

ছাড়ল না ঠিকই। সেদিন রাত্তিরে সে একাই গিয়ে উঠল জেনীর শিবিরে। একাই যদি পেয়ে যায় তাকে তবে ভাগ দিতে যাবে কেন সে ?

কিন্তু ল্যাফটন্যাণ্টও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও চুপিচুপি গিয়ে সাগরেদকে দেখেই করল গুলি। গুলির শব্দে প্রহরীরা এলে তাদের

উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে বিদেয় করল। তারপর সেই রাত্তিরেই জেনীকে গোপনে জঙ্গলে নিয়ে একটা মোটা গাছে তুলে দিয়ে সে বলল—আজ রাত্তিরটা কষ্ট করে থাকুন গাছে। কাল ভোরে এসে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু নিয়ে আর যাওয়া হল না তার। জেনী পড়ল বিপদে। তার পরদিনই সে আবিসিনীয় সৈন্যদলের হাতে পড়ল ধরা। দুর্বৃত্তের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে তারা ফিরে যাচ্ছিল। তখনই সে তাদের হাতে পড়ল ধরা। তারাও ভাবল, কিছু না পেলেও মেয়েটিকে যখন পেয়েছি তখন তাকেই নিয়ে না হয় সম্রাটের কাছে ভেট দেব। তাতে হয়ত শাস্তির হাত থেকে বেঁচেও যেতে পারি।

তার পরদিন ঘোড়া নিয়েই এসেছিল ল্যাফটন্যান্ট। কিন্তু তাকে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে ভাবল, তবে কি মেয়েটি আবার গরিলার হাতে পড়েছে? কেমন যেন মায়াও হল তার মেয়েটির জন্য। তাকে তো বিপদে আমিই ফেলেছি। আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে লাগল সে মেয়েটিকে। কিন্তু তারই দুর্ভাগ্য, হঠাৎ এক গাছ থেকে টারজান লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। ছিটকে পড়ে গেল সে ঘোড়া থেকে। টারজানও লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরল তার গলা।—শয়তান,এখন—!

মুখ চোখ লাল হয়ে গেল ল্যাফটন্যান্টের টারজানের হাতের চাপে। অতিকষ্টে সে বলল—করেন কি, করেন কি লর্ড গ্রেস্টোক?

—লর্ড গ্রেস্টোক! টারজান যেন স্তম্ভিত, বিস্মিত হয়ে গেল। বলল—গ্রেস্টোক! কে গ্রেস্টোক?

—কেন আপনি! হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ল্যাফটন্যান্ট।

—আমি? বলেই কেমন যেন হয়ে গেল টারজান। সব মনে পড়ে গেল তার বাংলো, বাড়ীঘর, জেনী, পাথর, সোনা সব। ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক টারজানের হাত ছাড়াতে যেতেই আবার চেপে ধরল টারজান। হুঙ্কার দিয়ে বলল—শয়তান, তুই-ই সব সর্বনাশের মূল। কোথায় রেখেছিস আমার পাথরগুলি, জেনীকে? বল,

বল। না হলে খুনই করে ফেলব তোকে।

—না, আপনি নন। আমরাই দেব তাকে শাস্তি। সে খুনী অপরাধী। বলে এক সরকারী অফিসার হঠাৎ কোথেকে কিছু সৈন্য নিয়ে এসে উপস্থিত টারজানের সামনে।

—কে আপনি ? চলে যান এখান থেকে। বলে টারজান হুঙ্কার দিয়ে উঠতেই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদল তার উপরে। কিছুই করতে পারল না টারজান। তারা তখন দুজনকেই বেঁধে নিয়ে আটকে রাখল শিবিরে।

সৈন্যরা প্রায় সবাই ছিল নিগ্রো। তারা টারজানকে বাঁধল বটে কিন্তু কেমন যেন ভয় করতে লাগল তাদের। কারণ এই লোকটাকে দেখতে তাদের শোনা বনদেবতার মত। সে কথা তারা তাদের অফিসারকেও বলেও ছিল। কিন্তু তিনি তাদের কুসংস্কার বলে কানেও নেননি সেকথা।

বন্দী হয়ে ল্যাফটন্যান্টের সব রাগ গিয়ে পড়ল টারজানের উপর। বলল—স্যার, আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেরও বিপদ ডেকে আনলেন। অথচ আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন জানি না, তবে তাকে কোথায় রেখে এসেছিলাম দেখিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

টারজান বলল—কেন ? মুক্ত আমি তোমাকে করব। এখন সন্ধে। আর একটু রাত্রি হোক।

—কি করে স্যার ? ল্যাফটন্যান্ট যেন লাফিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু তার হাতা-পা বাঁধা। গড়িয়ে গড়িয়ে একটু এগিয়ে এল টারজানের কাছে।

—যেভাবেই হোক। টারজান বলল।

তারপর সত্যিই রাত একটু গভীর হতেই কি এক অদ্ভুত স্বরে টারজান শিষ দিয়ে উঠতেই কতগুলি গরিলা কোথেকে ছুটে এসে তাঁবু ছিঁড়ে তাদের কাঁধে নিয়ে ছুটল অন্ধকারে। নিগ্রো সৈন্যরা ভয়ে

পালিয়ে গেল কোথায়। কিন্তু অফিসার গুলি করতে লাগল রাগে। যে গরিলাটা ল্যাফটন্যাণ্টকে নিয়ে পালাচ্ছিল পড়ে গেল সেই গরিলাটা। টের পেল না অফিসার। ততক্ষণে টারজান অতিকষ্টে নিজের হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এসে তুলে ধরেছে ল্যাফট-ন্যাণ্টকে। ল্যাফটন্যাণ্ট উঠে দাঁড়াতে গিয়েই গরিলার হাতের মুঠিতে পেয়ে গেল সেই থলেটা। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল সে থলেটা টারজানের চোখের আড়ালে। তাকে মুক্ত করেই টারজান বলল—চল, দেখিয়ে দাও কোথায় রেখে এসেছিলে আমার স্ত্রীকে।

—এই অন্ধকারে স্যার?

—হ্যাঁ। এক্ষুণি চল। যেন রেগে গেল টারজান।

—বেশ, চলুন। এদিকে। বলে যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই চলতে লাগল ল্যাফটন্যাণ্ট। টারজান কিন্তু তার হাত ছাড়েনি।

তারপর তারা যেতে যেতে কতদূর গিয়েছিল কেউ জানে না। হঠাৎ কোথায় গুলি ও সিংহের চিৎকার শুনে টারজান থমকে দাঁড়িয়ে বলল—এ কি! কারা যেন বিপদে পড়েছে? আমার স্ত্রী কি ওখানে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হতে পারে স্যার। ল্যাফটন্যাণ্ট তাড়াতাড়ি বলে উঠল। —এক্ষুণি যাওয়া উচিত আপনার।

—ঠিক বলেছ। তবে তুমি দাঁড়াও। আমি আসছি এক্ষুণি। বলে টারজান তক্ষুণি এক লাফে গাছে উঠে ছুটে চলে গেল সেইদিকে।

ল্যাফটন্যাণ্টও তো তাই চায়। টারজান চলে গেলে পালিয়ে যাবে সে। গেলও তাই। টারজান চলে যেতেই ছুটে চলে গেল সে বনের আড়ালে।

এদিকে টারজানের আন্দাজ কিন্তু ঠিক। সেখানে গিয়ে সে পেয়ে গেল জেনীকে।

যে সৈন্যরা তাকে বন্দী করে নিয়ে চলেছিল দেশে, রাত্রি হলে তারা এখানেই শিবির খাটিয়েছিল। কিন্তু তাদের ভাগ্য খারাপ,

গভীর রাত্তিরে কতগুলি সিংহ এসে আক্রমণ করে তাদের। একে তো দুর্বৃত্তের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলই, তাতে এতগুলি সিংহ এসে আক্রমণ করাতে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারা। ভেবেছিল বনদেবতার আক্রোশ তাদের উপর পড়েছে। না হলে এতগুলি সিংহ এসে আক্রমণ করে তাদের? ভয়ে তারা গুলি করবে কি, পালিয়ে বাঁচতেই চেয়েছিল। দুয়েকটা গুলিও অবশ্য করেছিল, কিন্তু বেশীরভাগই চেয়েছিল পালাতে। পালাতে পারেনি সবাই। এতগুলি লোক একসঙ্গে পেয়ে মহানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সিংহ তাদের উপরে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে জেনী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটা ঘোড়ার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময়েই টারজান তাকে দেখতে পায় তাঁবুর পাশের অগ্নিকুণ্ডের আলোয়।

তারপর টারজান কি আর দেরি করে? একছুটে তার পাশে গিয়ে ডাক দেয়—জেনী!

জেনী চমকে তার দিকে তাকিয়ে 'টারজান তুমি' বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে তার বুকে।

তাদের ভাগ্য ভাল সিংহগুলি তখনো দেখেনি তাদের। টারজান তারপরেই জেনীকে কাঁধে তুলে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ে একটা গাছে। তারপর লাফাতে লাফাতে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে নামিয়ে দেয় জেনীকে।

তারপর ভোরবেলায় জেনীর জ্ঞান ফিরতে টারজান ল্যাফটন্যাণ্টকে যেখানে রেখে এসেছিল সেখানে গিয়ে দেখে কেউ নেই। রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান—শয়তান।

বিস্মিত জেনী বলল—কে? কে গো? কাকে বলছ?

—ল্যাফটন্যাণ্ট। শয়তানটাকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম। পালিয়েছে।

—না না। জেনী বলল—ল্যাফটন্যাণ্ট লোকটা ভাল।

—ভাল না ছাই। রেগে গেল টারজান।—সেই তো পুড়িয়েছে বাংলোটা।

—কিন্তু, আমাকে তো বাঁচিয়েছে। জেনী বলল।

—কি জানি জেনীর কথায় অন্যমনস্ক হয়ে গেল টারজান। বলল —হবে হয়ত: মানুষের মধ্যে তো ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। যাকগে চল।

—কোথায়? জেনী বলল।

—কেন? আমার যোদ্ধাদের গাঁয়ে। সেখানেই যাব এখন। বাংলোটা তো পুড়ে গেছে। তারা নিশ্চয় আমাকে ফেলে দেবে না।

ফেলে দেবে কি? তারা তো তাদের প্রভু ও প্রভু পত্নীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। তাদের জন্যই তারা অপেক্ষা করছিল এখানে। ভাবছিল, কিছুদিন বিশ্রাম করে আবার তারা বেরিয়ে পড়বে তাদের খোঁজে। আবিসিনীয় সৈন্যদের ফেলে আসা সব সোনা-দানাই তারা নিয়ে এসেছিল এখানে। প্রভুর হাতে সব তুলে দিল তারা। অনুগত যোদ্ধাটিও ল্যাফটন্যান্টের কাছ থেকে নিয়ে আসা সব হীরা-মাণিক ঢেলে দিল প্রভুর হাতে। হারানো সব ফিরে পেল টারজান।

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সাহায্যে আবার বাংলোটা বানিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল টারজান।

বহুদিন পরে ল্যাফটন্যান্টেরও খোঁজ পেয়েছিল সে। একদিন গভীর জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে একটা কঙ্কালের কোমড়ে তার চামড়ার থলেটা দেখেই সে বুঝেছিল এ ল্যাফটন্যান্ট ছাড়া আর কেউ নয়। বেচারা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল টারজান।



একদিন দুপুরবেলা ঘন জঙ্গলে টারজান তার প্রিয় হাতি বন্ধুর পিঠে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। তন্দ্রায় ঢুলে আসছে চোখ। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে সচকিত হয়ে সে উঠে বসতে না বসতেই হাতি দিল ছুট। গুলিটা লাগেনি তার গায়ে। হতভম্ব টারজান হাতিটাকে থামাতে না থামাতেই হঠাৎ একটা গাছের ডালে মাথা ঠুকে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে পালিয়ে যায় হাতিটা।

গুলি করেছিল দুই আরব শয়তান। দুইজন সহকারী এক আরব

শেখের। লোভী আরব শেখ শিকার করতে আসেনি এই জঙ্গলে, আসেনি হাতির দাঁতের জন্য, এসেছিল ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য। নিজের দেশেই সে শুনেছিল এই জঙ্গলটার কোথায় যেন একটা নগর আছে। সেখানে পাওয়া যায় অঢেল ধনরত্ন, একজন পরমাসুন্দরী মেয়েও নাকি আছে সেখানে। সেগুলিই সে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে দেশে। তাই সে লোকজন নিয়েই এসেছিল। একটু দূরেই তার তাঁবু।

গুলিটা মেরেই হাতিটার পেছন পেছন ছুটে এসেছিল লোকগুলি আবার গুলি করার জন্য। কিন্তু হঠাৎ অচৈতন্য টারজানকে দেখে হতভম্ব হয়ে দুজনেই চিৎকার করে উঠে—আরে এ কি! সর্বনাশ, এক খ্রীষ্টানকে গুলি করেছি!

—খ্রীষ্টান না ছাই। কই দেখি? বলে আরেকজন কোমড় থেকে ছুরি বার করতেই অন্যজন এসে বাধা দেয়।

—না, না, মারিস না এখন। চল এটাকে বেঁধে শেখের কাছে নিয়ে যাই। তাকে বেচে না হয় অনেক টাকা পাওয়া যাবে। দেখছিস না কেমন দৈত্যের মত চেহারা?

নি ান্ত অনিচ্ছাসত্বে প্রথম লোকটা ছুরিটা আবার কোমড়ে গুঁজে বলল—কাজটা ভাল করলি না। যাকগে, চল।

এই লোকটাই ছিল সবচেয়ে পাজী। দেখতে ছিপছিপে, অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

যাহোক, তারা দুইজনে সবে টারজানের হাতদুটো উটের চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধেছে, জ্ঞান ফিরে এল টারজানের। সে উঠে বসে বলল—একি! তোমরা আমাকে বাঁধলে কেন? খুলে দাও শিগগীর।

হো হো করে হেসে দিল দুইজন।—কি হে! তুমি দেখি শেখের মত আদেশ দিচ্ছ?

—শেখ? আমি শেখের শেখ। আমাকে লোকে টারজান বলে। খোল শিগগীর।

আঁতকে উঠল দুইজনেই। সর্বনাশ, এ টারজান? যেখানে গেছি

সেখানেই লোকে টারজানের ভয় দেখিয়েছে আমাদের! ক্রীতদাস ধরার জন্য সে নাকি আমাদের হত্যা করবে। এ নাকি জঙ্গলের রাজা।

ছিপছিপে শয়তানটি বিরক্ত হয়ে তার বন্ধুকে ফিসফিস করে বলল—দেখলি তো? তখনি বলেছিলাম তাকে নিকেশ করে দিই। না, শেখের কাছে নিয়ে চল। এখন বুঝবি!

—আরে তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চলনা যাই। বলে তার বন্ধু টারজানকে বলল—ওহে, তুমি টারজানই হও আর যেই হও, আমাদের শেখের কাছে তোমাকে যেতেই হবে। না হলে দেখছ তো রাইফেল।

টারজান বুঝল এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই সে আদেশের সুরেই বলল—বেশ চল তোমাদের শেখের কাছে।

শেখ একা আসেনি জঙ্গলে। সে তার স্ত্রী কন্যা, ভাই সবাইকেই নিয়ে এসেছিল। তাছাড়া আর একটি সুশ্রী যুবকও ছিল তাদের সঙ্গে। সে শেখের মেয়েকে ভালবাসে। মেয়েটিও তাই। তবে সেই ছিপছিপে শয়তানের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

তারা তাঁবুতে বসে সেই ধনরত্নের কথাই বলছিল নিজেদের মধ্যে। এমন সময় সেই দুই শয়তান টারজানকে নিয়ে আসে শেখের সামনে। সবাই হতভম্ব।

টারজান এসেই বলল—শেখ কে?

থতমত খেয়ে গেল শেখ। বলল—আ-আমি—কেন?

টারজান বলল—আমি টারজান। তোমরা আমার দেশের লোককে ক্রীতদাস বানিয়ে নিয়ে চলে যাবে, তা আমি চাই না। এক্ষুণি তোমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে।

—আমরা তো তা করতে আসিনি।

—কি করতে এসেছ কি আসনি তা তোমরাই জান। তবে আমি

চাই তোমরা এক্ষুণি চলে যাবে। বলে টারজান তার বাঁধা হাতদুটো এগিয়ে দিয়ে বলল—বাঁধন খোল হাতের।

বিরক্ত হয়ে শেখ বলল—কি হে! এসে পর্যন্ত তুমি আদেশই করে যাচ্ছ? ভুলে যেওনা তুমি আমাদের কবলে। তুমি যদি যুদ্ধ চাও তবে আমরাও চাইব। যদি শান্তি চাও তবে আমরা শান্তি চাই। কোনটা তোমার পছন্দ মাথা ঠাণ্ডা করে ঠিক কর গিয়ে। সন্ধে পর্য্যন্ত সময় দিলাম। বলেই সে তার সহকারী দুজনকে ইঙ্গিত করতে তারা টারজানকে নিয়ে একটা তাঁবুতে বন্দী করে রাখল।

টারজানকে দেখে ভয় লেগে গিয়েছিল সবারই। টারজানের কথা তারা অনেক শুনেছিল। কিন্তু শেখ তো দস্যুই। সে কি তাকে হাতে পেয়ে ছাড়ে? সে তক্ষুণি গোপনে তার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে রাখল যে রাত্রির অন্ধকারে বন্দী অবস্থায়ই তার ভাই তাকে হত্যা করে কবর দিয়ে ফেলবে। লোকে জানবে টারজান চলে গেছে।

ষড়যন্ত্র মত সব ঠিক হয়েই আছে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার রাত্রি। তাঁবুর সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে। শুধু ঘুম নেই দুটি প্রাণীর। শেখের মেয়ে ও সুশ্রী যুবকটি। তারা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। শেখের ভাই যে ছিপছিপে শয়তানটার সাহায্যে শেখ হতে চায় তা তারা জানে। তাই তো শেখের ভাইয়ের পরামর্শেই ছিপছিপে শয়তানটার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। শয়তানটাকে হাত না করলে যে চলে না শেখের ভাইয়ের।

এমন সময় হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ পশুর গর্জন শুনে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। ঘুম ভেঙ্গে লাফিয়ে উঠে সবাই ছুটাছুটি আরম্ভ করল। টারজানের ঘরটা থেকেই যেন এসেছে আওয়াজটা। শেখ তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে টারজানের তাঁবুতে উঁকি দিয়ে দেখল—না ঘুমিয়েই রয়েছে টারজান। কোথাও কিছু নেই। তবুও চিন্তিত হয়েই মোটামুটি ফিরে গেল সবাই।

আসলে এই গর্জনটা ছিল টারজানেরই। সে তার হাতিকে ডেকেছিল। তারপরে কি হবে সে জানত বলেই হাতিকে ডেকেই সে মটকা মেরে পড়েছিল মাটিতে। তা দেখেই শেখ ভেবেছিল ঘুমিয়ে রয়েছে সে।

শেখ ফিরে এল বটে, কিন্তু মনের দুশ্চিন্তা যায়নি তখনও। একটু পরেই পরিকল্পনামত সে পাঠিয়ে দিল তার ভাইকে টারজানের তাঁবুতে।

তার ভাই চুপিচুপি একটা ছুরি হাতে টারজানের তাঁবুতে ঢুকতেই টারজান বলল—কি খুন করতে এসেছ?

—তবে রে শয়তান। বলে শেখের ভাই ছুটে গেল টারজানের দিকে।—তুমি ঘুমোওনি?

টারজান তৈরী হয়েই ছিল। হাত তার বাঁধা, কিন্তু পা তো আছে। সে শুয়ে থেকেই লাথি কষাল একটা শেখের ভাইকে। ছিটকে পড়ল সে। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়লে আবার লাথি। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না সে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। হঠাৎ সমস্ত তাঁবুটাই কে যেন উপড়ে নিল টারজান শুদ্ধ। এক ঝটকায় ছিটকে পড়ল শেখের ভাই। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল হাতির দাপটে। ভয় পেয়ে গেল সবাই।

পরদিন তারা কি আর এখানে থাকে? যত তাড়াতাড়ি পারে সকাল বেলায়ই তাঁবু উঠিয়ে চলল তারা। টারজান পালিয়ে গেছে, না জানি কি হয়।

সবচেয়ে বেশী আফসোস হচ্ছে সেই ছিপছিপে শয়তানটার। —ইস্, হাতে পেয়েও টারজানকে ছেড়ে দিতে হল বন্ধুর কথায়? শেখের ভাইয়ের পাশে যেতে যেতেই কথা হচ্ছিল তার।—এখন আমার বিয়েটা না কেঁচে যায়।

শেখের ভাই বলল—আরে, হবে হবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন?

—ঘাবড়াব না তো কি? দেখতে পাচ্ছ না কে একটা সুন্দর

ছেলে এসে আলাপ জমিয়েছে তোমার ভাইঝির সাথে।

—আরে, তুমি যদি আমার সহায় হও, শেখ যদি হতে পারি, তবে তোমার বিয়ে আটকায় কে? বুঝেছ? শেখের ভাই শয়তানটার পিঠ চাপড়ে দিল।

মুচকী হেসে শয়তানটা বলল—ও তাই?

এদিকে হাতিটা টারজানকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বহুদূরে এনে নামিয়ে পাহারা দিচ্ছিল তাকে। হাত বাঁধা টারজান কিছুতেই খুলতে পারছিল না বাঁধন। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভাবছিল কি করে খুলি হাতটা? তিনদিনেও সে কিছু উপায় দেখতে পেল না। হাতিটা না খেয়ে এতদিন পাহারা দিয়েছে তাকে, কিন্তু—। যা হয় হবে ভেবে সে হাতিটাকে ছেড়ে দিল। আর তারপরেই তার ভাগ্য ভাল, কয়েকটা গরিলা এসে পড়ে। দুয়েকজন চিনতও তাকে। যাহোক, তাদের দিয়েই সে কোনমতে বাঁধন খুলিয়ে তাদের নিয়ে চলে গেল আস্তানায়।

এক নাটক শেষ হয়তো আরেক নাটক জমে উঠে আরেক দিকে।

জেমস নামে আমেরিকার এক ধনী যুবক উইলী বলে এক প্রৌঢ়কে নিয়ে এসেছিল আফ্রিকার জঙ্গলে। তার উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার কিছু জীবজন্তুর ছবি চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় ধরে নিয়ে যাবে। এ বিষয়ে উইলীর আগে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল বলে জেমস তাকে নিয়ে এসেছিল নেতা হিসেবে। একা একা তো এত মালপত্র নিয়ে চলাফেরা করা যায় না, তাই কিছু নিগ্রো আদিবাসী নিয়েই কাজকর্ম করত তারা। তবে উইলী ছিল অত্যন্ত বদমেজাজী। কথায় কথায় সবার সঙ্গেই সে ঝগড়া করত। তাই তাদের ক্যামেরাম্যান দল ছেড়ে চলে যায়। তাতে জেমস পড়েছিল বিপদে। কিন্তু বিপদে পড়লেও এত কষ্ট করে যখন এসেছে সে, চলেও তো যেতে পারে না। তাই সে ছবি তোলার কাজ ছেড়ে শিকার করেই ঘুড়ে বেড়ায় সবাইকে নিয়ে। কিন্তু এটাও বুঝি যায় উইলীর মেজাজের জন্য।

কথায় কথায় কুলীদের ধমক তো দিতই উইলী, ঘুঁসি, লাথি



মারতেও সে দ্বিধা করতনা। কুলীরাও তাতে উইলীর উপরে রেগে

উঠছিল দিনে দিনে। জেমস বুঝত। কিন্তু বুঝলে কি হবে উইলীকে কি সে ঠেকাতে পারে?

এর মধ্যে একদিন একটা কুলী হঠাৎ হুঁচট খেয়ে মালপত্র নিয়ে পড়ে গিয়েছিল বলে বেধড়ক ঠেঙ্গিয়েছিল উইলী। সেদিন জেমস আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। তাকে সাফ বলে দিয়েছিল উইলীর সঙ্গে সে আর থাকবে না। মালপত্র ভাগাভাগি করে সে চলে যাবে নিজের পথে।

সেদিনই জেমস দুপুরে একজায়গায় শিবির স্থাপন করে উইলীকে ডেকে বলল—উইলী, আজই আমাদের শেষ। এখন দুপুর। তুমি শিকারে যাও। আর আমি শিবিরে আমাদের মালপত্র ভাগ করে রাখব। কাল সকালেই আমরা যে যার পথে চলে যাব।

উইলীও মেজাজের মাথায় বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। রেখ সব ভাগ করে। আমি চললাম। বলে সে চলে গেল শিকারে।

শিকার আর কি করবে সে! মেজাজই তো তার ঠিক নেই। তবুও যেতে যেতে খানিকদূর গিয়েই সে এক গরিলা দেখে করল গুলি। গুলিটা লাগেনি গরিলাটার। পালাল ছুটে। তাতে উইলীর মেজাজ গেল আরও বিগড়ে। সেও ছুটল গরিলাটার পেছনে।

জঙ্গলে তো বিপদের অভাব নেই। গরিলাটার ভাগ্য খারাপ। দৌড়তে গিয়ে সে পড়ল এক অজগরের খপ্পরে। আর তখনি ছুটে এসেছিল উইলী তাকে গুলি করবে বলে। কিন্তু সাপটাকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে নিশানা ঠিক করতে থাকে ছুটোকেই গুলি করবে বলে। আর তক্ষুণি সে পড়ে যায় টারজানের চোখে। একে গরিলাটা পড়েছে বিপদে তার উপর এ লোকটি করতে যাচ্ছে গুলি? টারজান অত্যন্ত রেগে গিয়ে হঠাৎ উইলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুরি নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে

সাপটার উপর। তারপর অমানুষিক প্রচেষ্টায় সাপটাকে মেরে হাঁপাতে হাঁপাতে উইলীর সামনে এসে ধমকে উঠে বলল—তুমি কে? আমার দেশে কি করছ তুমি? ইতোমধ্যে উইলীর কুলীরাও এসে পড়েছিল।

অবাক হয়ে উইলী বলল—তোমার দেশ? তুমি কে?

—আমি টারজান। বলে সে কুলীদের দিকে তাকিয়ে বলল—এ লোকটা এখানে কি করছে? এরা কত সংখ্যায়?

কুলীরা কিন্তু তাকে দেখেই চিনেছিল। তারা সবাই তখন একে একে তার সব কথাই বলল তার কাছে।

টারজান তখন উইলীকে বলল—ঠিক আছে। আর শিকার করতে হবে না তোমার। এক্ষুণি চলে যাও শিবিরে। সন্ধেবেলায় আমি যাব। বলেই সে চলে গেল।

হতবাক উইলী কিছু বলতে তো পারলই না, তার কথা অমান্য করতেও পারল না। তারপরে শিবিরে গিয়ে মালপত্র সব ভাগ হয়ে গেছে দেখে আর সে রাগ চেপে রাখতে পারল না! চেঁচিয়ে উঠে জেমসকে বলল—ও, মালপত্র ভাগ করে রেখেছ? ঠিক আছে আসুক সে, টারজান না বাঁদর একটা, আমি দেখাব তাকে। আমাকে চলে যেতে হবে তার কথায়? হুঁ—।

—কি, কি বললে? অবাক হয়ে গেল জেমস! টারজান তোমাকে বলেছে একথা? আমি হলে কিন্তু তার কথা শুনে চলেই যেতাম। তুমি জান না তাকে, আমি জানি। শুনেছি তার কথা। সে আসবে? ঠিক আছে।

মালপত্র সব ভাগ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোন কুলী উইলীর সঙ্গে যেতে চাইল না। বেশী টাকা কবুল করেও কিছুতেই তাদের রাজী করাতে পারল না উইলী।

যাহোক টারজান আসতেই সে বেঁচে গেল। অর্দ্ধেক কুলী তার কথায় রাজী হয়ে চলল উইলীর সাথে। তবে যাবার আগে

টারজান তাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে খাবার জন্য ছাড়া সে আর কোন শিকার করতে পারবে না। সোজা চলে যাবে নিজের দেশে। কুলীদেরও বলেছিল তারা যেন তার উপর নজর রাখে। তার আদেশ অমান্য করলে তারা তাকে ফেলে চলে যেতে পারে। বলে দিয়েছিল—আমি নজর রাখব।

উইলীকে টারজান সাবধান করলেও জেমসকে সে স্বাধীনতা দিয়েছিল ছবি তোলার, শিকার করবার। সব ব্যবস্থা করে টারজান চলে গেল সেখান থেকে। আসলে কিন্তু সে যায়নি বেশি দূরে। লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল উইলীর প্রতি।

তেমনি একদিন সে নজর রাখছিল, সঙ্গে ছিল এক গরিলা বন্ধু। হঠাৎ এল ঝড় আর বৃষ্টি। বিব্রত হয়ে চুপ করে বসে আছে টারজান, হঠাৎ একটা ডাল ভেঙ্গে নীচে আছড়ে পড়ল সে। আর পড়েই অজ্ঞান। ঘাবড়ে গেল গরিলা বন্ধু। নীচে নেমে এসে তাকে পরীক্ষা করছিল সে, হঠাৎ কার পায়ের আওয়াজে চট করে লুকিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

লোকটা ছিল উইলী। ঝড়-বৃষ্টিতে সব হারিয়ে সেও খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার কুলীদের। এমন সময়ে গাছের নীচে চাপা টারজানকে দেখে সে ভাবল, বাঃ! টারজান! সেই তো আমার শত্রু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! তাকে খুন করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। হু—ম্। বলে যেই সে ছুরি বার করে তার দিকে এগিয়েছে গরিলাটা এক লাফে ছুটে এসে গলাটা টিপে ধরল উইলীর। আর ঠিক তক্ষুণি ধরমর করে টারজান লাফিয়ে উঠে গরিলার হাত চেপে ধরে বলল—না, ছেড়ে দাও তাকে।

কিন্তু গরিলা কি ছাড়তে চায়? লোকটা তার বন্ধুকে খুন করতে গিয়েছিল, সে ছাড়বে কেন? তবুও টারজানের কথায় ছাড়তেই হল তাকে।

ইতোমধ্যে কুলীরাও এসে পড়েছিল তাকে খুঁজতে খুঁজতে।

তারপর টারজান শেষবারের মত তাকে সাবধান করে দিয়ে চলে গেল।

সাবধান করলে হবে কি? উইলী শুনলে তো? কিন্তু তার ফলাফল হল ভয়াবহ। কুলীরা একদিন তাকে ছেড়ে চলে গেল। উইলী পড়ল মহা আতান্তরে। কিন্তু তখন আর তার কিছু করার নেই জেমসের খোঁজে যাওয়া ছাড়া। জেমস তখন কতদূরে, কোথায়? জানেও না সে। তবুও সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল সে। পথে বিশ্রাম করে আর চলে। এমনি এক সময় একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিল সে। হঠাৎ কোথেকে এক সিংহ এসে তাকে করল তাড়া। সে ভয়ে তক্ষুণি গাছে উঠে পড়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু সিংহটা কি আর এত সহজে যায়? তর্জন গর্জনে সারা বন কাঁপিয়ে ভয় লাগিয়ে দিল উইলীর মনে। তারপর রাগে গাছের নীচে ফেলে যাওয়া উইলীর খাবার দাবারের পুঁটুলী ছিঁড়ে খুঁড়ে কি মনে করে তার রাইফেলটাকে মুখে করে চলে যায়। অসহায়ের মত তাকিয়ে থেকে সারারাত কাটাতে হল উইলীর গাছে।

পরদিন সত্যিই, উইলীর কি বিপর্যস্ত অবস্থা। বয়স যেন তার বেড়ে গেছে এক রাত্তিরেই। মুখে কথা নেই, টলতে টলতে সে এগিয়ে চলল জেমসের খোঁজে।

জেমস তখন পড়েছে, যে নগরীর উদ্দেশ্যে আরব শেখ চালিয়েছিল অভিযান সেই নগরীর প্রহরীর হাতে ধরা।

জেমস তার লোকজন নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক কুলীসহ মূল দল থেকে বিছিন্ন হয়ে চলে গিয়েছিল অনেক দূর। ক্যামেরা ও সাজসরঞ্জামসহ সিংহের ছবি তুলতেই চলে এসেছিল সে। পথে ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে সেই কুলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পরে ঝড়-বৃষ্টি কমলে সে ভৃত্যটির বজ্রাহত দেহটি কুড়িয়ে পায়। দেহে প্রাণ নেই তার। পাশে ছড়িয়ে রয়েছ তার সব সরঞ্জাম—পুড়ে ছাই।

হতাশ জেমস আর কি করবে? নিঃস্ব হয়ে তখন সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার মূল দলটিকে! আর তখনি সে পড়ল ধরা সেই নগরীর প্রহরীর হাতে।

সেই নগরীটি নিষিদ্ধ নগরী বলেই পরিচিত। প্রায় বিচ্ছিন্ন পৃথিবী থেকে। নগরীতে লোকেরা ছিল সবই খ্রীষ্টান। ইংলণ্ডের ধাঁচেই রাজ্যশাসন করতেন এক রাজা।

প্রহরীরা জেমসকে ধরে যে নেতার কাছে তাকে নিয়ে যায় সে ছিল একজন নাইট। বন্দী হয়েছিল বটে জেমস, কিন্তু তার কাছে পেয়েছিল সহৃদয় ব্যবহার। এমন কি পরে তাকে নাইট হিসেবেই সেই নাইট তাকে দলভুক্ত করে নিয়েছিল রাজার আদেশে। নাইটের মর্য্যাদাও রেখেছিল জেমস। কালক্রমে সে একজন দুর্দ্ধর্ষ নাইট হিসেবেই পরিচিত হয়ে যায়।

বড় হওয়ার জ্বালাও অনেক। ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকের তো অভাব হয় না? জেমসেরও জুটেছিল একজন, এক নাইট। ছুঁতোনাতায় একদিন তার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায় সেই নাইটের। ফলে সেই নাইট জেমসকে করে ডুয়েলে আহ্বান।

জেমসই জিতে গেল ডুয়েলে। শুধু জিতলই না, পরাজিত নাইটকে মুক্তিও দিয়ে দিল। অবাক হয়ে গেল সবাই। কারণ পরাজিতকে হত্যা করাই বিধি সে দেশের। কিন্তু জেমস রাজাকে সবিনয়ে জানাল—মহারাজ আমাদের দেশের রীতি অনুযায়ীই আমি তাকে ক্ষমা করেছি। ধন্য ধন্য করে উঠল সবাই তার ব্যবহারে, তার বীরত্বে। ডুয়েলের লড়াই দেখতে রাজকুমারীও এসেছিল সেখানে। সে মুগ্ধ হয়ে গেল তার বীরত্বে, তার উদারতায়। ভালও বেসে ফেলল গোপনে।

উইলী তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে জেমসকে। কিন্তু তাকে কোথায় পাবে সে? তারই ভাগ্য খারাপ, ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন তাঁবুর কাছে এসে পড়ল ধরা। তাকে পেয়ে শেখ ভাবল, এ তো ভারী

মজা! লোকটাকে বন্দী করে মোটা মুক্তিপণ আদায় করা যাবে। তারপর কি আর সে ছাড়া পায়?

তাকে বন্দী করে ছিপছিপে শয়তানটাও কিন্তু ভাবছিল, মুক্তিপণটা আমাকেই নিতে হবে। তাই সে ভাবও জমিয়ে ফেলল উইলীর সঙ্গে। কিন্তু তাতেও তার মনের জ্বালা কমছিল না। শেখের মেয়েটাকে আজ পর্যন্তও হাত করতে পারল না সে সেই সুশ্রী ছেলের জন্য?

তাই একদিন গভীর রাতে মেয়েটা যখন ছেলেটার সঙ্গে গোপনে কথা বলছিল, শেখ বসেছিল তার তাঁবুর সামনে, শয়তানটা ছেলেটার বন্দুক এনে অন্ধকার থেকে শেখকে করল গুলি। ভাগ্যক্রমে শেখ বেঁচে যায়। লেগে গেল হৈ চৈ।

শয়তানটার উদ্দেশ্য ছিল যদি গুলিতে শেখ নিকেশ হয়ে যায় তবে তার ভাই শেখ হয়ে তার ভাইঝিকে তার হাতে তুলে দেবে। নয়ত শেখকে খুন করতে গিয়েছিল বলে ছেলেটাকে বন্দী করে শাস্তি দিতে পারবে। তখন মেয়েটা তো তার।

তাই করল সে। শেখকে গুলি করার অপরাধে তার আদেশে সে ছেলেটাকে করল বন্দী।

ছেলেটি তো হতভম্ব! কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। কাল সকালেই তাকে হত্যা করা হবে। মেয়েটি তখন মরীয়া হয়ে সেই রাত্তিরে তাকে মুক্ত করে দেয়। ছেলেটি তখন পাগলের মত ছুটে একটা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যায়। শ্বাপদসঙ্কুল বন। পালিয়ে গিয়েও সে পড়ে যায় এক সিংহের খপ্পরে। কিন্তু তার ভাগ্যক্রমে টারজানই বাঁচায় তাকে। তখন সে প্রায় অজ্ঞান। একটু সুস্থ হয়ে সে টারজানকে বলে সব কথা। শেখ যে নিষিদ্ধ নগরী খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কথাও সে বলতে ভুলল না। সেখানকার ধনরত্ন সে লুণ্ঠন করবে। কিন্তু কোথায় যে সেই নগরী সে জানে না বলেই খুঁজে চলেছে দিনের পর দিন।—ও, হ্যাঁ—ছেলেটা তখনও বলছিল—

শেখ একজন সাদা লোককে ধরে বন্দী করে রেখেছে।

—কি? চমকে উঠল টারজান। ভাবল, তবে কি শেখ জেমসকে বন্দী করেছে?

কিছুদিন ধরেই সে জেমসকে খুঁজে পাচ্ছিল না। একদিন তার কুলীদের সঙ্গে দেখা হতেই সে জানতে পেরেছিল জেমস কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। টারজান তখন তাদের গাঁয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল জেমসকে! এমন সময়ই তার দেখা হয়ে যায় ছেলেটির সঙ্গে।

যাহোক, সে ছেলেটিকে তার অনুগত যোদ্ধাদের গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে বলল—তুমি কিছুদিন এখানে থাক, পরে আমি তোমাকে তোমার দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

ছেলেটি আমতা আমতা করে বলল—কিন্তু—।

—কিন্তু কি? টারজান বিস্মিত।

—আমি বলছিলাম, আমি শেখের মেয়েকে ভালবাসি—তাকে একবার না দেখে তো—।

টারজান হেসে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা। হবে। তুমি থাক তো কিছুদিন। বলে তখনি চলে গেল টারজান জেমসের খোঁজে।

এদিকে শেখের তাঁবুতে চলেছে তখন গণ্ডগোল। ছেলেটা গেছে পালিয়ে। মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছে মেয়ে। শেখের ভাই ছিপছিপে শয়তানটার সঙ্গে করছে ষড়যন্ত্র কি করে শেখ হওয়া যায়। আর শেখ নিজে ভাবছে কি করে নিষিদ্ধ নগরীতে গিয়ে লুণ্ঠন করা যায়। তারজন্য সে তার ক্রীতদাসকে পাঠিয়েছে ক্রীতদাসের গাঁয়ে। তাদের গাঁয়ের লোকরাই নাকি জানে নিষিদ্ধ নগরীর পথ। তারা তাকে পথ দেখিয়ে দিলে ক্রীতদাসকে মুক্তি দেবে, কথা দিয়েছে সে। কিন্তু সে এখনো ফিরে আসেনি বলে রাত্রিবেলায় শেখের তাঁবুতে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময়ই টারজান গিয়ে হাজির। গিয়েই দেখে উইলী বসে আছে তাদের মধ্যে।

টারজান সরাসরি তার কাছে গিয়ে কোন ভণিতা না করেই জিজ্ঞেস করল—জেমস কোথায় ?

আ-আমি তো জানি না। টারজানকে দেখে ভয় লেগে গিয়েছিল উইলীর। টারজানকে বলল—সে তো অন্য পথে গেছে।

ভয় কেবল উইলীরই লাগেনি তাকে দেখে, ভয় লেগেছিল সবার। টারজান তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে শেখের দিকে একটু এগিয়ে ধমকে উঠল—শঠ, মিথ্যেবাদী ! তুমি এসেছ নিষিদ্ধ নগরীর ধনরত্ন লুঠ করতে, আর আমাকে বুঝিয়েছ অন্য !

—না, না। কে বলেছে তোমায় ? আঁতকে উঠল শেখ।

—বলেছে তোমার এখানে যে ছেলেটি থাকত সে। যাকগে, তোমরা কালই এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। না হলে বুঝতেই পারছ। বলেই সে আদেশ করল—আমার শোবার ব্যবস্থা কর। আমি থাকব এখানে আজ।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বলে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে ছেলেটির ঘরেই তার শোবার ব্যবস্থা করে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আবার বসল তারা পরামর্শে কি করে টারজানকে হত্যা করা যায়। ধুরন্ধর তারা। টারজানকে হত্যার ভার দিল উইলীর উপর। যদি সে মুক্তি চায় তবে একাজটুকু তাকে করতেই হবে।

টারজানের মুখে ছেলেটির কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিল শেখের মেয়ে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র শুনে আর স্থির থাকতে পারল না সে। সে তক্ষুণি ছুটে গেল টারজানের ঘরে। কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি আর করতে পারল না সে। ঘরের দরজায়ই সে ধরাপড়ে গেল শেখের ভাইয়ের হাতে। চাপা গলায় ধমকে উঠেছিল শেখের ভাই।—শয়তানি, বাঁচাতে এসেছিস টারজানকে ? বলে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতেই টারজান এসে গলা চেপে ধরল শেখের ভাইয়ের। এক টিপেই সে শেষ। সে তক্ষুণি তার দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল বনে।

তারপর যা হওয়ার তা হল। উইলী এসে সেই চাদর ঢাকা দেহ-টাতে যেই ছুরির আঘাত করেছে কোত্থেকে শেখ ছুটে এসে চেপে ধরল তাকে—হায়! হায়! আমাদের বন্ধু টারজানকে খুন করেছে এ শয়তানটা। তারপর আর কি সে ছাড়া পায়? আবার হল বন্দী।

আসলে কে যে খুন হয়েছে সে কথা কিন্তু শেখ তখনও জানে না! তার পরদিন তার ভাইকে কোথাও দেখা গল না। চাদর ঢাকা অবস্থায় তার দেহটাকে মাটি চাপা দিয়েছিল তারা।

বড় শত্রু নিপাত হওয়াতে শেখ খুশি হয়েছিল বটে, কিন্তু পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি তখনও। কারণ ক্রীতদাসটা তখনও ফিরে আসেনি। সে যাহোক, তাঁরা তারজন্য আর অপেক্ষা না করে নিজেরাই গিয়ে উঠল তাদের গাঁয়ে। গাঁয়ের সর্দারও ক্রীতদাসদের মুক্তির আশায় নিষিদ্ধ নগরীর কাছে একটা উপত্যকায় তাদের ছেড়ে দিয়ে চলে এল সব ক্রীতদাস নিয়ে। শেখের মাথায় তখন ধনরত্ন ছাড়া কোন চিন্তাই নেই। মনের আনন্দে সে তার নিজের লোকজন নিয়ে এগিয়ে চলল নগরীর দিকে।

এদিকে টারজানও জেমসকে খুঁজতে খুঁজতে চলেছে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখে একটা ভাঙ্গা ক্যামেরা টুকরো হয়ে পড়ে আছে চারদিকে। রয়েছে আরও কিছু জিনিষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই জায়গায়ই জেমস জল ঝড়ে পড়েছিল। এগুলি পরীক্ষা করতে করতে সে পেয়ে যায় জেমসের গন্ধ। চমকে উঠে সে তক্ষুণি সেই গন্ধসূত্র লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল জেমসের খোঁজে।

জেমস তখন লড়াইয়ে ব্যস্ত।

নিষিদ্ধ নগরীর পাশেই ছিল আরেক প্রাচীন নগরী। এই দুই রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই লেগে থাকত শত্রুতা। তাতে একবার দুই রাজ্যের রাজাই বসে এক শান্তি চুক্তি করেছিলেন। শর্ত ছিল প্রতি বছর এক একবার এক রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে এক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা হবে তিন দিন ধরে। তাতে দুই রাজ্যের একশজন

করে নাইট এক মাঠে মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে যে পক্ষ জিতবে সে পক্ষ পরাজিত পক্ষের কাছ থেকে পাঁচটি সুন্দরী মেয়ে উপহার পাবে। এই যুদ্ধেই ব্যস্ত ছিল জেমস। যুদ্ধে তার অসাধারণ বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শত্রুপক্ষের নাইটরাও। এমনকি তার হাতে আহত হবার পরে কয়েকজন নাইট তার হাতে শুশ্রূষা পেয়ে অভিভূতও হয়ে গিয়েছিল। নিষিদ্ধ নগরীই জিতে যায় প্রতিযোগিতায়। কিন্তু জিতলে হবে কি? প্রাচীন নগরীর রাজা ছিল অসৎ প্রবৃত্তির। তার আদেশে কয়েকজন নাইট আচমকা রাজার পাশ থেকে রাজকুমারীকে জোর করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। নিষিদ্ধ নগরীর নাইটরাও তখনি পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের। জেমস ছিল তাদের মধ্যে অগ্রগন্য। লেগে গেল যুদ্ধ যেতে যেতে। ঘোড়ার খুরের ধুলোয় ছেয়ে গেল চারিদিকে।

এই সময়েই সেখানে গিয়ে পড়েছিল টারজান গন্ধসূত্র ধরে। জেমসের বন্ধু বলে এক নাইটর সঙ্গে আলাপও হয়ে গিয়েছিল তার। সেই নাইটই নিয়ে এসেছিল তাকে যুদ্ধে। টারজানও কম যায়নি যুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ করে জেমসকে না পেয়ে ফিরে চলে এসেছিল সে নগরীতে। ভেবেছিল এখানেই দেখা হবে তার জেমসের সঙ্গে।

এদিকে শেখও কিন্তু পড়েছিল এই যুদ্ধের দাপটে। সে উপত্যকা থেকে মনের আনন্দে নিষিদ্ধ নগরীতে না গিয়ে ভুলে গিয়ে উঠেছিল প্রাচীন নগরীতে। তখন সেখানে বাঁধা দিবার প্রায় কেউই ছিল না। তারা সবাই চলে এসেছিল প্রতিযোগিতায়। প্রায় বিনা বাঁধায় সে রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করে ফিরে আসছিল এপথ দিয়ে। কিন্তু এখানে যুদ্ধ দেখে ভয়ে পাশ কাটিয়ে সে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে। আর এসেই সে পেয়ে গেল জেমস ও রাজকুমারীকে।

জেমস রাজকুমারীকে উদ্ধার করে নগরীর পথে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করছিল একটা গাছের নীচে। হঠাৎ এই আরবগুলিকে দেখেই লাফিয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু তারা চারদিক থেকে এসে তার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আচমকা। কিছুই করতে পারেনি সে। তাকে একটা গাছে বেঁধে রাজকুমারীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল তারা। কাণ্ডটার নাটের গুরু ছিল সেই ছিপছিপে শয়তানটা। শেখ ছিল তার ধনরত্নের চিন্তায় বিভোর। আর প্রাচীন নগরী থেকে সে পেয়েও গেছে প্রচুর। রাজকুমারীর রূপে শয়তানটা মুগ্ধ হয়ে শেখের মেয়ের কথা ভুলে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, এক সুযোগে উইলী ও রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে যাবে সে। উইলীর কাছ থেকে মোটা মুক্তিপণ আদায় করতে পারবে। কিন্তু বেশি লোভই তার ধ্বংস ডেকে আনল।

একদিন রাত্রিতে সে শেখের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়। তা শেখের মেয়ের চোখে পড়ে যায়। তারপরেই সে শেখের দল থেকে রাজকুমারী এ উইলীকে নিয়ে পালিয়ে যায় প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তাতেও সে রক্ষা পেল না। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ এক গরিলা এসে তাকে আক্রমণ করে রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই সুযোগে উইলীও পালিয়ে যায় জঙ্গলে। আহত অবস্থায় শয়তানটা তখন ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যায় সেই সুশ্রী ছেলেটার চোখে। আর যাবি কোথায়? ছুটে এসে ছেলেটা চেপে ধরে শয়তানটাকে।

টারজান তাকে গাঁয়ে রেখে যাওয়ার পর শেখের মেয়ের কথা ভেবে আর ভাল লাগছিল না তার। সে তখন টারজানেরই অনুগত যোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে টারজানের খোঁজে। পথেই সে পেয়ে যায় শয়তানটাকে।

তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল—শেখের মেয়ে কোথায়?

—কেন? শয়তানটা বলল—তাকে গরিলা নিয়ে গেছে।

—কি? বলেই ছেলেটা হঠাৎ তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল শয়তানটার বুকে। পড়ে গেল সে। আর উঠল না। যোদ্ধাদের নিয়ে চলে গেল ছেলেটি।

এদিকে রাজকুমারী এক বিপদ থেকে গিয়ে পড়েছিল আরেক

বিপদে। গরিলাটা তাকে নিয়ে খানিক দূর যেতেই আর এক গরিলা এসে আক্রমণ করেছিল সেই গরিলাটাকে। তখন রাজকুমারীকে মাটিতে রেখে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল দুই গরিলাই। তখন ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারত রাজকুমারী। কিন্তু তার শরীর আর বইছিল না। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে মাটিতেই বসে পড়েছিল সে। এমন সময় কোত্থেকে এক সোনালী কেশর সিংহ এসে গর্জন করতেই পালিয়ে যায় গরিলাগুলি। চোখ বুজে ফেলে রাজকুমারী ভয়ে। তারপরেই তো ধরবে তাকে সিংহটা! কিন্তু না, অবাক হয়ে সে দেখে সিংহটা তার সামনে থাবা মেলে চুপচাপ বসে আছে। ভয়ে রাজকুমারী বসে থাকে চুপচাপ।

গাছে বাঁধা অবস্থায় জেমস তখন ভাবছিল তার নিজের কথা। হঠাৎ কোথায় একটা খসখস আওয়াজ হতে সে তাকিয়ে দেখে একটা চিতাবাঘ আসছে গুঁড়ি মেরে। বুঝল সে রক্ষা আর নেই তার। কিন্তু না, চিতাটা গর্জন করে লাফ দিতে না দিতেই কে একজন হঠাৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুরির ঘায়ে শেষ করে দিল চিতাটাকে। অবাক বিস্ময়ে জেমস দেখে লোকটা আর কেউ নয়, টারজান।

—টারজান। বলে আনন্দে জেমস চিৎকার করে উঠতেই টারজান এসে বলল—এ কি জেমস তুমি! তুমি এখানে! আর তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর টারজান তার বাঁধন কেটে কাছে বসিয়ে সব শুনে বলল —কোনদিকে গেছে তারা রাজকুমারীকে নিয়ে?

ঘণ্টাখানেক আগে সামনের দিকেই গেছে তারা। উঠে দাঁড়াল জেমস।

ঠিক আছে, চল তো। বলে টারজান জেমসকে নিয়ে খানিক গিয়ে গন্ধ সূত্র ধরে বলল—জেমস, আমার মনে হয় তারা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। এক কাজ কর। তুমি চলে যাও উত্তরদিকে, আর আমি যাব দক্ষিণে। দক্ষিণে না পেলে আমি গিয়ে তোমাকে ধরব।

যে করেই হোক রাজকুমারীকে পেতেই হবে। চল। বলে টারজান একলাফে চলে গেল।

ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর জেমসও অগত্যা চলল উত্তরদিকে। কিন্তু শরীর আর চলে না তার। তবুও যেতেই হবে ভেবে সে হাঁটতে হাঁটতে যে প্রাচীন নগরীর কাছে চলে এসেছিল খেয়ালই নেই তার। আর পড়বি তো পড় সে নগরীর প্রহরীর চোখে। ফলে হল বন্দী। বন্দী অবস্থায় রাজার আদেশে তাকে আটকে রাখা হল কারাগারে। কিন্তু তার ভাগ্য ভাল, প্রতিযোগিতায় প্রাচীন নগরীর যে সব নাইট তার কাছে সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছিল তারা এসে গোপনে তাকে মুক্ত তো করলই, তাদের একজনের বাড়ীতে নিয়ে তাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে রাত দুপুরে নগরপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে এল।

নিজে তো সে মুক্তি পেল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল কই? রাজকুমারীকে তো সে পেল না এখনও। তাই সে রাত্রিটা কোনমতে এক গাছের নীচে কাটিয়ে তার পরদিন সে পাগলের মত খুঁজতে লাগল জঙ্গলে। কিন্তু পেয়ে গেল উইলীকে। অচেতন এক বৃদ্ধ যেন পড়ে আছে এক গাছের নীচে। লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক চিতা।

হাতে অস্ত্র আছে তার। এখন কি আর সে চিতাকে ভয় করে? মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে সে চিতাটাকে তাড়িয়ে উইলীকে দেখে তুলে বলল—উইলী, তোমার একি অবস্থা?

উইলীর মুখে আর হাসি নেই, নেই ক্রোধ। সে বলল—ভাই প্রায়শ্চিত্ত করছি।

না, না, একথা বলছ কেন? দুঃখে ভরে গেল জেমসের হৃদয়। তুমি ভাল হয়ে যাবে। চল। বলে তাকে তার ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলল এক আদিবাসী গাঁয়ে। আগেও সে এই গাঁয়ে এসেছিল। তাকে দেখে গ্রামবাসীরা পালিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। তাই

হল আবার। গ্রামবাসীরা পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু সে প্রচুর খাবার পেয়েছিল সেখানে। উইলীকে নিয়ে সেখানেই সে রয়ে গেল কিছুদিন।

এই গ্রামটা ছিল টারজানের অনুগত যোদ্ধাদের। যোদ্ধারা গাঁয়ে ছিল না বলেই গ্রামবাসীরা পালিয়ে গিয়েছিল। জেমস গাঁয়ে আসার পরদিনই তারা ফিরে এসে টারজানের বন্ধু বলে জেমসের পরিচয় পায়। তখন তারা খুশী হয়েই ডেকে নিয়ে আসে গ্রামবাসীদের। তারপর জেমস আর উইলীর কি খাতির।

যোদ্ধাদের সঙ্গে সুশ্রী ছেলেটা এসেছিল ফিরে। জেমস টারজানের বন্ধু শুনে সে তো হাতে চাঁদ পেল। ভেবেছিল, টারজানের বন্ধু যখন তখন নিশ্চয়ই সে টারজানের খবর জানে, জানে আরব শেখের মেয়েটির খবর। কিন্তু না, সে কিছুই জানে না। দুঃখ পেল ছেলেটি, কিন্তু আশা হারল না। টারজান নিশ্চয়ই আসবে সব খবর নিয়ে।

এসেছিলও টারজান। খবর নিয়ে না, শেখকে তাড়িয়ে নিয়ে।

জেমসকে ছেড়ে সে গিয়ে ঠিক ধরল শেখের একটি দলকে! কিন্তু সেখান রাজকুমারীর কোন খবর না পেয়ে ফিরে চলে গেল অন্য দলটিকে ধরতে। সেই দলেই ছিল শেখ।

শেখের ভাগ্য। সে দলটিকে দুভাগে ভাগ করেই খুঁজছিল নিষিদ্ধ নগরীর পথ। লোভের তো আর শেষ ছিল না তার। প্রাচীন নগরীর রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করেও আশ মেটেনি তার। সে-দলকে ভাগ করেছিল দুভাগে। দ্বিতীয় দলটি অবশ্য খুঁজেও পেয়েছিল নিষিদ্ধ নগরী, কিন্তু লুণ্ঠন করা তো দূরের কথা, নগরীর সিংহদ্বারই পেরোতে পারেনি তারা। প্রহরী যোদ্ধাদের হাতে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তারা। খবরও পায়নি শেখ।

শেখকে ধরবে বলে ছুটে চলেছিল টারজান গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে, কিন্তু পথেই তার দেখা হয়ে যায় একটা গরিলার সঙ্গে।

তার কাছেই সে শুনল একটি মেয়ে একটা সোনালী সিংহের খপ্পরে পড়েছে।

—সোনালী সিংহ? চমকে উঠল টারজান।—কই কোথায়? চল তো। বলে সে ছুটল গরিলাটাকে নিয়ে। ভাবল, তবে কি আমার পোষা সিংহটা!

হ্যাঁ, তাই। তার পোষা সিংহই বটে। একটি মেয়েকে পাহারা দিয়ে থাবা গেড়ে বসে আছে সিংহটা। গরিলাটা চলে গেল ভয়ে।

ছুটে গিয়ে সিংহটাকে ডাকতেই আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে।

অবাক হয়ে গেল রাজকুমারী। বলল—আপনি?

—আমি জেমসের বন্ধু। কিন্তু আপনিই কি রাজকুমারী?

—হ্যাঁ। রাজকুমারী উঠে দাঁড়াল।—কেমন আছে জেমস?

—জানি না। তাকেই তো খুঁজতে বেরিয়েছি। এখন চলুন, আপনাকে আপনার দেশে পৌঁছে দিই। তারপর আবার বেরোব খুঁজতে।

যেন ভেঙ্গে পড়ল রাজকুমারী। বলল—জেমসকে খুঁজে খবর দেবেন বলুন, বলুন না।

—হ্যাঁ, দেব। টারজান বলল—এখন আসুন। বলে তাকে তার দেশে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল সে শেখের খোঁজে।

পেয়েও গেল সে তার খোঁজ। তখন তার বিপর্যস্ত অবস্থা। আগের দলটার খোঁজ নেই। লোক কম। পথশ্রমে ক্লান্ত। নিষিদ্ধ নগরী যে কোনদিকে তাও জানা নেই। তাছাড়া রয়েছে ধনরত্নে ভরা থলেগুলি। ফেলেও যেতে পারছে না। নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ভাগ করে।

তাকে হাতে পেয়েও তক্ষুণি টারজান ঝাঁপিয়ে পড়ল না তার উপরে। তার ইচ্ছে ছিল মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিয়ে ধরবে তাকে। তাই সে ঝোপের আড়াল থেকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে লাগল তার নাম ধরে—তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে শেখ। প্রতিটি

ধনরত্নের জন্য তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর মাঝে মাঝে টারজানের পোষা সিংহটা গর্জন করে তাকে করে তুলল আরো ভীত। প্রাণভয়ে অতি দ্রুত ছুটতে লাগল শেখ। কোথায় যে যাচ্ছে কিছুই খেয়াল নেই তার। ইতোমধ্যে ধনরত্নের বোঝা ফেলে তার কয়েকজন ভৃত্যও পালিয়ে গিয়েছিল তাকে ফেলে। তবুও যে দুয়েকজন ছিল তাদের নিয়েই চলছিল সে স্ত্রী কন্যার হাত ধরে। নিজেও কাঁধে নিয়েছিল একটা বোঝা।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত অবস্থায় যেতে যেতেই কখন যে সে টারজানের অনুগত যোদ্ধাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠল কিছুই জানে না সে। কিন্তু যখন জানল তখন তার আর কিছুই করার ছিল না। কাঁধ থেকে ধুপ করে বোঝাটা ফেলে দিয়ে বসে হাপুস নয়নে কেঁদে উঠল সে—আমার এতদিনের পরিশ্রম।—টারজানের অনুগত যোদ্ধারা ততক্ষণে তার ভৃত্যদের বন্দী করে ফেলেছে। টারজান এসে ধরল শেখকে। বলল—কি শেখ চিনতে পার? গম্ভীর গর্জন করে উঠল তার পোষা সিংহ। চিৎকার করে উঠল তার স্ত্রী ও কন্যা।

সুশ্রী ছেলেটা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল শেখের মেয়ের হাত। খুশি দুজনেই।

জেমস টারজানকে জড়িয়ে ধরে বলল—ভাই, তুমি এসেছ! আমার রাজকুমারী আর নেই।

—কে বলল তোমাকে? হেসে ফেলল টারজান।—তাকে আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছি প্রাসাদে।

—সত্যি! বলে জেমস টারজানের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল।

যাহোক, তার পরদিনই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। জেমস আর দেশে ফিরবে না। রাজকুমারীকে নিয়ে প্রাসাদেই থাকবে সে। উইলী, শেখের কন্যা ও সুশ্রী ছেলেটা টারজানের বাংলোতেই থাকবে। কিন্তু শেখ ও বাকী আরবদের ক্ষমা করল না টারজান। ঠিক হল তার অনুগত যোদ্ধারা তাদের বিক্রী করে দিয়ে আসবে ক্রীতদাস হিসেবে।



নিষিদ্ধ নগরীতে টারজান

বর্ষা শেষ। চারদিকে সবুজের মেলা। গাছপালাগুলি যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে।

একদিন দুপুরবেলায় টারজান তার প্রিয় হাতিটার পিঠে শুয়ে বিশ্রাম করছে, এমন সময় একজন আদিবাসী এসে খবর দিল মঁসিয়ে দার্নো তাকে পাঠিয়েছে হুজুরকে নিয়ে যেতে। তিনি তাদেরই অঞ্চলে একটা হোটেলে আছেন।

টারজান অবাক! জিজ্ঞেস করল—সে কি? দার্নো কোত্থেকে এল?

—তা তো জানি না প্রভু।

—হুম্। চল। বলে টারজান চলল দার্নোর হোটেলে।

দার্নো কোন একটা বিশেষ কাজে এসেছিল এ অঞ্চলে। এখানে এসেই তার পরিচয় হয়ে যায় মিঃ ও মিস গ্রেগ-এর সঙ্গে। তারা এসেছেন তাদের ছেলের খোঁজে। আজ দুবছর তার খোঁজ নেই। এ অঞ্চল থেকে সে হারিয়ে গিয়েছে। তাই দার্নোই টারজানকে খবর পাঠিয়েছে, সে এসে যদি তাদের কোন সাহায্য করতে পারে।

হারানো মাষ্টার গ্রেগ-এর কথাই তারা আলোচনা করছিল হোটেলের খাবার ঘরে বসে। অন্যপ্রান্তে আর একটা টেবিলে ম্যাগী নামে একটা মেয়ে একটা লাল মুখো লোকের সঙ্গে কথা বলছিল বসে। এমন সময় টারজান গিয়ে দার্নোর সামনে দাঁড়াতেই চমকে উঠল মিঃ ও মিস গ্রেগ। ঠিক মাষ্টার গ্রেগ-এর মতই দেখতে।

ম্যাগী ও লালমুখোও উঠেছিল চমকে।—এই তো মাষ্টার গ্রেগ। দুজনেই বলে উঠল একসাথে।

আসলে এ দুজন এসেছিল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। আতো নামে একজনের হয়ে তারা কাজ করছিল। বহুদিন আগে মাষ্টার গ্রেগ-এর সঙ্গে সে এক অভিযানে বেরিয়ে একটা নিষিদ্ধ নগরীর খোঁজ পায়। সেখানে একটা হীরের কৌটো আছে। তখন তারা এটা আনতে পারেনি। পরে মাষ্টার গ্রেগ সেখানে যাওয়ার একটা ম্যাপ তৈরী করে। তারপরে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। কিন্তু তার ধারণা তা নয়। ম্যাপটা সে গোপনে রেখে একাই সে হীরেটা আত্মসাৎ করবে। আতো তা হতে দেবে কেন? তাই সে যেভাবেই হোক ম্যাপটা নেবেই। আর মাষ্টার গ্রেগ যে নিখোঁজ হয়নি তা তো চোখের উপরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মাষ্টার গ্রেগকে দেখে ম্যাগী লালমুখোকে বলল—দেখলে তো নিখোঁজ হয়নি সে। তার কাছেই ম্যাপটা আছে। দাঁড়াও, একটা চিঠি লিখে আমাদের ঘরে আনাই। তারপরে তাকে কৌশলে বন্দী করে আতোর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

তাই করল সে। একটা নিগ্রো ছেলের হাতে চিঠিটা দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই।

দার্নো বলল—আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

টারজান বলল—দাঁড়াও, দেখেই আসি। বলে সে চলে গেল তাদের ঘরে।

ম্যাগী তো তাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। বলল—চলুন, চলুন পাশের ঘরে।

গর্জে উঠল টারজান——তোমাদের আমি চিনি না।

—চেনেন, চেনেন। বলে লালমুখো হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে একটা পিস্তল দেখিয়ে বলল—চলুন, পাশের ঘরে।

অগত্যা টারজানকে যেতেই হল। গিয়েই সে দেখল আতোকে।

—এস, এস মাষ্টার গ্রেগ। অভ্যর্থনা জানাল আতো।

—আমি গ্রেগ নই। গর্জে উঠল টারজান।

—যাগগে, যেই হও, ম্যাপটা দাও। গর্জে উঠল আতোও। নিষিদ্ধ নগরীতে যাওয়ার পথনির্দেশ যেটাতে আছে সেটা। যদি ভালয় ভালয় না দাও তবে লালমুখো—। বলতেই ছুরি হাতে এগিয়ে এল লালমুখো।

ছুরি দেখেই টারজান গেল ক্ষেপে।—তবে রে! বলেই হঠাৎ সে লালমুখোকে তুলে ধরে দিল এক আছাড়।

ঘাবড়ে গিয়ে আতো করল গুলি। কিন্তু ম্যাগীর হাত লেগে গুলিটা গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। তারপর আতো কি আর দাঁড়ায়? ম্যাগীকে টেনে নিয়ে হাওয়া। ছুটে গেল টারজান। কিন্তু পেল না। ফিরে এসে দেখে লালমুখোও নেই।

গুলির শব্দ শুনে দার্নোও চলে এসেছিল। টারজান তখনও রাগে ফুঁসছে। বলল—এ লোকগুলি ভারী পাজী। আমার কাছে একটা ম্যাপ চাইছিল। নিষিদ্ধ নগরীতে যাওয়ার পথ নির্দেশ।

বলতে বলতে সে চলে এল ঘরে। এসেই মিঃ গ্রেগকে জিজ্ঞেস করল—জানেন নাকি কিছু? কিসের ম্যাপ?

মিঃ গ্রেগ বললেন—আমি আমার ছেলেকে চাই। তবে একটা ম্যাপ আছে বটে কিন্তু সেটা নিঁখুত নয়। তারপরেই তিনি সব বললেন টারজানকে। নিষিদ্ধ নগরীর দিকেই যাব আমরা। আমার ধারণা সেখানে গেলেই ছেলের খোঁজ পাব। সামনের একটা বন্দর থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করব। প্রথমে ফক্স নামে একটা লোককে এই অভিযানের ভার দেওয়া হয়েছিল এখন তুমি এসেছ, তুমিই নেবে এই ভার।

—কেন? টারজান বলল—লোকটা যদি শিকারের জন্য আসতে আসতে চায় আসুক না।

আসলে ফক্স ছিল আতোরই লোক। আতোই পাঠিয়েছিল তাকে তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে যদি ম্যাপটা উদ্ধার করতে পারে। তার আড্ডাটাই ছিল বাজার অঞ্চলে একটা চীনের দোকানে।

তার পরদিন ফক্স এসে টারজানকে দেখে মনে মনে রেগে গেলেও মুখে প্রকাশ করেনি সে। তবে সে যে একটা বন্য লোক এটা বলতে সে ছাড়েনি। হেসে বলেছিল—আরে দূর দূর, তাকে দিয়ে কি হবে? যাকগে, পথনির্দেশের ম্যাপটা একটু দেখি। বুঝে নিই পথটা।

কোন সন্দেহই করলেন না মিঃ গ্রেগ। ড্রয়ার খুলে ম্যাপটা বের করতেই সে আগ্রহ করে ঝুঁকে পড়ল এটার উপর। তারপর এক সময় সে এটা ভাল করে বুঝবার জন্য নিতে চাইলে তিনি বললেন—না, এটা তো দিতে পারব না। নৌকো করে বন্দরে যাওয়ার সময়ই এটা দেখার সময় পাবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো, ঠিকই তো। বলে কেটে উঠেছিল ফক্স। কিন্তু মন পড়ে রইল তার ড্রয়ারটার উপর।

নজর কারোরই কম নেই এটার উপর। আতো তো ছলে বলে কৌশলে মিস গ্রেগকে বন্দীই করল চীনের দোকানে। জিনিস

কেনা-কাটা করতে এসেছিল সে। তারপরেই সে পড়েছিল ধরা। তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে মিঃ গ্রেগকে পাঠিয়ে দিয়েছিল—ম্যাপটা না দিলে তার মেয়ে ছাড়া পাবে না। বিক্রী করে দেবে দূর দেশে।

কিন্তু গ্রেগ তখন ম্যাপ পাবে কোথায়? তার আগেই সেই ফক্স চুরি করে নিয়ে গেছে এটা। হতাশ গ্রেগ একটা চিঠিতে জানিয়েও দিল আতোকে, ম্যাপটা চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু সে বিশ্বাস করলে তো? মিস গ্রেগ গেল ঘাবড়ে। তবে কি সে ছাড়া পাবে না?

ঠিক এমন সময়েই ফক্স ম্যাপটা নিয়ে এসে পাঁচশ পাউণ্ডে বিক্রী করলে ম্যাগী আতোকে বলল—এখন তো মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে পার। ম্যাপ পেয়েছ, কথা দিয়েছিলে তুমি।

হা হা করে হেসে উঠল আতো।—তুমিও যেমন। ম্যাপ পেয়েছি, চলে যাব নিষিদ্ধ নগরীতে। মেয়েটাকে ছাড়ার কি হল? আমি ভাবছি তাকে রেখেই দেব। তাছাড়া, যাকগে, তুমি যেভাবেই হোক তাদের দলে চলে যাও। বলা তো যায়, না ইচ্ছে করে তো আর তারা ম্যাপ দেয়নি। মেয়েটিকেও পায়নি। আমাদের ধরতে যেতে পারে। যাকগে, বলে সে ফক্সের দিকে তাকিয়ে বলল—ফক্স! তুমি যেতে পার। মনে রাখবে। তারা যেন ভুল পথে যায়।

—আচ্ছা আচ্ছা। বলে চলে গেল ফক্স।

সে চলে গেলে ম্যাগীকে ডেকে আতো আবার বলল আর শোন ম্যাগী, তুমিও চলে যাও তাদের সঙ্গে। চেষ্টা করবে তারা যেন ভুল পথে যায়। ফক্সকে বলেছি বটে, তবে বিশ্বাস করি না তাকে।

বন্দর থেকে সপ্তাহে দুটো ষ্টীমারই ছাড়ে। প্রথম ষ্টীমারটাতেই যাবে মিঃ গ্রেগ সবাইকে নিয়ে। আরও একদিন বাকী ষ্টীমার ছাড়বার। কিন্তু আতো করল কি সেদিন দুপুর রাতেই ক্যাপ্টেনকে ঘুষ দিয়ে চলে গেল ষ্টীমার নিয়ে, সঙ্গে লালমুখো।

ম্যাগীর কছেই পেল তারা এ খবর। তার পরদিন দুপুরেই এসে বলেছিল তাদের মিস গ্রেগ-এর কথা। তারা তাকে নিয়ে চলে

গেছে। সেও তাদেরই দলে ছিল। কেন যে সে দল ছেড়েছে তা সে বলতে চায় না এখন।

মিঃ গ্রেগ তো শুনে হতাশ হয়ে পড়লেন। ছেলে গেল, এখন মেয়েও যে যায়। আতোকে ধরার আর কি উপায়? পরের ষ্টীমারে যেতে আতো তখন কত দূরে।

দার্নো বলল—দাঁড়ান, দাঁড়ান, এত ভাববার কি আছে? ব্যবস্থা করছি আমি। বলে সে তক্ষুণি চলে গেল কোথায়। একটু পরেই এসে বলল—নিন, ঠিক হয়ে নিন, প্লেন এসে গেছে।

—প্লেন? সবাই চিৎকার করে উঠল এক সাথে।

বিপদ গুনল ফক্স, সেরেছে, প্লেন নিয়ে এল হতভাগা? এখন আতোর আগেই তো চলে যাবে এরা। ইস, যদি একটা ঝড়টড় কিছু হতো।

হ্যাঁ, তার ভাগ্যই বলতে হবে। তারা নির্বিঘ্নেই যাত্রা করেছিল, কিন্তু ঝড়ের দাপটে নামতে হল তাদের জঙ্গলের ভিতর একটা লেকের ধারে। এই জায়গাটা অবশ্য তার আগের দিনই পেরিয়ে গিয়েছিল আতো, লালমুখো ও মিস গ্রেগকে নিয়ে। ষ্টীমার তো আর এতদূর আসে না। হেঁটেই পেরোতে হয়েছিল তাদের কিন্তু টারজানের দল তো আর জানে না। পাইলট চেষ্টা করেও আর চালাতে পারল না প্লেন। অগত্যা এখানেই তাঁবু গাড়ল তারা। হেঁটেই না হয় যাবে এখান থেকে।

টারজান ইতোমধ্যে জায়গাটা কোথায় একটু দেখে শিকারও করে নিয়ে এসেছে। মনের আনন্দেই খাওয়া দাওয়া করছে, হঠাৎ টারজান বলল, আরে ম্যাগী কই?

সত্যিই তো, কেউ তো দেখেনি।

টারজান তখনি ছুটে গিয়ে দেখল একটা সিংহের খপ্পরে পড়েছে সে। একটু পরে হলেই সিংহটা খেয়ে ফেলবে তাকে। টারজান তক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহটাকে শেষ করে উদ্ধার করল ম্যাগীকে।

তারপর সেদিনই টারজানের কথায় তারা ঠিক করল উত্তর-পূর্ব দিকেই এগিয়ে যাবে তারা আতোকে ধরতে। বাঁধা দিল ফক্স—না উত্তর পূর্ব দিকে যাবার দরকার নেই। আমি পথ চিনি।

—পথ চেন? টারজান বিস্মিত হয়ে বলল—এই যে বলেছিলে পথ চেন না।

—মিঃ গ্রেগ যদি এক হাজার পাউণ্ড ও হীরের ভাগ আমাকে দেন তবে আমি নিষিদ্ধ নগরীতে নিয়ে যাব তাকে। হাসল ফক্স।

—শয়তান। বলে টারজান তাকে ছুঁতে যেতেই ঝট করে ফক্স ঘুসি মেরে বসল টারজানকে। রাগে টারজান তক্ষুণি তাকে এক ঝটকায় মাথার উপর তুলে ফেলে ছুঁড়তে যাচ্ছিল মিঃ গ্রেগ এসে বাধা দেন।

যাহোক তখনকার মত ঝগড়া মিটলেও টারজানের মনে সন্দেহটা পাকা হয়ে রইল।

তারপর আরও দুদিন চলে গেছে। ফক্সের পথ নির্দেশেই এগিয়ে চলেছে তারা। সেদিনও বহুপথ এগিয়ে বিকেলবেলা একজায়গায় এসে তাঁবু খাটিয়েছিল তারা। টারজান তো আর বসে থাকে না সে যথারীতি চলে গেছে জঙ্গলে, যদি কোন একটা হরিণ পায়। যেতে যেতে সন্ধেও হয়ে গিয়েছে। ভয়-ডর নেই তার। এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার কানে এল আদিবাসীদের ঢাকের আওয়াজ। সে জানত এ আওয়াজ করে নরখাদক আদিবাসী কোন একজনকে হত্যা করবার সময়। মনে মনে রেগে গেল সে—জানোয়ারের দল, এখনও মানুষ খাস? লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল লোকটাকে দেখে—মিস গ্রেগ? খুঁটিতে বাঁধা?

আর কি সে ঠিক থাকতে পারে। পুরোদমে বাজনা চলেছে হঠাৎ একটা লোক ছুরি নিয়ে মিস গ্রেগের দিকে এগিয়ে যেতেই ঝপ করে সে ছুঁড়ল একটা তীর। পড়ে গেল লোকটা। বাজনা গেল থেমে। আর তারপরেই পড়ে গেল আর কয়েকটা ত্রাস সৃষ্টি।

হয়ে গেল।' আদিবাসীদের মধ্যে। আর তখনি সে তাদের মাঝে নেমে দিয়ে উঠল হুঙ্কার। পড়িমড়ি করে ছুটল তারা ভয়ে—অরণ্য দৈত্য এসেছে, অরণ্য দৈত্য।

এই ফাঁকে সে মিস গ্রেগকে কাঁধে তুলে ছুট, গাছের ডালে ডালে।

সেদিন রাত্রিতে টারজানের জন্য সবাই ভেবে অস্থির। কি হল তার? সারারাত ফিরে এল না?

পরদিন ভোরে সবাই প্রাতরাশ খাচ্ছে এমন সময় মিস গ্রেগকে নিয়ে টারজান এসে হাজির। তার বাবা তো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। ঘিরে দাঁড়াল সবাই। মিস গ্রেগ খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বলল সব কথা।

আতো ও লালমুখো তাকে বন্দী করে নিয়ে চলেছিল নিষিদ্ধ নগরীর দিকে। পরশু রাত্তিরে এক সুযোগে সে পালায় জঙ্গলে। কোথায় যে যাচ্ছিল কিছুই জানত না সে। সারারাত ঘুরেছে জঙ্গলে। ভোরবেলায় পড়ে নরখাদকদের কবলে। সারাদিন বন্দী করে রেখে সন্ধেবেলায় তাকে খুঁটিতে বেঁধে হত্যা করতে যাচ্ছিল এমন সময় টারজান এসে তাকে বাঁচায়। ম্যাপটা সে পেয়েছে। ঐ ফক্সই তাকে বিক্রী করেছে।

—কি? ফক্স? বলেই ছিটকে উঠল টারজান। একলাফে তার ঘাড়টা ধরে সে বলল—কি ফক্স? কি বলবে তুমি?

কি আর বলবে ফক্স। চুপ করেই রইল। টারজান তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে মিঃ গ্রেগকে বলল—এই লোকটাকে এখনি তাড়িয়ে দিন দল থেকে। সে-ই এতদিন আমাদের ভুল পথে নিয়েছে।

—কিন্তু এখানে আমি কোথায় যাব? কাতরে উঠল ফক্স।

—ঠিক আছে। টারজান বলল—পরে যা হবার হবে। তবে পথ প্রদর্শকদের কাজ আর তোমার করতে হবে না।

সেদিন বিকেলে টারজান আবার ছুটে গিয়ে আতোর দলটার

খোঁজ নিয়ে এসে বলল—আতোর দলটা এখান থেকে বহুদূরে। ভুল পথে এসেছি আমরা ঐ শয়তানটার জন্য।

যাহোক করার কিছু নেই। আবার চলল তারা। দিনের পর দিন। কিন্তু গেরোর কি আর শেষ আছে?

আর একদিন একদল গরিলা এসে সব তছনছ করে ম্যাগীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। তখন টারজান শিবিরে ছিল না। পরে সে শুনে ছুটে গিয়ে ম্যাগীকে উদ্ধার তো করলই, সেই দলটিকে অনুগত করে নিজেই হয়ে গেল তাদের রাজা।

এদিকে আতোর দলও পড়েছিল মুস্কিলে। অনেকটা এগিয়ে এসেছিল এরা। আর একটা পাহাড় পেরিয়ে গেলেই নিষিদ্ধ নগরী। কিন্তু তার দলের মোট বাহকের দল পাহাড়টার কাছে এসে আর যেতে চাইল না। তাদের ভয় নিষিদ্ধ নগরীতে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না তারা। তাই সেদিন রাত্রেই আতো ও লালমুখো ঘুমিয়ে পড়লে সব মালপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল তারা। কি আর করবে আতো? তার পরদিন লালমুখোকে নিয়ে একাই চলল নিষিদ্ধ নগরীর দিকে। কিন্তু পথ এত সঙ্কীর্ণ যে যাওয়া মুস্কিল। পাশে খরস্রোতা নদী। লালমুখো তো ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু আতো কি আর ফিরতে চায়? সে এগিয়ে চলল পাহাড়ের সেই পথেই। কিন্তু ফিরতে তাকে হলই। আর যাওয়া অসম্ভব বলে ফিরে আসছিল সে, পরে লোকজন নিয়ে আবার আসবে। কিন্তু সে পথেও পড়ল বাধা। কোত্থেকে একদল সাদা মানুষের দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে তাদের করল বন্দী। লালমুখো তো ভয়ে মরে। কিন্তু আতো তাদের পরিচয় পেয়ে তাকে আশ্বাস দেয়, দূর বোকা, এই তো ভাল হল। এরা তো নিষিদ্ধ নগরীর সৈন্য। আমাদের বন্দী করেছে বটে, কিন্তু নিয়ে তো যাচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীতে। সেখানে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে পারব না? চুপ কর। কি আর করবে লালমুখো? চুপ করেই রইল।

খানিক হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে সাদা সৈন্যের দল তাদের নিয়ে তুলল নদীর উপর এক নৌকোতে। কুড়িজন ক্রীতদাস বাইছিল দাঁড়।

বন্দী হয়ে লালমুখো তো ঘাবড়ে গিয়েছিলই, আতোও যে ঘাবড়ায়নি তাও নয়। তবে মুখে তার সাহসের অভাব ছিল না। সে এক সময় যেতে যেতে সৈন্যদের জিজ্ঞেস করল—তোমরা আমাদের বন্দী করলে কেন? কি করবে আমাদের নিয়ে?

—তা জানি না। সৈন্যরা বলল—যা করবার রাণীই করবেন। তোমরা নিষিদ্ধ নগরীর সীমানায় ঢুকেছ তাই বন্দী করেছি তোমাদের।

ইতোমধ্যে নদী ছেড়ে নৌকো গিয়ে পড়েছে হ্রদে। তার দুপাশে জঙ্গল ও প্রান্তর। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বড় বড় প্রাসাদ।

আতো জিজ্ঞেস করল—এটাই কি নগরী?

—হ্যাঁ।

—এটা কি জলের নীচে? বলে আতো হঠাৎ হ্রদের জলের নীচে একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে বলল—কেমন আলো বেরুচ্ছে জানলা দিয়ে? একটা লোকও যেন চলে গেল বারান্দা দিয়ে?

—হ্যাঁ। সৈন্যরা বলল—এটা মন্দির, জলের নীচে। বেশি কৌতূহল ভাল নয়।

দেখতে দেখতে নগরীর ঘাটে এসে পৌঁছল নৌকো। সৈন্যরা তাদের ধরে নিয়ে গেল এক অফিসারের কাছে নগরীর মধ্যে। অফিসার সৈন্যদের কথা শুনে কি বলতে যেতেই আতো বলল—আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু সৈন্যরা—

—ঠিক আছে। তোমরা সত্য বলছ কি মিথ্যে বলছ জানি না। কিন্তু একবার নগরীর সীমানায় এলে আর ফিরে যাওয়া যায় না। রাণীই ঠিক করবেন তোমাদের কি শাস্তি দেবেন। বলে অফিসার তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্যদের আদেশ করলে আতো বলল—আমরা রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—না। ধমকে উঠল অফিসার। যা বলবার আমাকেই বলতে হবে।

আতোর সাহস আছে বলতে হবে! সে বলল—না, আমরা রাণীকেই বলব।

অফিসার রেগে গিয়ে তাদের তালা বন্ধ করে রাখলেন এক ঘরে।

তাদের ভাগ্য ভাল, কিছুদিনের মধ্যেই রাণী ডেকে পাঠালেন তাদের। তারা এসে রাণীর সামনে দাঁড়াতেই রাণী জিজ্ঞেস করলেন—বিদেশী, তোমরা শত্রু।

—আজ্ঞে না। আতো বলল—আমরাই শত্রুর ভয়ে পালাচ্ছিলাম সৈন্যরা ধরে নিয়ে এসেছে। শত্রুদল এখানে আসছে হীরের কৌটা নিয়ে যাবে বলে।

—কী? চমকে উঠলেন রাণী। বললেন—সৈন্য আছে তাদের সঙ্গে?

—আজ্ঞে না, তবে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে।

—হুম্। রাণী তার এক সামন্তকে বললেন—লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে, তবে তাকে কারাগারে না রেখে নগরের মধ্যে চলাফেরার স্বাধীনতা দেওয়া হোক তবে নজর রাখতে ভুলবে না। বলে তিনি চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রাণী দেখতে সুন্দরী। বয়সও খুব বেশী নয়। কোকড়ানো চুল। মাথায় মুকুট, তাতে সাদা পালক। তার ভাব যেন কেমন গর্বিত, নিষ্ঠুর।

রাণী চলে গেলে সামন্ত তাদের নিয়ে গিয়ে তুলল প্রাসাদেরই একটি ঘরে। বলল—তোমরা নগরে ঘোরাফেরা করতে পারবে।

—মন্দিরটা দেখতে পারব না? আতো বলল।

—না, বেশী কৌতূহল দেখিও না। বলে সামন্ত চলে গেল।

এদিকে টারজানদেরও ঝামেলা কম হচ্ছিল না। এর মধ্যে

আতোর সব মালবাহকরা এসে টারজানদের দলে যোগ দিয়েছিল। টারজান যদিও অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পছন্দ করেনি তবুও বেচারা লোকগুলিকে তখন শাস্তি দিতেও পারছিল না। অগত্যা তখন তাদের দলেও নিয়েছিল।

এরই মধ্যে একদিন টারজান এক নদীর ধারে তাঁবুতে সবাইকে রেখে একা বনের মধ্যে পথ দেখতে গিয়ে দেখে এক সাদা যোদ্ধার সামনে অদ্ভুত একটা সরীসৃপ। এক্ষুণি সরীসৃপটা গিলে ফেলবে লোকটাকে। মুহূর্তে টারজান ছুটে গিয়ে ছুরি বসিয়ে দিল সরীসৃপটার গলায়। আর তারপরেই এটার পিঠে চেপে আরও। লোকটাও তখন তার বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু বিপদের মুখে এক। সরীসৃপটা আর কতক্ষণ থাকে দুজনের অস্ত্রের মুখে? এটা নেতিয়ে পড়তেই যোদ্ধা লাফিয়ে এসে টারজানকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে?

—আমি টারজান। তুমি?

—নিষিদ্ধ নগরীর পাশের রাজ্যে আমার বাড়ী। রাজার ভাইপো।

তারপর তাদের বন্ধুত্ব হতে দেরী হল না। টারজানের সব কথা শুনে যোদ্ধা বল—বন্ধু, তুমি নিষিদ্ধ নগরীতে যেতে চাইছ, অথচ আমি তোমাকে কিছুই সাহায্য করতে পারব না। কারণ তারা আমাদের চিরশত্রু। সেখানে তোমাকে নিয়ে গেলে হয় আমাদের বন্দী করবে, নয় করবে হত্যা। যাহোক দেখি আমাদের রাজাকে বলে কিছু করতে পারি কিনা। অবশ্য আমাদের রাজ্যেও বিপদ তোমার কম নয়। আজ রাতটা গুহায় কাটিয়ে কাল আমি যাব রাজার কাছে। দেখি কিছু করতে পারি কিনা। তিনদিন পরে এসে তোমায় জানাব।

—গুহায় কেন? তুমি আমার শিবিরেই থাকবে, এস। টারজান বলল—আমরা বিদেশীকে শত্রু ভাবি না।

খুব খুশি হয়েই টারজান নিয়ে এল যোদ্ধাকে শিবিরে। খুশি

হল সবাই। কিন্তু রাত যেন আর কাটে না। হঠাৎ রাত্তিরে আরম্ভ হল তাণ্ডব। কোত্থেকে কতগুলিলোক এসে ভয় দেখাতে আরম্ভ করল তাদের। ভয় পেয়ে গেল সবাই। কিন্তু টারজান ভয় পাবার ছেলে নয়। এক ছুটে একটা ধরে এনে দেখে নিষিদ্ধ নগরীর এক যোদ্ধা।

ইচ্ছে করলে টারজান যোদ্ধাটাকে নিকেশ করে ফেলতে পারত, কিন্তু সে তা না করে তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল—তোমাদের নগরীতে গিয়ে বল আমরা শত্রু নই, বন্ধু। হীরের জন্য আসিনি। এসেছি একজনের খোঁজে, সে মাষ্টার গ্রেগ।

কিন্তু অসৎ লোক কি কথা শুনে? সে ছুটে চলে যেতে যেতে চীৎকার করে বলল—গ্রেগকে আর কোনদিন পাবে না তোমরা।

বলেও শেষ করেনি সে হঠাৎ একটা মেয়েলী চীৎকার শুনে মিঃ গ্রেগ বলে উঠলেন—আরে, আমার মেয়ে?

—অ্যাঁ! বলে টারজান চমকে উঠে বলল—তবে কি হতভাগারা চুরি করে নিয়ে গেছে তাকে? বলেই সে সেই যোদ্ধাকে নিয়ে ছুটে গিয়ে ধরল সব কটাকে। ছুটল সবাই।

মিস গ্রেগকে তারা নৌকোয় তুলেছিল বটে, কিন্তু তখনও ছাড়তে পারেনি নৌকো।

তারপর সব কটাকে কচুকাটা করতে কতক্ষণ? তবে একটা গিয়েছিল পালিয়ে। তা যাক। নৌকোটা দখল করেছে এরা ক্রীতদাসগুলিসহ। তারাই তো বাইছিল দাঁড়।

তারপর তারা মিস গ্রেগকে নিয়ে শিবিরে ফিরে এসেই শোনে ম্যাগীকে নিয়ে কক্স পালিয়েছে।

—সে কি! ম্যাগী পালিয়েছে? চীৎকার করে উঠল মিস গ্রেগ।

আসলে ম্যাগী কিন্তু পালায়নি। এই তাণ্ডবে ভয় পেয়ে হীরের লোভ মাথায় উঠে গিয়েছিল কক্সের। সে তখন ম্যাগীকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই চলে এসেছিল ম্যাগী

ছুটতে ছুটতে।—খুন করে এসেছি, খুন করে এসেছি ফল্লকে তার পিস্তল দিয়ে। বলেই সে মুর্ছিত হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি মিস গ্রেগ তাকে ধরে শুইয়ে দিল বিছানায়।

সে একটু সুস্থ হলে সাদা যোদ্ধা টারজানকে বলল—আমি ভাবছি নৌকো যখন পাওয়া গেল তখন আর দেরি করে লাভ কি? তার চেয়ে আজই চল তোমরা সবাই আমার সঙ্গে।

তার কথায় সবাই রাজী হয়ে মোটবাহকদের বিদায় করে মালপত্র নিয়ে সবাই গিয়ে উঠল নৌকোয়। তাদের সাহায্য করলে মুক্তি পাবে এই কথায় ক্রীতদাস নাবিকরাও রাজী হল টারজানদের নিয়ে যেতে নিষিদ্ধ নগরীর পাশের রাজ্যে।

যত সহজে তারা চলে যেতে পারবে ভেবেছিল তত সহজে কিন্তু যাওয়া হল না তাদের। খানিকদূর এগিয়েই তারা হল আক্রান্ত নিষিদ্ধ নগরীর সৈন্যের হাতে। কয়টা নৌকো নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর। শিবিরে তাণ্ডবের পর যে যোদ্ধাটা পালিয়ে গিয়েছিল সে-ই তাদের নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তবুও তাদের হাতে তো পুরনো সব অস্ত্র, তারা পারবে কেন টারজানদের রাইফেলের সামনে? তুমুল লড়াইয়ের পর টারজানদের নৌকো উল্টে দিয়ে দার্নো ও মিস গ্রেগকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তারা।

কি আর করবে তারা? কিন্তু বাপের মন, এত সহজে কি শান্ত হয়? তবু যাহোক, বন্ধুর রাজ্যের রাজার সাহায্যে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে তাকে এই সান্ত্বনা দিয়ে চলল তারা। কিন্তু তার পরদিন সকালে নদীর ঘাটে পৌঁছেই আরেক বিপদ। সেই দেশের যোদ্ধারা কোন কথাই শুনতে চাইল না তাদের। বন্দী করে তাদের নিয়ে গিয়ে তুলল রাজার সামনে।

রাজা তো বিদেশীদের দেখেই রেগে গর্জন করে উঠলেন।
—তোমরা শত্রু।

—আজ্ঞে না। তাদের হয়ে তার ভাইপোই এগিয়ে এসে বলল

—আজ্ঞে, তারা শত্রু নয়, বন্ধু। এই তো সেদিনই এই লোকটা—বলে সে টারজানকে দেখিয়ে বলল—আমাকে নিজের জীবন বিপন্ন করে সরীসৃপের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। শত্রু হলে কি তা কেউ করে ?

—হুম্। রাজা যেন একটু নরম হলেন। বললেন—বেশ মানলাম। কিন্তু তবুও তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, তাদের বাঁচার একটা সুযোগ দেব। আমার তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে তাদের। একটা হল, তাদের একজনকে নিষিদ্ধ নগরীর একজন যোদ্ধাকে লড়াই করে হত্যা করতে হবে খালি হাতে। দুই, একজনকে বধ করতে হবে একটা সিংহ। আর তিন, নিষিদ্ধ নগরীর মন্দির থেকে হীরের কৌটো নিয়ে আসতে হবে।

হতাশ হয়ে পড়ল রাজার ভাইপো। কিন্তু টারজান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ঘাবড়াও কেন ? আমি ঠিক পূরণ করব রাজার শর্ত।

দরবার ভঙ্গ হতেই সৈন্যেরা এসে নিয়ে গেল তাদের কারাগারে। কিন্তু ম্যাগীকে পাঠিয়ে দিল অন্দর মহলে। তারা বুঝতে পারল না তাকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল কেন সৈন্যেরা।

যাহোক তার পরদিন ভোরেই লাগল সেই লড়াই নিষিদ্ধ নগরীর পালোয়ানের সঙ্গে টারজানের। উদগ্রীব হয়ে আছে সবাই, কি হয় কি হয়। দশাসই চেহারা পালোয়ানের।

সে এসে জড়িয়ে ধরল টারজানকে। টারজান নির্বিকার। যেন খেলা করছে সে। পরিশ্রান্ত হয়ে সে টারজানকে ছেড়ে দিতেই ঝট করে টারজান তাকে মাথার উপর তুলে দিল এক আছাড়। পালিয়ে বসে পড়ল পালোয়ান, কিন্তু টারজান গেল তেড়ে। তখন সে নিজেই নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সবাই অবাক। রাজা টারজানকে দিলেন স্বাধীনতা। রাণী করলেন প্রশংসা।

টারজান তখন মাথা তুলে দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করতে চাইলে রাজা

তো অবাক। বললেন—তুমি কেন? এটা তো করবে তোমাদের দলের আর একজন।

টারজান অটল। সেই করতে চায় সব শর্ত পূরণ।

রাণী তাকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠালেন বোঝাবার জন্য। রাজা ফেললেন দেখে।—কি? অন্দরমহলে যায় টারজান? তিনি তক্ষুণি আদেশ দিলেন, একটা না দুটো সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তার।

টারজান রাজী। তার পরদিন দুটো সিংহকেই হত্যা করল সে। তবে দ্বিতীয়টার বেলায় ঝুঁকে দেখতে গিয়ে রানীও পড়ে যায় সেই গর্তে। টারজান রাণীকেও রক্ষা করেছিল। তাতে রাজা ও রাণী দুজনেই খুশি হয়ে সবাইকে মুক্তি দিয়েছিল। তবে নগরের বাইরে যেতে পারবে না। তারপর টারজান কিন্তু তৃতীয় শর্ত পূরণের জন্য চলে গিয়েছিল নিষিদ্ধ নগরীতে পাইলটকে নিয়ে। রাজার ভাই পো নগরপ্রান্তে গিয়ে বিদায় দিয়ে এসেছিল তাদের।

নিষিদ্ধ নগরীর কাছে গিয়ে একটা গুপ্ত পথেই এগিয়ে চলল টারজান পাইলটকে নিয়ে। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলছিল তারা। হঠাৎ টারজান একজায়গায় অবাক হয়ে দেখে দার্নো, মিস গ্রেগ ও অন্য দুইজন লোককে ঘিরে ধরছে কতগুলি নিষিদ্ধ নগরীর যোদ্ধা। টারজান তখনি আড়াল থেকে মারল এক তীর। পড়ে গেল যোদ্ধাটা। ঘাবড়ে গেল যোদ্ধারা। কিন্তু তবুও কি তারা দার্নোদের ছাড়ে? আবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই, টারজান আবার ছুঁড়ল তীর। আবার পড়ল আর একটা যোদ্ধা। আবার, আবার। ধরাশায়ী হল সবাই। টারজান তখন হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো দার্নো।—টারজান তুমি? মিস গ্রেগ বল—বাবা কোথায় ম্যাগী?

তারা পাশের রাজ্যে বন্দী। তবে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে নগরে। কিন্তু তোমরা?

—সে অনেক কথা। দার্নো বলল—মিস গ্রেগ-এর জন্যই পালাতে

পেরেছি আমরা। আমাদের বন্দী করে আমাকে নিয়ে রেখেছিল



এদের নীচে মন্দিরের পাশে একটা খাঁচায়। আর মিস গ্রেগকে নিয়ে

গিয়ে মন্দিরের এক পুরোহিতের সঙ্গে দিল বিয়ে। সেই পুরোহিতের কাছেই থাকত খাঁচার চাবি। মিস গ্রেগ তারপর এক সুযোগে পুরোহিতকে হত্যা করে চাবি নিয়ে এসে খুলে দেয় আমাদের। মানে,—বলেই দার্নো পাশে দাঁড়ানো একজনকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, ইনি নিষিদ্ধ নগরীর একজন পুরোহিত, আর এই হল মাষ্টার গ্রেগ।

—আচ্ছা, আচ্ছা। টারজান যেন খুশিতে লাফিয়ে উঠল।—যাহোক, তোমরা এখানে থাক আমি আসছি। এস পাইলট।

—কোথায়? কোথায় যাচ্ছ তুমি? দার্নো এসে বাঁধা দিল তাকে।

টারজান বলল—হীরের কৌটো ও প্রধান পুরোহিতটাকে ধরে আনতে। তবেই মিঃ গ্রেগ ও ম্যাগীকে মুক্ত করতে পারব।

—তাহলে আমরাও যাব। সবাই বলে উঠল একসাথে।

টারজান কাউকেও এড়াতে পারল না। নিতেই হল সবাইকে তার সঙ্গে। এগিয়ে চলল সবাই আবার নিষিদ্ধ নগরীর দিকে। কিন্তু খানিকটা গিয়ে টারজান বলল—তোমরা এক কাজ কর। এখানে পাহাড়ের ধারে তোমরা লুকিয়ে থাক। পুরোহিত এখানকার সব কিছু চেনে, জানে। তাকে নিয়েই আমি যাব। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব আমি আর। যদি না ফিরি তবে তোমরা এই গুপ্ত পথেই বেরিয়ে যাবে। আমাদের খোঁজ করবে না।

দার্নো বলল—হীরের কৌটো কি আনতে পারবে?

—কেন পারবে না? পুরোহিত বলে উঠল—চাবি তো আমার কাছে। বলেই সে টারজানের হাত ধরে বলল—চল।

—কেন? আমি গেলে ক্ষতি কি? দার্নো বলল।

—না ভাই টারজান তার কাঁধে হাত রেখে বলল—তুমি তাদের সহায় হবে। বলে সে তাড়াতাড়ি পুরোহিতকে নিয়ে চলে গেল।

গুপ্ত পথ থেকে বেরিয়ে সুড়ঙ্গ পথে যখন টারজান ঢোকে তখন সে একজন সৈন্যের চোখে পড়ে যায়। আর মন্দিরে উঠার মুখেই

তারা পড়ে ধরা। এদিকে সৈন্যদের সন্দেহ হওয়াতে গুপ্ত পথে গিয়ে পেয়ে যায় সবাইকে। তখন তারা আবার সবাইকে বন্দী করে রাখে খাঁচায়। টারজান তো থ। সে ভাবল, 'এত চেষ্টা করেও পড়লাম ধরা ?

এমন সময় সামনের এক খাঁচা থেকে কে একজন বলে উঠল—হীরের কৌটো, হীরের কৌটোটা আমার।

অবাক টারজান তাকিয়ে দেখে আতো। আরে, এ কি করে এল ? পাশেরটায় লালমুখো ?

বেশি লোভেই তাদের এই শাস্তি। রাণীর সামন্তের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাণীকে হত্যা করতে গিয়ে লালমুখো পড়ে ধরা। আর তারপরেই বেরিয়ে যায় তাদের ষড়যন্ত্রের কথা। রাণী তাদের তিনজনকেই তখন করেন বন্দী।

রাণী এই বিদেশীগুলির উপর এতই চটে গিয়েছিলেন যে তিনি নিজেই চলে এসেছিলেন মন্দিরে তাদের শাস্তির আদেশ দেবেন বলে। তিনি কিছুক্ষণ বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা যে অপরাধ করেছ তার শাস্তি কি জান ? বলেই তিনি পুরোহিতদের ডেকে বললেন—যাও, মেয়েটি পুরোহিত হত্যা করেছিল বলে তাকে হত্যা কর জলে ডুবিয়ে। আর অন্যদের দেবে বলি। যাও। বলেই রাণী চলে গেলেন।

রাণী চলে যেতেই ডুবুরীর পোষাক পরা দুজন পুরোহিত মিস গ্রেগকে একটা ডুবুরীর পোষাক পরিয়ে টেনে নিয়ে গেল জলে, মন্দিরের নীচে একটা ঘরে। মন্দির হয়ে গেল ফাঁকা।

বন্দী পুরোহিত তখন ফিসফিস করে তার খাঁচা থেকে টারজানকে বলল—তাকে নিয়ে গেল মন্দিরের নীচের ঘরে। সেখানে বন্দী করে জল ঢুকিয়ে দেবে ধীরে ধীরে। যদি পার এখনই করতে হবে কিছু। না হলে আর সময় পাওয়া যাবে না।

—দাঁড়াও। এতবড় আস্পর্দা এগুলির ? বলেই টারজান

অমানুষিক শক্তিতে লোহার শিক বাঁকিয়ে বেরিয়ে এসে পুরোহিতকেও বের করে আনল সে।

—এস। বলে পুরোহিত তখন টারজানের হাত ধরে চুপিচুপি গিয়ে দুটো ডুবুরীর পোষাক পরে, একটা পোষাক মিস গ্রেগ-এর জন্য নিয়ে ছুটল জলে।

অল্পের জন্য রক্ষা পেল মিস গ্রেগ। ঘরটা প্রায় জলে ভরে উঠেছিল। ঘরে একটা মই ছিল। সে মইয়ের শেষ মাথায় উঠে ছাদে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় ছাদের একটা আলোর ঢাকনা ভেঙ্গে টারজান তাকে উদ্ধার করে, ডুবুরীর পোষাকটা পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ডুব দিল জলে। হতভম্ব মিস গ্রেগ। কে যে তাকে রক্ষা করল, কেন? কিছুই জানে না সে। কথা বলারও উপায় নেই জলে। কিন্তু এত সহজে বিপদ কি যায়? ডুবুরীর পোষাক চুরি গেছে বলে সন্দেহ হওয়াতে ছয়জন ডুবুরী পুরোহিত ছুটে এল তাদের ধরতে। কিন্তু এত সহজ টারজানকে ধরা? সে চট করে একজনের হাত থেকে একটা ত্রিশূল নিয়ে সবকটাকেই নিকেশ করে দিল মুহূর্তে। তারপর তারা নিরাপদে গিয়ে উঠল হ্রদের কূলে। তখনই মিস গ্রেগ চিনতে পারল টারজানকে। বলল টারজান তুমি?

—হ্যাঁ।

—আর তারা কোথায়?

—দাঁড়াও। আনব সবাইকে। বলে টারজান আবার জলে লাফিয়ে পড়তে যেতেই পুরোহিত বলল—যাচ্ছ কোথায়?

—একটা নৌকোর খোঁজে। নিষিদ্ধ নগরীর ঘাট থেকেই নিয়ে আসব নৌকো। দাঁড়াও না। বলে টারজান দিল জলে লাফ। কারোর কথাই সে শুনল না। এদিকে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে।

খানিক সাঁতরে গিয়েই সে দেখে একটা নৌকো আসছে এদিকে

মশাল জালিয়ে। সে দিল ডুব। কি জানি, যদি নিষিদ্ধ নগরীর হয় নৌকাটা। কিন্তু তার ভাগ্য, তার বন্ধু সাদা যোদ্ধাই নিয়ে এসেছিল নৌকোটা? কয়েকটা ক্রীতদাসের খোঁজে বেরিয়েছিল তারা।

তার বন্ধু তাকে দেখে তো মহাখুশি। তাকে নৌকোয় তুলে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছ তুমি এই রাতে?

—একটা নৌকো চুরি করে আনতে নিষিদ্ধ নগরীর ঘাট থেকে। আমার বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে নগরীতে। তাদের মুক্ত করতে হবে না? নিতে হবে না হীরের কৌটো? নাহলে তোমাদের নগরী থেকে মুক্ত করব কি করে আমাদের বন্ধুদের?

—আরে তোমার বন্ধুরা আমাদের নগরী থেকে পালিয়েছে। ক্ষেপে গেছে রাজা।

টারজান তো অবাক!—পালিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—যাকগে, তাহলেও তো নৌকো আমার চাই। যেতেই হবে আমাকে।

—ঠিক আছে। তার বন্ধু বলল—তাহলে চল আমিই দিয়ে আসি তোমাকে নিষিদ্ধ নগরীর ঘাটে।

—না, না, আমি একা যাব কি? টারজান বলল—আমার দুজন বন্ধু আছে এখানে, তাদের নিয়ে যাব।

—চল তাহলে। বলে সাদা যোদ্ধা নৌকো নিয়ে এসে ভিড়াল কূলে।

তারপর সবাইকে নিয়ে আবার ছাড়ল নৌকো। হ্রদের মাঝামাঝি গিয়েই তারা দেখে তীরবেগে কয়টা নিষিদ্ধ নগরীর নৌকো আসছে ছুটে। একটু আগে তাদের নৌকোর মশালের আলো দেখেই নিষিদ্ধ নগরীর সৈন্যরা আসছিল ছুটে।

টারজান তখনি পুরোহিত ও মিস গ্রেগকে ডুবুরীর পোষাকগুলি পরতে বলে নিজেও একটা টেনে নিয়ে সাদা যোদ্ধাকে বলল—ভাই,

যেমন করেই পার নিজেকে রক্ষা কর। আমরা এখানেই নেমে যাব জলে। বলেই সে দুজনকে নিয়ে নেমে গেল জলে। কিন্তু অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। আন্দাজ করে মিস গ্রেগ-এর হাত ধরে জল কেটে চলেছে সে, পাশে পুরোহিত। কতদূর এসেছে তারা জল কেটে কিছুই জানে না টারজান, হঠাৎ মনে হল পুরোহিত নেই সঙ্গে। কোথায় গেল সে? মিস গ্রেগ-এর হাত ধরে সে কূলে গিয়ে উঠে দেখল সত্যিই তাই। কোথাও নেই পুরোহিত। অথচ তাকে ছাড়া তো যাওয়া যাবে না অন্ধকারে। তাই সে মিস গ্রেগকে বলল—মিস, আজ যাওয়া যাবে না অন্ধকারে। বলে সে কূলে উঠেই রাতটা কাটাল।

ভোর হতেই আবার জলে। খানিকটা গিয়েই সে পেয়ে গেল পুরোহিতকে। তাদের খোঁজেই আসছিল সে। তারপর তিনজনেই আবার চলল মন্দিরের দিকে। কিন্তু খানিকটা গিয়ে জলে ডোবা একটা নৌকো দেখে পুরোহিত লাফ দিয়ে নৌকোটাতে মণিমুক্তাখচিত কি একটা কৌটো নিয়ে এসে নাচতে লাগল জলের তলায়। বুঝতে পারল না টারজান, কি হল তার? সামনেই মন্দির। সে তখন সবাইকে নিয়ে কূলের উপর একটা ফাঁকা জায়গায় উঠে বলল—টারজান পেয়েছি আমি হীরের কৌটো।

—হীরের কৌটো পেয়েছ? টারজান অবাক!

হ্যাঁ, নৌকোটা দেখেই চিনেছি। এটাতে করেই এসেছিলাম আমরা হ্রদ ঘুরতে। প্রতি বছরই আসতে হতো। কিন্তু রাণীর যোদ্ধারা আক্রমণ করে ডুবিয়ে দেয় নৌকোটা। হীরের কৌটোটা তারা নিতে পারেনি। তারপরেই তো আমাকে নিয়ে গিয়ে তারা বন্দী করে রাখে। যাকগে, এখন রাত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। রাত হলে যখন পুরোহিতরা উপাসনা করতে যাবে তখন ফাঁকা মন্দিরে গিয়ে আমরা বন্দীদের মুক্ত করব। মিস গ্রেগকে রেখে যাব একটা জায়গায়।

সারাদিনই তারা লুকিয়ে কাটিয়ে সন্ধে হতেই আবার দিল ডুব। কিন্তু মিস গ্রেগকে একজায়গায় বসিয়ে হীরের কৌটোটা তার কাছে মাটিতে রেখে টারজান ও পুরোহিত চলে গেল মন্দিরের দিকে। গিয়ে দেখে মন্দির ফাঁকা। এই সুযোগ। তারা তক্ষুণি তাদের ত্রিশূলে ছুটো মাছ গেঁথে ডুবুরীদের ঘরের ভিতর দিয়েই চলে গেল বন্দীদের খাঁচার দিকে।

ডুবুরী পোষাক পরা লোক, নিজেদের ছাড়া আর কার ভেবে ডুবুরীরাও গা করল না। এই ফাঁদে তিনটে ডুবুরীর পোষাকও নিয়ে গেল টারজান। তারপর আর কি? টারজান লোহার শিক বাঁকিয়ে প্রত্যেকটি বন্দীকেই করল মুক্ত। তারপর দার্নোর হাতে তিনটে ডুবুরী পোশাক তুলে দিয়ে বলল—দার্নো, তুমি, পাইলট ও মাষ্টার গ্রেগ পোয়াকগুলি পরে তৈরী হয়ে থাক, আমি আতো ও লালমুখোকে ছেড়ে সবাইকে গুপ্ত পথটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। বলে সে আতো ও লালমুখোকে ছাড়তেই আতো গিয়ে মন্দিরের বেদী থেকে হীরের কৌটোটা তুলেই দে ছুট গুপ্তপথের দিকে।

—গেল, গেল—নিয়ে গেল হীরের কৌটো, বলে মাষ্টার গ্রেগও ছুটল পেছনে। কিছুতেই টারজান ফেরাতে পারল না তাকে। পড়ে রইল ডুবুরীর পোষাক। ছুটল লালমুখোও। অন্যেরা তো আগেই ছুটে চলেছে।

এমন সময় এক পুরোহিত হঠাৎ তাদের দেখে উঠল চিৎকার করে। ছুটে এল প্রধান পুরোহিত, ছুটে এল যোদ্ধারা। টারজান কি আর দাঁড়ায় সেখানে? সে তক্ষুণি পুরোহিত, দার্নো ও পাইলটকে নিয়ে ডুবল জলে। পুরোহিত এদিকে আবার প্রধান পুরোহিতের বুকে ত্রিশূলটা আমূল গেঁথে দিয়ে যোদ্ধাদের কায়দা করে একটা ঘরে আটকে দিল জল ছেড়ে। তারপর নির্বিবাদ যাত্রা। মনের আনন্দে তারা তখন জলে ডোবা নৌকোটার কাছে এসে দেখে হীরের কৌটোটা পড়ে আছে মিস গ্রেগ নেই। কোথায় গেল মিস গ্রেগ? খুঁজতে

লাগল তারা। এমন সময় কোত্থেকে ছয়জন যোদ্ধা ডুবুরীর পোশাকে ও মুখোস পরে এসে করল তাদের আক্রমণ। কিন্তু তারা টারজানদের সামনে দাঁড়াতে পারলে তো? দুইজন ঘায়েল হয়ে চারজন পালিয়েই যাচ্ছিল। পাইলট তখন গিয়েছিল তাদের পেছনে একটা ত্রিশূল নিয়ে হঠাৎ একজন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুঁড়ে দিল ত্রিশূল তার বুকে। পড়ে গেল পাইলট। আর উঠল না। ক্ষেপে গেল টারজান। ততক্ষণে তারা হাওয়া।

টারজান তখন পুরোহিতকে বলল—তাদের প্রধান পুরোহিতকে হত্যা করেছ তুমি, হীরের কৌটোও চুরি গেছে—।

—না—আ। চুরি যাবে কেন? যেটা চুরি গেছে সেটা তো নকল। আসলটা তো আমার হাতে। বলে পুরোহিত কৌটোটা তুলে ধরল টারজানের সামনে।

—তাই নাকি? তবে তো ভালই হল। তৃতীয় শর্তও পূরণ হল আমার। তুমি চলে যাও এটা নিয়ে। রাজাকে এটা দিয়ে বলবে আমি আমার বন্ধুদের খুঁজে নিয়ে পরে যাব।

—আচ্ছা। বলে চলে গেল পুরোহিত।

তারপর দার্নো ও টারজান খুঁজতে লাগল মিস গ্রেগকে।

কিন্তু তাকে তখন কোথায় পাবে তারা? তাকে একা ফেলে চলে যাওয়ার পরেই কোত্থেকে এক ডুবুরী এসে তাকে টেনে নিয়ে হ্রদের কূলে পাহাড়ের এক দুর্গম গুহায় আটকে রাখে। ডুবুরীর পোষাক খুললে মিস গ্রেগ দেখে অবাক, লোকটা বৃদ্ধ। সে কে? কিন্তু একটু পরে সে দেখে কয়টা পুরোহিত তার বাবা ও ম্যাগীকে নিয়ে এসে বৃদ্ধকে কি বলে চলে গেল।

মিস গ্রেগ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার বাবাকে।—বাবা! তোমাকেও ধরেছে এরা?

—হ্যাঁ মা, নিষিদ্ধ নগরীর পাশের রাজ্যেই ছিলাম বন্দী হয়ে। কিন্তু একদিন প্রাণের ভয়ে পালাতেই হল ম্যাগীকে নিয়ে। রাজার

ভাইপোই হ্রদটা পার করিয়ে এই পাহাড়ের ধারে দিয়ে গিয়েছিল। চলেই যেতাম, কিন্তু পড়লাম ধরা এদের হাতে। এরা কারা? কি চায়? কিছুই তো বুঝছি না মা।

এমন সময় পুরোহিতরা আবার ফিরে এসে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল —গুরুদেব, এরা কি সত্য কথা বলছে?

—জানি না। এটাই তো জানতে হবে, এরা নির্দোষ কিনা। বলে বৃদ্ধ মিঃ গ্রেগকে দেখিয়ে বলল—একে বেদীতে নিয়ে তোল।

চেঁচিয়ে উঠল ম্যাগী ও মিস গ্রেগ দুজনেই। বলল—কি বলছ তোমরা? আমরা মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? আমি এসেছি নিষিদ্ধ নগরী থেকে পালিয়ে। বলে মিস গ্রেগ লাফিয়ে সামনে এসে বলল—তারা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। চলেই যাচ্ছিলাম, তোমারাই তো ধরে আনলে।

—না, না, কথাটা তা না। বৃদ্ধ বলে উঠল—তোমাদের একজনের পেট কেটে নাড়ীভুড়ী বের করে জিজ্ঞেস করলেই দৈববাণী হবে, তোমরা দোষী কি নির্দোষ।

ক্ষেপে গেল ম্যাগী।—ভণ্ড, প্রতারক, মানুষ খুন করতে এসেছ? তুমি যদি সত্যি গুরুদেব হতে তবে তুমি নিজেই বুঝতে পারতে আমরা সত্য বলছি কিনা।

রুখে উঠল পুরোহিতেরা ম্যাগীর উপর। বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলল —থাক, থাক, বুঝতে পারছে না। পরে বুঝতে পারবে। বলে সে আদেশ করল পুরোহিতদের—যাও, আমার ছুরি নিয়ে এস।

এদিকে হয়েছে কি টারজান ও দার্নো মিস গ্রেগকে কোথাও না পেয়ে নিষিদ্ধ নগরীর দিকেই চলতে লাগল, কি জানি যোদ্ধারা যদি তাকে নিয়ে গিয়ে থাকে। যেতে যেতে হঠাৎ একজায়গায় দেখে কতগুলি গরিলা একটা গুহার মধ্যে কি যেন দেখছে। ভ্রূক্ষেপ করল না তারা। গরিলার দল, কত কৌতূহল তাদের।

কিন্তু গুহাতে তখন চলেছে এক মারাত্মক কাণ্ড। হীরের

কৌটোটা নিয়ে আতো ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকেছিল একটা গুহায়, পেছনে লালমুখো ও মাষ্টার গ্রেগ। তাদের দেখেই গরিলার দল ছুটে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল গুহায়। আতো তখনও গুহায় ছুটছে ঘুরে ঘুরে। কিছুতেই সে ছাড়বেনা হীরের কৌটোটা, ছাড়বেনা লালমুখো ও গ্রেগও। তারপর এক সময় আতো হঠাৎ রেগে গিয়ে লালমুখোকে ছুঁড়ে একটা পাথর। পড়ে যায় লালমুখো। তক্ষুণি আতো হঠাৎ ছুটে গিয়ে আর একটা পাথর দিয়ে তার মাথাটা ছেঁচে দিয়েই ছুট। গ্রেগ তখন প্রায় ধরে ফেলেছিল আতোকে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে গুহা থেকে পালিয়ে ছুটতে থাকে আবার। গ্রেগও ছুটে পিছনে। গরিলার দল গেল আরও রেগে। তারাও তক্ষুণি ছুটল তাদের পেছনে। আতো তখন গরিলা দেখে ভয়ে হঠাৎ সামনে একটা গুহা দেখে ঢুকে পড়তেই লেগে গেল হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি। পিছনে মাষ্টার গ্রেগ।

এই গুহাতেই ছিল সেই পুরোহিতের দল। বৃদ্ধ পুরোহিত তখন ছুরি হাতে মিঃ গ্রেগের পেটে বসাতে যাচ্ছিল, মিস গ্রেগ ও ম্যাগীকে ধরে রেখেছে পুরোহিতের দল, এই সময়ই গিয়ে ঢোকে আতো ও মাষ্টার গ্রেগ। বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত ছুরি তুলে বলে উঠলেন—কে, কে আমাকে বাধা দিল?

দাদাকে দেখেই মিস গ্রেগ চিৎকার করে উঠল—দাদা, দাদা, দেখ বাবাকে কেটে ফেলছে এই বৃদ্ধটা।

ঠিক তখনি গরিলার দল গিয়ে ঢুকল গুহায়। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। মা রে, বাবা রে বলে পুরোহিতের দল দিল ছুট, কিন্তু পালাবে কোথায়? বিপর্যস্ত হয়ে গেল তারা। এর মধ্যে এক ফাঁকে দুই গরিলা মিস গ্রেগ ও ম্যাগীকে নিয়ে পালাতে গিয়ে পড়ল দলপতির খপ্পরে। মিস গ্রেগও ম্যাগীকে মাটিতে রেখে লেগে গেল তিন গরিলার লড়াই। এই হৈ চৈ চিৎকার টারজানের কানেও গিয়েছিল। সে তখন বেশি দুরে যায়নি। অবাক হয়ে সে তখনি ফিরে আসে গুহার কাছে। তাকে দেখেই তো গরিলারা ভয় পেয়ে লড়াই ছেড়ে

বলতে লাগল—জান টারজান, আমরা দুটি মেয়েকে গুহা থেকে এনেছিলাম, এই তো এখানে—। বলেই অবাক হয়ে গেল সে। বলল—নেই তো। কোথায় গেল?

—এঁ্যা, কি বলছিস তোরা? এস তো দার্নো। বলে সে দার্নোকে নিয়ে গুহাতে ঢুকেই পেয়ে গেল সবাইকে। আতো তখন মাটিতে শুয়ে হীরের কৌটোটা বুকে জড়িয়ে বাঁচাতে চাইছে মাষ্টার গ্রেগ থেকে। মিঃ গ্রেগ এসে বললেন সব।

আঁ্যাতকে উঠল টারজান—মিস গ্রেগ ও ম্যাগী এখানে ছিল?

অন্য পুরোহিতরা তখনও ভয়ে কাপছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ পুরোহিত হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—সত্য কথা—।

—চোপ। এক ধমকে টারজান থামিয়ে দিল তাকে।

—আমি প্রধান পুরোহিত—বলে সে আবার কথা বলতে যেতেই তাকে টারজান দাবড়ে দিয়ে বলল—প্রধান পুরোহিত? প্রধান পুরোহিতকে শেষ করা হয়েছে। তুমি এখন চল নিষিদ্ধ নগরে তোমার পুরোহিতের দল নিয়ে। চল—অ। বলে টারজান চিৎকার দিয়ে গরিলার দল আর সবাইকে নিয়ে চলল নিষিদ্ধ নগরীর দিকে। আতো আর মাষ্টার গ্রেগও চলেছে পেছনে পেছনে হীরের কৌটো নিয়ে ঝগড়া করতে করতে। কেউ কাউকে ছাড়বে না।

ভয়ঙ্কর এই গরিলার দল দেখে নিষিদ্ধ নগরীর যোদ্ধারা লড়াই করবে কি? পালাতেই পথ পায় না। কিন্তু ছাড়লে তো তারা? এদিকে পুরোহিতের দল আর টারজান তো আছেই। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল প্রাসাদ। টারজান ছুটে গিয়ে ধরল রাণীকে—বল, বল কোথায় রেখেছ মেয়ে দুটিকে? রাণী তখন পালাতে পারলে বাঁচে। সে তাড়াতাড়ি মিস গ্রেগ ও ম্যাগীকে ছেড়ে দিল পাশের ঘর থেকে।

এদিকে নগরীতেও কিন্তু লেগে গেছে আর এক বিপর্যয় কাণ্ড।

সেই পুরোহিত হীরের কৌটোটা রাজার হাতে তুলে দিয়ে টারজানের কথা বললে খুব খুশি হয়ে রাজা তখনই তার এক বিরাট

সৈন্যদল পাঠিয়ে দিয়েছিল নিষিদ্ধ নগরীতে। তার ভাইপোই নিয়ে এসেছিল সেই সৈন্যদল। তারা এসে একই সময়ে আক্রমণ করেছিল তাদের। ফলে নিষিদ্ধ নগরীর সৈন্যদল করেছিল বশ্যতা স্বীকার। শত্রুরাজ্য দখল করে রাজার ভাইপো পা দিল প্রাসাদে। টারজান ও দার্নো গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল তাকে।

এমন সময় রাজার দুই সৈন্য নিয়ে এল আতোকে। সে তখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে কৌটোটা। কিছুতেই ছাড়বে না।—আমার হীরে, আমার হীরে বলে সৈন্যদের হাত থেকে ছুটে যেতে চায়।

—হীরে? কই দেখি। বলে হঠাৎ বৃদ্ধ পুরোহিত চট করে ছিনিয়ে নিল কৌটোটা আতোর হাত থেকে। আতো উঠল চিৎকার করে। কিন্তু ততক্ষণে পুরোহিত কৌটোটা খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠল—কই, হীরে কই? এযে হীরের পিতা। বলেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল কৌটোটা।

—এ্যাঁ, কয়লা! হীরে নয়? বলেই হঠাৎ আতো মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

থতমত খেয়ে মাষ্টার গ্রেগ বলল—এ্যাঁ, হীরের পিতা, কয়লা? হ্যাঁ, হ্যাঁ কয়লাই তো হীরের পিতা। বলে সে-ও ধপাস করে বসে পড়ল আতোর পাশে। ১৯৬

টারজান তাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—আশ্চর্য!





টারজানের স্বর্ণসিংহ

জার্মান সৈন্যদের আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলোটা আবার ঠিক করে জেনী ও ছেলে জ্যাকীকে নিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল দিন। টারজানের। দাস-দাসী ও আদিবাসী যোদ্ধারা টারজান অন্ত প্রাণ।

ইতোমধ্যে টারজান একটা সিংহের বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়ে তাকেও বড় করে তুলেছে, শিক্ষিত করে তুলেছে। তাকে নিয়েই সে এখন শিকার করতে বেরোয়। পোষমানা সিংহটা এখন সবাইকে চিনে গেছে। তবে টারজানকেই সে বেশী ভালবাসে। সুন্দর দেখতে সিংহটা। বিশেষ করে তার কেশরগুলি—সোনালী দেখতে। তার জন্য একটা কাঠের খাঁচা করে দিয়েছে টারজান। খাঁচাতেই থাকে সে, টারজান না থাকলে।

এতসব খরচ-খরচায় টারজানের হাতেও খুব বেশী একটা টাকা নেই। ধ্বংস নগরীর সোনাতেই তো চলে তার সংসার। তাই একদিন সে জেনীকে ধ্বংস নগরীতে যাওয়ার কথা বললে আঁতকে উঠল জেনী।—সে কি? আবার যাবে?

জেনী আটকাতে পারল না টারজানকে। পঞ্চাশজন যোদ্ধা নিয়ে চলে গেল সে। কিন্তু টারজানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না যোদ্ধারা। বারবারই পিছিয়ে পড়ে তারা। টারজান যায় গাছে গাছে।

যেতে যেতে হঠাৎ একদিন টারজান একটা গাছের নীচে তীর বেঁধা একটা হরিণ দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে ভাবল, এ কি! কে ছুঁড়ল তীর। তীরটাও যেন এখানকার নয়! তবে কি কোন বিদেশী এসেছে শিকার করতে আমার অনুমতি ছাড়া? কে সে? দেখতে হচ্ছে তো!

টারজান তখন তার অনুগত যোদ্ধাদের এগিয়ে যেতে আদেশ দিয়ে সে ফিরে চলল সেই বিদেশীদের খুঁজেত।

টারজানের অনুমান ঠিক। ছয়জন বিদেশী এসেছিল এখানে দুইশ নিগ্রো আদিবাসী নিয়ে। একজন ইংরেজ মহিলাও ছিল তাদের মধ্যে।

সেই ইংরেজ মহিলাই ছিল নাটের গুরু। এককালে সে টারজানের বাড়ীতে ছিল। তখনই সে জেনেছিল টারজান তাল তাল সোনা আনে ধ্বংস নগরী থেকে। তখন থেকেই ছিল তার লোভ। তার-পরে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে পাঁচজন দুর্বৃত্ত জুগিয়ে চলে এসেছিল এখানে। সোনা তার চাই।

পাঁচজন দুর্বৃত্তের মধ্যে দুইজন ছিল ইংরেজ, একজন স্পেনদেশীয়, আর দুইজনের একজন ছিল রুশ ও আরেকজন জার্মান।

স্পেনদেশীয় দুর্বৃত্তটি ছিল লম্বা-চওড়া জোয়ান। প্রায় টারজানের মতই দেখতে। এককালে সে সিনেমায় অভিনয় করত।

এখানে এসে টারজানের কথা সবাই শুনেছিল। সেই সময়েই এই স্পেনদেশীয় দুর্বৃত্তটির মাথায় এক কুবুদ্ধি চাপে। কি মনে করে সে টারজান সেজে বনে শিকার করত। সেদিনও সে-ই এই হরিণটি শিকার করেছিল একা। ভাগ্যক্রমে একটি গরিলাকেও সে হত্যা করে। তারপরেই তাদের দলটা এগিয়ে যায় ধ্বংস নগরীর দিকে। সেই মহিলাটিই তাদের পথের সন্ধান বলে দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে একটি গরিলার সঙ্গে হঠাৎ টারজানের দেখা হয়ে যায়। গরিলাটি তো তাকে দেখেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠে—চলে যাও টারজান, তুমি চলে যাও।

—কেন? অবাক হয়ে যায় টারজান!

—কেন কি? কাল তুমি আমাদের দলের একটা গরিলাকে হত্যা করে আবার বলছ কেন?

—আমি? কেমন খটকা লাগল টারজানের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। বলে গরিলাটা চলে গেল।

টারজান বুঝতে পারল না সেই লোকটাই কিনা! কয়টা পায়ের ছাপও যেন দেখা যাচ্ছে! অবাক হয়ে সে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলল এগিয়ে।

যেতে যেতে ঠিক সে গিয়ে উঠল তাদের শিবিরে। তখন সন্ধে হয় হয়। ধ্বংস নগরীর কাছেই এসে পড়েছে তখন। কিন্তু তখন টারজানের মাথায় আগুন জ্বলছে। কেন যে সে যোদ্ধাদের নিয়ে এসেছিল এখানে, কি উদ্দেশ্যে কিছুই মনে নেই তার। বিদেশীদের কথাই সে ভাবছিল তখন।

মেয়েটি কিন্তু তখন তাকে দেখেই চিনে ফেলেছিল টারজান বলে দূর থেকে। তাকে দেখেই সে চট করে লুকিয়ে একজনকে বলল—এই, টারজান।

—কই, কোথায়? লোকটি বলল—ও তো আমাদের বন্ধু, টারজান সেজেছে।

মেয়েটি রেগে গিয়ে বলল—দেখ, যাকে চেন না, তাকে নিয়ে ঠাট্টা কর না। আমি তাকে চিনি। সে থাকলে আমাদের সব পণ্ড হয়ে যাবে।

—তবে উপায়?

—উপায় একটা আছে। টারজান কফি খেতে খুব ভালবাসে। কফির মধ্যে ঘুমের অষুধ মিশিয়ে তাকে খাতির করে খেতে দাও। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তাকে এখানে ফেলে আমারা কাল ভোরেই ধ্বংস নগরী থেকে সোনা নিয়ে কেটে পড়ব।

তাই হল।

তারপর তাদের পরিকল্পনামত তারা তার পরদিনই ছুটল সোনা আনতে পঞ্চাশজন নিগ্রো কুলি নিয়ে। তাদের পরিত্যক্ত তাঁবুতেই পড়ে রইল টারজান, অচেতন হয়ে।

তারা তো তখন কোনমতে সোনা নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। টারজান সেজে সেই দুর্বৃত্তটার কিন্তু ভালই লাগছিল। তাই সে সেই সাজেই চলল তাদের সাথে। যেতে যেতে নগরীর কাছাকাছি গিয়ে আনন্দে ভরে উঠল তাদের মন।

এদিকে তাদের দেখে নগরীর প্রহরীর মধ্যে লাগল ত্রাস। তারা তো আর জানত না যে এটা টারজানের দল নয়। তারা ভেবেছিল টারজানই এসেছে। সে তো বলেওছিল, আসবে আবার। তাই তারা ভয়ে নগরীর প্রাচীর অরক্ষিত রেখেই ছুটল ভিতরে খবর দিতে। প্রধানা পূজারিণীর স্বামী একটা গরিলা মানুষই খবরদারী করত তখন। টারজানকে না পেয়ে বাধ্য হয়েই প্রধানা পূজারিণী বিয়ে করেছিল তাকে। তার-স্বামী শুনে ছুটে এসে দেখে, সত্যি এসেছে টারজান তার দলবল নিয়ে। টারজানকে সে ঘৃণা করত। সে তক্ষুণি আবার ছুটল নগরীর সৈন্য পুরোহিতদের খবর দিতে।

এত সব কিছুর কিছুই কিন্তু জানত না দুর্বৃত্তের দল। তাদের ছিল তাড়া। তারা নগরীর কাছে এসে কাউকে না দেখতে পেয়ে

মহা আনন্দে তাড়াতাড়ি গোপন পথে সোনার ঘরে গিয়ে পঞ্চাশ তাল সোনা নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল জঙ্গলে।

এদিকে প্রধানা পুরোহিতের স্বামী কিন্তু ছুটে এসেছে সবাইকে নিয়ে। কিন্তু কাউকে না দেখে ভাবল, কোথায় গেল তারা? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে তারা ঠিক পেয়ে গেল টারজানকে। অষুধের প্রতিক্রিয়ায় তখনও সে পড়েছিল সেই শিবিরে, অচেতন হয়ে।

তার আদেশে কয়েকজন ছুটল অচেতন টারজানকে বার করে আনতে।

পুজোর বলি থেকে ব্যক্তিগত আক্রোশই ছিল তার বেশী। সে জানে প্রধানা পুরোহিত এখনো তাকে ভালবাসে। তাই সে এক্ষুণি তাকে বলি দিতে চায়।

এমন সময়েই প্রধানা ছুটে এসে ঝাঁপটে পড়েছিল তার স্বামীর উপর।—তোমার এতবড় স্পর্ধা! আমি থাকতে তুমি দিতে যাও বলি?

ঘাবড়ে গেল সবাই। সত্যিই তো! এই তো নিয়ম।

—যাও। গর্জে উঠল প্রধানা।—এক্ষুণি তাকে মন্দিরে নিয়ে যাও। যা করবার আমিই করব।

এর পরে আর কথা চলে না। তারা সুড়সুড় করে আদেশ তামিল করল তারা। মন্দিরের একটা নীচের ঘরে বন্দী করে রেখে এল তাকে।

টারজানের যখন জ্ঞান ফিরল তখন রাত। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে বুঝতে চেষ্টা করল সে কোথায়? কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারল না। দরজা বন্ধ। এমন সময় কে একজন নারী এসে তাকে বলল—টারজান তোমার জীবন বিপন্ন। শিগগীর তুমি আমার সঙ্গে চলে এস।

—তুমি কে? টারজান জিজ্ঞেস করল। —প্রধানা পুরোহিত পাঠিয়েছে আমায়।

—প্রধানা? তবে কি আমাকে ধ্বংস নগরীর মন্দিরে আনা হয়েছে।

—হ্যাঁ। আর কথা বলার সময় নেই। চলে এস শিগগীর।

আসলে নারীটি নিজেই ছিল প্রধানা। সে বুঝেছিল কাল যদি টারজানকে সে নিজের হাতে বলি না দেয়, তবে তাকেই খুন করা হবে। কিন্তু যাকে সে ভালবাসে তাকে সে খুন করবে কি করে? সে মন্দিরের কথা চিরদিনের মত ভুলে গিয়ে টারজানকে নিয়েই চলে যাবে। তাই এল সে।

পরদিন ভোরে প্রধানাকে দেখে তো টারজান অবাক! বলল—তুমি আমাকে বাঁচালে, কিন্তু তুমি যাবে কোথায়?

—কেন? তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।. টারজানের হাতটা জোরে ধরল প্রধানা।

এই তো মুস্কিলে ফেললে। নগরীতে তো তুমি যেতেও পারবে না এখন। ঠিক আছে, চল দেখি এদিকের ঘন জঙ্গল দিয়ে। বলে টারজান তাকে নিয়ে চলল নগরীর পেছন দিক দিয়ে।

প্রধানা কি আর টারজানের মত যেতে পারে? খানিক গিয়ে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে টারজান ঝট করে তাকে কাঁধে তুলে ছুটতে লাগল গাছে গাছে। অবাক হয়ে গেল প্রধানা তার শক্তি দেখে।

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে গেল টারজান। দেখে অদ্ভুত একটা গাঁ। ছোট ছোট কুটিরগুলি ঝুলছে গাছ থেকে। দড়ি বেয়ে উঠানামা করে লোকগুলিও কেমন যেন দেখতে। ঠিক মানুষের মত নয়, আবার গরিলার মতও নয়। কপাল বলে কিছুই নেই তাদের। এক জায়গায় বসে খাচ্ছে কাঁচা মাংস। তাদের কথা-বার্তা গরিলার মত। টারজান বুঝতে পারছে।

একটা গরিলা-মানুষ উত্তেজিত হয়ে বলছে তাদের—এই বনের পথে আমি অদ্ভুত দুইজন মানুষ দেখেছি।

—তাই নাকি? তাই নাকি—? কিন্তু তাদের মুখের কথা মুখেই

রয়ে গেল, হঠাৎ কোত্থেকে একটা ভয়ঙ্কর গরিলা এসে হুঙ্কার দিয়ে উঠল তাদের সামনে।

হুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল সব, মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো, কিন্তু দুয়েকজন পড়ল ধরা।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল গরিলা—কই, নিয়ে আয় তোদের মেয়েদের, সম্রাটের আদেশ।

হাত জোড় করে একজন চিঁ চিঁ করে বলল—আজ্ঞে। সেদিনও তো দিয়েছি, একজন, কিন্তু এখন—

—চোপ। মুখের উপর কথা?

কিছু করার ছিল না তাদের। আনতেই হল মেয়েদের। তার মধ্যে একটা মেয়ে বেছে তার কোলের ছেলেটাকে ছুঁড়ে ফেলে গরিলাটা চেপে ধরল তার একটা হাত।

আর সহ্য হল না টারজানের। সে হঠাৎ ঝপ করে তার হাতের বিরাট বর্শাটা ছুঁড়ে দিল গরিলাটার বুক লক্ষ্য করে। 'অ্যাক' করে পড়ে গেল সে। আর উঠল না।

তখন টারজান একলাফে হতভম্ব লোকগুলির সামনে এসেই চিৎকার করে উঠল—এই অপদার্থের দল। এতগুলো লোক থাকতে কি করে একটা গরিলা এসে তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে?

কিন্তু টারজানের কোন কথাই কানে গেল না তাদের। তারা বর্শা উঁচিয়ে তাকেই শত্রু ভেবে ছুটে এল চারিদিক থেকে। —সম্রাটের প্রেরিত পুরুষকে হত্যা করেছে লোকটা। ধর, ধর তাকে।

—চোপ্। ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে উঠল টারজান গরিলার বুক থেকে তার বর্শাটা তুলে নিয়ে।

দমে গেল তারা। বলল সিংহ-সম্রাট এখন আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।

—কে তোমাদের সিংহ সম্রাট?

একজন বলল—গরিলাদের সঙ্গে হীরের প্রাসাদে থাকে। রাজার

রাজা। এ গরিলাটার দেহ দেখেই তারা বুঝে ফেলবে সব।

—না, বুঝবে না। আমিই নিয়ে যাচ্ছি তার দেহটা। তোমরা আমাকে হীরের প্রাসাদটা দেখিয়ে দাও। তার আগে আমার একজন সাথীকে তোমাদের ঘরে রেখে যাব। দেখবে তার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। বলে টারজান গরিলার দেহটা কাঁধে তুলে প্রধানাকে একটা কুঁড়েতে তুলে দিয়ে চলে গেল তাদের নিয়ে।

সত্যি অবাক হয়ে গেল টারজান প্রাসাদটা দেখে। কতগুলি গরিলা ঘোরাফেরা করছে এদিক সেদিকে। তবে তারা যেন উন্নত কোন গরিলা। হাতে পায়ে অলঙ্কার। কি যেন কতগুলি ঘাস কোমড়ে। অনেক নিগ্রো ক্রীতদাস কাজ করছে।

টারজান সবার অলক্ষ্যে একজায়গায় গরিলার দেহটা নামিয়ে রেখে ফিরে এল গাঁয়ে। কিন্তু এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে টারজান তন্নতন্ন করে খুঁজে হঠাৎ একটা মেয়েকে পেয়ে জানতে পারল, তারা চলে যাওয়ার একটু পরেই সেই গরিলা দল বেঁধে এসে গাঁয়ের সবাইকে ধরে নিয়ে চলে গেছে। তার মধ্যে প্রধানাও আছে।

তারপর কি আর টারজান দাঁড়ায় সেখানে? এক ছুটে সে গিয়ে পড়ল প্রসাদের কাছে। কিন্তু দিনের বেলা পাঁচিল পেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ দেখল না। অপেক্ষা করেই আছে সে। হঠাৎ দেখে একজায়গায় কতগুলি নিগ্রো ক্রীতদাস সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে কতগুলি গরিলা সোনার শেকল বাঁধা একটা সিংহ নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাফেরা করছে। সিংহটা তাদের গাঁ শুকে চলে যেতে চাইলে তারাও চলে গেল। অবাক টারজান। তবে কি এই তাদের সিংহ-সম্রাট?

যাহোক, টারজান গভীর রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি প্রাসাদের ভিতর ঢুকে খুঁজতে লাগল প্রধানাকে। কিন্তু হঠাৎ কোথেকে একজন সাদা মানুষ এসে তার সামনে দাঁড়াতেই সে ঝপ

করে কোমড় থেকে ছুরি বার করে রুখে দাঁড়াল। ভয়ে একলাফে পিছিয়ে গিয়ে সাদা মানুষটা ইংরেজীতে বলে উঠল—রক্ষে করে আমায়।

অবাক টারজান বলল—তুমি ইংরেজী জান?

—হ্যাঁ, আমি তোমারই মত মানুষ যে। ছোট বেলায় একজনের সাথে শিকার করতে এসে পথ হারিয়ে ফেলি। তারপর এই গরিলাগুলি আমাকে পেয়ে নিয়ে আসে এখানে। সেই থেকে এখানে আছি আমি, আজ বৃদ্ধ। আমি চলে যেতে চাই, কিন্তু পারছি না। এখানে প্রায় এক হাজার গরিলা ও তিন হাজার ক্রীতদাস আছে।

—এত ক্রীতদাস থাকা সত্বেও তারা মুক্ত হতে পারছে না কেন?

—কি করে পারবে? গরিলাগুলি খুব বুদ্ধিমান। বৃদ্ধ প্রায় কেঁদে ফেলল। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

বলতে না বলতেই টারজান ঝট করে ভিতরে ঢুকে দেখল এক দৈত্যাকার নিগ্রো তাকিয়ে আছে তার দিকে। —কি চাও তুমি? যেন গর্জে উঠল নিগ্রো।

—তুমি কি মহিলাটিকে চাও? তবে এস।

টারজান অবাক হয়ে বলল—কেন? তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কেন?

—তা তো জানি না। তবে তারা বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে একটা ঘরে। তারপরেই বন্ধ করে দেবে দরজাটা আমাদের রেখে। আমিও বেরুতে পারব না।

টারজান দুঃখ করে বলল—হুম্, তুমি সত্যি ক্রীতদাস। মুক্তি চাও না তুমি?

—চাইলে কি হবে? মাথা চুলকে বলল—পাব কি করে?

—আমি দেব তোমায়। টারজান বলল—তোমাদের সবাইকে। আমাকে সাহায্য কর। দেখিয়ে দাও কোথায় আছে মহিলাটি।

কি ভাবল নিগ্রোটি কে জানে। বলল—তাহলে এস। বলে

খানিক গিয়ে একটা দরজা দেখিয়ে বলল এই ঘরে। চলে যাও ভেতরে।

টারজান বলল ঠিক আছে। বলেই সে এক লাফে ঘরে ঢুকে দেখে একটা সিংহাসনে বসে আছে সেই সিংহটা। তার দুধারে বেঞ্চিতে বসে আছে প্রায় পঞ্চাশ জন সামন্ত। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে—বন্ধুগণ, আমাদের সম্রাট ক্ষুধার্ত। বন্দিনীকে নিয়ে আসা হোক। তিনি তাকে ভক্ষণ করবেন। আগামীকাল করবেন তার সাথীকে।

বলতে না বলতেই কয়জন ক্রীতদাস নিয়ে এল প্রধানাকে। আড়মোড়া ভেঙ্গে সিংহটাও উঠে দাঁড়াল।

আর কি টারজান ঠিক থাকতে পারে? সে হঠাৎ এক লাফে একটা ক্রীতদাসের হাত থেকে একটা বর্শা নিয়ে ছুঁড়ে মারল সিংহটার দিকে। গর্জন করারও সময় পেলনা সিংহটা। নেতিয়ে পড়ে গেল উঁচু বেদী থেকে। মার, মার, করে উঠল সবাই। আর এমন সময় পেছনে আরেকটা সিংহ গর্জন শুনে চমকে টারজান দেখল তারই পোষা সিংহ ঢুকেছে ভেতরে। আনন্দে টারজান তখন এক ছুটে তার কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—ধর গরিলাগুলিকে। আর কি সিংহ বসে থাকে? একলাফে—গিয়ে তক্ষুণি কয়েকটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল সে টুঁটি ধরে। ছুটে গিয়ে টারজান জড়িয়ে ধরল প্রধানাকে। ভয়ঙ্কর অবস্থা চারদিকে। এরমধ্যে সেই নিগ্রোটা চিৎকার করে ক্রীতদাসদের বলে উঠল—তোমরা যদি মুক্তি চাও তবে বিদেশীকে সাহায্য কর। আর যায় কোথায়? সবাই এসে আক্রমণ করল গরিলাদের। এক ফাঁকে সে দুইজনকে গাঁয়েও পাঠিয়ে দিয়েছিল গ্রামবাসীদের ডেকে আনতে। চলেও এল তারা মার মার করে। তারপরে গরিলারা আর কি করে পারে এত লোকের সঙ্গে? তছনছ হয়ে গেল তারা নিগ্রোদের আক্রমণে। প্রায় একশ জন গরিলা রইল বেঁচে। শান্তি নেমে এল নগরে।

টারজান তখন সবাইকে ডেকে বলল বন্ধুগণ, আজ থেকে তোমরা মুক্ত। তোমাদের একজন রাজা চাই।

বলে সেই বৃদ্ধ সাদা মানুষটিকে তাদের সামনে ধরে বলল টারজান বলল—তিনি হবেন তোমাদের রাজা। আজ থেকে।

বৃদ্ধ বলে উঠল—না টারজান, আমি না। আমি চলে যেতে চাই দেশে। কতদিন—।

—দেশে? টারজান বলল—দেশে গিয়ে কি করবে? কেউ তোমাকে চিনবে না, তুমিও চিনবে না কাউকে। কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে সেখানে। খাপ খাওয়াতে পারবে না তুমি। দেখ না' আমিও তো বেছে নিয়েছি আমার স্বাধীন জীবন এখানে। আমার সব থাকতেও তো আমি যাই না সেখানে। তুমিও থেকে যাও এখানে। এরা বড় সরল, বড় অনুগত। তাদের একটু সাহায্য করো।

তারপর সব গরিলাদের ডেকে এনে টারজান বলল—তোমরা হয় এখানে ক্রীতদাস হয়ে থাকবে, নয় চলে যাবে এখান থেকে। তবে এখানে থাকলে নতুন রাজা তোমাদের দেখবে। ভালই থাকবে।

তারাও এখানে থাকতেই রাজী হল।

আর তার পরদিনই টারজান তিন হাজার নিগ্রো ও একশ গরিলা নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধ্বংস নগরীতে। ফুৎকারে উড়ে গেল সব। প্রধানার স্বামী হল নিহত। কিন্তু নিহত হওয়ার আগে একসময় টারজানকে বেকায়দায় পেয়ে খুনই করে ফেলতে যাচ্ছিল সে, পারেনি। হঠাৎ কোত্থেকে টারজানের পোষা সিংহটা এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল।

টারজান সিংহটাকে আদর করে বলেছিল—কি করে এলি তুই আমায় বাঁচাতে?

তারপর সেই রাত্তিরেই এক ভোজসভায় সবাইকে ডেকে টারজান প্রধানকে দেখিয়ে বলল—আজ থেকে এ-ই তোমাদের রাণী, প্রধানা

পূজারিণী। এর বিরুদ্ধাচারণ করলে আর কারোর রক্ষে থাকবে না। আর এই একশজন গরিলা তার দেহরক্ষী।

সবাই মেনে নিল তাকে। না মেনে উপায় আছে?

সব ব্যবস্থা করে তার পরদিন সকালেই টারজান তার সিংহ নিয়ে চলল দেশের পথে। মনে পড়ল তার যোদ্ধাদের কথা। আবার তো আসতে হবে তাকে সোনার জন্য।

এদিকে টারজানের ফিরতে দেরী দেখে পঞ্চাশজন যোদ্ধা নিয়ে জেনী যে জ্যাকীকে বাড়িতে রেখে টারজানকে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে সে খবর তো আর টারজান জানে না। জানে না বিদেশীগুলি যে সোনা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সোনা তারা পেয়েছে। এখন কোনমতে গিয়ে জাহাজে উঠতে পারলেই হয়। যেতে যেতে এক এক জায়গায় শিবির করে থাকে, আবার চলে।

সেদিনও তারা এক জায়গায় পেতেছে শিবির। পরিশ্রান্ত সবাই। নিগ্রোগুলি পর্যন্ত। খাবারও দরকার। তাই চারজন দুর্বৃত্ত গেছে শিকারে। স্পেনদেশীয় দুর্বৃত্তটাও ছিল তাদের সঙ্গে। টারজান সেজেই বেরিয়েছিল সে। কেমন যেন ভাল লাগে তার টারজান সাজতে।

যাহোক একসময় সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সবাইকে। হঠাৎ টারজানের যোদ্ধারা তাকে দেখে টারজান ভেবে এসে দাঁড়িয়ে বলল—প্রভু, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? আমরা কত খুঁজেছি।

মুহূর্তে দুর্বৃত্তটার মনে এক কুবুদ্ধি জাগে। সে বলল—এই তো তোমরা এসেছ, ভাল হয়েছে। কতগুলি সাদা দুর্বৃত্ত ধ্বংস নগরী থেকে সোনা নিয়ে এসেছে আমার অনুমতি না নিয়ে। চল যাই, সোনাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

—চলুন প্রভু। বলে তারা তক্ষুণি চলল তার সঙ্গে।

টারজান-সাজা দুর্বৃত্তটি কিন্তু মনে মনে খুব খুশি। সোনাগুলি সে একাই ভোগ করবে এখন। তাই সে শিবির থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় এসে যোদ্ধাদের বলল—তোমরা সোনাগুলি এখানে পুঁতে রেখে চলে যাও বাড়ী। আমি দুর্বৃত্তগুলিকে শাস্তি না দিয়ে যাব না।

তার আদেশ অমান্য করতে পারে না যোদ্ধারা। অনিচ্ছাসত্বেও তারা চলে গেল।

তারপর সে শিবিরে গিয়ে বলল—তোমরা তাহলে সব ঠিকঠাক কর, আমি নিগ্রো সর্দার ও কয়জন ভাল শিকারী নিয়ে একটা হরিণ শিকার করে নিয়ে আসি। বলে সে সর্দারকে গোপনে ডেকে সোনার লোভ দেখিয়ে পাঁচজন বিশ্বাসী নিগ্রোকে নিয়ে চলে গেল সোনাগুলি অন্য জায়গায় পুঁতে রাখতে। না হলে সেই যোদ্ধারা আবার এসে যদি নিয়ে যায়।

তারা চলে যেতেই সেই সর্দারের সহকারী এসে সবাইকে বলল—আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না প্রভু। সর্দারটা মহা ধুরন্ধর। টারজান সেজে ঐ কর্তা যদি আরব শিবিরে যায় তবে তারা তখনি সব ফেলে দিয়ে দেবে দৌড়। একটু খোঁজ নিন। সর্দারটা হয়ত ইতিমধ্যে আরব শিবিরের ভৃত্যদের হাত করে ফেলেছে।

কথাটা মনে ধরল সবার। তারা তখনি শিবির তুলে আরবদের শিবিরের পাশে তাঁবু খাঁটিয়ে অনুচর পাঠাল একজন।

আরবরা তো অবাক। টারজান কোত্থেকে আসবে? কিন্তু তারা মনে মনে গেল চটে। টারজানের ভয় দেখাস আমাদের?

আসলে সহকারীর মনে ছিল আরেক পরিকল্পনা। সে সব ভৃত্য নিয়ে আরব শিবির আক্রমণ করে হাতির দাঁতগুলি নিয়ে এসে এদের করবে আক্রমণ। কয়জন মাত্র লোক, কতক্ষণই বা লাগবে তাদের শেষ করতে। তারপর হাতির দাঁতগুলি তো তার। কাউকে সে বলেনি এই পরিকল্পনার কথা। রাত্রিতে সহকারীটা যেই সব নিগ্রোদের নিয়ে আরব শিবির আক্রমণ করল তারাও তৎক্ষণাৎ

পড়িমড়ি করে দে ছুট। কোথায় যে যাচ্ছে, কোনদিকে, কিছুই জানে না তারা। । ছুট, ছুট, ছুট।

আরব আর কয়টা? কিছুক্ষণের মধ্যেই সহকারী সব কয়টাকে নিকেশ করে হাতির দাঁতগুলি নিয়ে এসে শিবিরে কাউকে না পেয়ে সে গেল রেগে। আর তারপরেই সে ছুটল তাদের পেছনে দুইশ' নিগ্রো নিয়ে।

এদিকে জেনী তো পঞ্চাশজন যোদ্ধা নিয়ে খুঁজেই চলেছে টারজানকে। দিনের বেলায় চলে রাত্রিতে একজায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করে সবার সাথে। সেদিনও সে রাত্রিতে বসেছিল অগ্নিকুণ্ডের পাশে। ভাবছিল টারজানের কথা। এমন সময় সেই দুর্বৃত্তের দল আমাদের বাঁচান, আমাদের বাঁচান বলে ছুটে এসে পড়ল তার কাছে। লাফ দিয়ে যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে পড়ল চিৎকার শুনে। কিন্তু জেনী মেয়েটিকে দেখেই চিনে ফেলে। বলে—তুমি?

মেয়েটি তাদের বিপদের কথা সংক্ষেপে বলে পা জড়িয়ে ধরল তার—আমাদের বাঁচান লেডী।

সে কথা বলার আর দরকার ছিল না তার, জেনী ইতোমধ্যেই তার যোদ্ধাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে। তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধ লেগেও গেল। নিগ্রোগুলি হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়তেই যোদ্ধারা ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। জেনী মেয়েটিকে নিয়ে তাঁবুর পিছনে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে হল আরেক কাণ্ড! স্পেনীয় দুর্বৃত্তটার সোনাগুলি ছিল এখানেই। সে সর্দারের সঙ্গে এসে সোনাগুলি একটু দূরে পুঁতে গিয়েছিল শিবিরে। কিন্তু তখন শিবিরে চলছিল তাণ্ডব। তাই সে ভয় পেয়ে আবার এসেছিল এখানে। এখানেও তাই দেখে ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছিল আবার, কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ে যায় তারই দলের মেয়েটি রয়েছে দাঁড়িয়ে। তাকে তো পেতে সে চাইছিলই। সে দেখল এই

সুযোগ। সে হঠাৎ ঝপ করে একটা গাছ থেকে নেমে মেয়েটিকে কাঁধে তুলে দে দৌড়। তখন জেনী চিৎকার করে উঠল—টারজান, টারজান, এ কি করছ তুমি? হতাশায় ভেঙে পড়ে ধপ করে বসে পড়ল জেনী।

ঠিক এই সময়ই সেই সহকারী সর্দার কয়েকটা নিগ্রো নিয়ে এসে হঠাৎ জেনীর উপর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে নিয়ে ছুটে চলল অন্ধকারে।

তা দেখে জেনীর যোদ্ধারাও করল তাদের তাড়া। বেগতিক দেখে সহকারীর দল ছুটতে ছুটতে তাদের গাঁয়ে ঢুকে লাগিয়ে দিল তাদের গাঁয়ের প্রধান দরজা। কিন্তু জেনীর যোদ্ধারা কি ছাড়ে তাদের? তারা তক্ষুণি চারিদিক ঘেরাও করে চিৎকার করে তাদের সাবধান করে দিয়ে বলল—কিছুক্ষণের মধ্যে যদি প্রভুপত্নীকে না ফেরৎ দাও তবে তোমাদের গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে।

সহকারী ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছিল, মেয়েটি দুর্বৃত্ত দলের নয়, কিন্তু জেনীকে সুন্দরী দেখে ছাড়তেও চাইল না।

যোদ্ধারা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? দিল তারা আগুন লাগিয়ে গাঁয়ে। গ্রামবাসীরা তখন ভয়ে ছুটতে লাগল গ্রাম ছেড়ে। যোদ্ধারাও তাদের ধরে খুঁজতে লাগল তাদের প্রভুপত্নীকে। সারা গ্রাম ভস্মীভূত হয়ে গেল আগুনে, কিন্তু জেনীকে কোথাও পেল না তারা। কয়েকজনের কাছে শুনল সহকারীটা সাদা মেয়েটাকে এনে প্রধান দরজার কাছে একটা ঘরেই রেখেছিল। তারপর আর জানে না তারা।

যোদ্ধারা তক্ষুণি ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ছাই গাদায় পেল একটা আগুনে পোড়া দেহ। আক্ষেপে ভরে গেল তাদের হৃদয়। তবে কি প্রভুপত্নীকেই পুড়িয়েছে তারা!

যাহোক সেই আগুনে পোড়া দেহটাকেই সমাহিত করে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে তারা ফিরে চলল ঘরে। কিন্তু পথেই টারজানের

সঙ্গে দেখা হতে ভয় পেয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বলল সব কথা। টারজান তো থ! যাহোক, কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হয়ে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেনীর খোঁজে। কিন্তু যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় কতকগুলি সাদা মানুষকে কতগুলি আদিবাসীর দিকে গুলি চালাতে দেখে ক্ষেপে গেল সে। একলাভ সে একটা গাছের উপর উঠে চিৎকার করে উঠল—থামাও গুলি।

টারজান তো তাদের দেখেই চিনে ফেলল। বলল—ও, তোমরা? কি করছিলে এখানে?

—আজ্ঞে—। তাদের তো ততক্ষণে ভয়ে কাঁপুনি ধরে গেছে।

—থাক, তোমরা এখন বিপন্ন। কোথায় যাবে তোমরা?

—সমুদ্রোপকূলের দিকে। সেখান থেকে জাহাজে—।

—ঠিক আছে চল। তোমাদের একটা গাঁয়ে নিয়ে যাই। সেখানে কয়দিন থেকে সুস্থ হলে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। বলে টারজান নিয়ে চলল তাদের।

পথ তো আর একটুখানি নয়? যেতে যেতে তাদের হয়ে গেল অনেক রাত্রি। প্রায় গাঁয়েরই কাছে এসে পড়েছিল তারা। কিন্তু টারজান বলল—না, এখন এই রাত্রিতে গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙাব না। এখানেই থাকব আজ। কাল ভোরে তোমাদের কথা বলে যাব তাদের।

ঘুমিয়ে পড় তোমরা। বলে টারজান নিজেও শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম কি আর আসে কারো চোখে? তবুও এক সময় তিন-জন ঘুমোলেও একজনের চোখে ঘুম নেই ভয়ে। হঠাৎ সে দেখে টারজানের কোমড় থেকে কি যেন ছিটকে পড়ল এক পাশে। লোভ হল তার। সিংহটার ভয়ে সে গড়িয়ে গড়িয়ে একটু এগিয়ে এটা হাতে নিয়ে দেখে—আরেব্বাস্, দামী পাথর! তারপর সে কি আর শুয়ে থাকে? অনেক চেষ্টা করে গড়াতে গড়াতেই একটু দূরে গিয়ে উঠেই দে ছুট।

এদিকে দুর্বৃত্তটি থলেটা নিয়ে মনের আনন্দে চলে গেলেও কতক্ষণ পরেই সে বুঝল এ গভীর বনে সে একা। চলতে চলতে ক্ষুধা তৃষ্ণায়ও কাতর হয়ে পড়ল সে। কিন্তু যাবে কোথায়? এরমধ্যে এক-জায়গায় বিশ্রাম করতে বসেই লাফিয়ে উঠল সে। আরে বাপ। অসংখ্য পিঁপড়ে। জামা কাপড়ে ছেয়ে গেছে পিঁপড়ে। সে পাগলের মত জামা কাপড় ফেলে ছুটতে লাগল। অন্তর্বাসটা কোনমতে পরে রয়েছে।

সে ছুটতে ছুটতে একজায়গায় কার কথা শুনে ছুটে গিয়ে দেখে তাদেরই দলের সেই নকল টারজান ও মেয়েটি।

মেয়েটি তো তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল আমায় বাঁচাও ভাই, আমায় বাঁচাও।

কিন্তু কে কাকে বাঁচায়? লেগে গেল দুই দুর্বৃত্তের ঝগড়া। জার্মান দুর্বৃত্তটা হঠাৎ স্পেনীয়টাকে গুলি করতেই স্পেনীয়টা ছুঁড়ল তার বর্শা। আমূল ঢুকে গেল বর্শাটা জার্মানটার বুকে।

লুটিয়ে পড়ল জার্মান। চিৎকার করে উঠল মেয়েটা—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, তুমি নিষ্ঠুর।

ভাগ্যক্রমে জার্মানটার গুলিটা লক্ষভ্রষ্ট হওয়াতে স্পেনীয়টা গিয়েছিল বেঁচে। সে তখন মেয়েটাকে কি একটা বলতে যেতেই হঠাৎ দেখল জার্মানটার কোমড়ে যেন কি একটা বাঁধা আছে। সে তক্ষুণি ছুটে গিয়ে দেখে হীরের থলি। আর তাকে পায় কে? হা হা করে হাসতে হাসতে সে বলে উঠল—আমি ধনী, আমি ধনী। বলেই সে মেয়েটাকে থলেটা দেখিয়ে বলে—দেখ, দেখ।

অবাক মেয়েটিও! সত্যিই তো? স্পেনীয়টার গা ঘেসে এসে দাঁড়াল সে। কিন্তু সে দুর্বৃত্ত। অত সহজে কি আর তার মন গলে? আর এক মুহূর্তও সে দেরী করল না। মেয়েটাকে ফেলেই চলে গেল সে।

কিন্তু তার ভাগ্য ভাল, টারজানের চোখে পড়ে যায় সে। টারজান

খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই জার্মানটাকে। কারণ সে শুনেছিল এই জার্মানটাই তার হীরেগুলি নিয়ে পালিয়েছে।

মেয়েটি প্রথমে তাকে নকল টারজান, তার দলেরই স্পেনীয়টা বলে ভেবেছিল। কিন্তু একটু পরেই তার ভুল ভেঙ্গে যায়। সে তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে বলে—লর্ড গ্রেস্টোক আপনি ?

অবাক টারজানও! বলল—হ্যাঁ, আমি, তুমি কে ?

—আমি, মনে নেই আপনার লেডী গ্রেস্টোকের কাছে থাকতাম ?

—ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। কিন্তু তুমি এখানে ?

তখন মেয়েটি কেঁদে তার পায়ে লুটিয়ে পরে বলল সব।—ধ্বংস নগরী থেকে আমরা সোনা এনেছিলাম। কিন্তু আপনিই তো নিয়ে গেছেন সব।

—আমি! না তো! অবাক টারজান!

অবাক মেয়েটিও। বুঝল স্পেনীয়টাই টারজান সেজে ঠকিয়েছে তাদের। তারপরেই হীরের থলিটা যে জার্মানটার কাছ থেকে কিভাবে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়েছে স্পেনীয়টা, বলল সেকথা। এখন আমি একা। হাঁটতে পারছি না। আমি আর বাঁচবনা লর্ড।

—না, না, ঠিক আছে। চল স্পেনীয়টাকে ধরব। বলে টারজান মেয়েটাকে কাঁধে তুলে চলল স্পেনীয়টাকে ধরতে। যেতে যেতে একজায়গায় দেখে আগুন জ্বলছে, কারা যেন কথা বলছে। সে চট করে মেয়েটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল—তুমি দাঁড়াও, আমি দেখে আসি। বলেই সে ছুটে চলে গেল।

পেয়েও গেল সে। রাত্রি হয়ে গেছে তখন। স্পেনীয়টা একটা আগুন জ্বালিয়ে বসেছিল তার পাশে।

টারজান সেজে সেজে তার একটা ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে সে টারজান। ভয় ডর তার নেই। ইচ্ছে করলেই সে একা একা জঙ্গল পেরিয়ে যেতে পারে উপকূলে। মনেও আনন্দ—সোনাগুলি তো আছেই, হীরেও পেয়েছি। তাই সে যেতে যেতে রাত্রি হলে এক-

জায়গায় থেমে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রিটা কাটায়, আবার চলে। সেদিনও সে আগুন জ্বালিয়ে বিশ্রাম করছিল পাশে। এমন সময় সে দেখে



কে এক নারী মূর্তি টারজান, টারজান—বলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রথমটা ভয় পেয়ে গেলেও সুন্দরী মহিলা দেখে সেও তখন

হাত বাড়িয়ে বলল—এস, এস। স্বপ্নের ঘোরে যেন এগিয়ে চলেছে সেই মূর্তি।

আর তখনি ডেকে উঠল টারজান—এ কি! জেনী!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জেনী। বলল—তুমি?

—হ্যাঁ, আমিই তো টারজান। হেসে ফেলল টারজান।

—তবে সে কে? বলেই জেনী ফিরে দেখে লোকটা নেই।

—সেই নকল। বলেই টারজান সিংহটাকে আদেশ করল—যা তো, ধরে নিয়ে আয় লোকটাকে।

বলার অপেক্ষা। সিংহ ছুটল তক্ষুণি।

জেনী তখন টারজানকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—তবে তুমি কি করে আমার সামনে থেকে মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে!

—না, লেডী, তিনি নন। আমায় নিয়েছিল সেই লোকটা। বলে দুর্বৃত্ত মেয়েটা এসে দাঁড়াল সামনে। সে যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে খেয়ালই করেনি কেউ।

তারপর টারজানকে জড়িয়ে ধরে জেনীর কি কান্না। সান্ত্বনা দিতে লাগল টারজান।

ধুরন্ধর লোকটা কিন্তু তখন পড়েছে বিপদে। সিংহের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে নদীতে দিয়েছিল লাফ। আর তারপর নদী থেকে উঠেই পড়েছে নরখাদকদের হাতে। তাকে তারা ভাগ্যক্রমে খায়নি বটে, কিন্তু বন্দী করে রেখেছে আজীবন।

টারজান পেয়ে গেল তার সব সোনা।

জেনী বলল—কিন্তু হীরেগুলি?

টারজান হেসে বলল—ও আর পাওয়া যাবে না। যাকগে—



সিংহ মানুষ

একবার হলিউডের এক চিত্রনির্মাতার দল আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েছিল ছবি তুলতে তাদের দলবল নিয়ে। তাদের ইচ্ছে ছিল আসল জঙ্গলের ছবি তুলবে তারা। আসল জীবজন্তুর ছবিই। গল্পটিও পেয়েছিল চমৎকার। একজন সিংহ-মানুষের চরিত্র ঘিরে গল্প। বনেই মানুষ সিংহ-মানুষটি, সিংহের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে সে। চিত্র-নাট্যকার নিজেই লিখেছেন গল্পটি। একটা পুরোনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার ভিতরে একটা ম্যাপ পেয়ে যান তিনি। আফ্রিকার

জঙ্গলে একটা হীরা উপত্যকার পথ নির্দেশ ছিল এই ম্যাপটাতে। তাতেই তার মাথায় গল্পটার পরিকল্পনা জাগে। গল্পটা লিখেও ফেললেন তিনি। পছন্দ হল প্রযোজকেরও। নায়কও পাওয়া গেল পছন্দমত। সুন্দর, সুঠাম চেহারা। ঠিক সিংহ-মানুষের মতই। পাওয়া গেল বিখ্যাত নায়িকা ও পরিচালক। আর তারপরেই লেগে গেল হৈ হৈ। নায়ক, নায়িকা, তার নকল, পার্শ্বচরিত্র, নায়িকার বাবার ভূমিকায় অভিনেতা, ক্যামেরা-ম্যান, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সহকারী পরিচালক, প্রযোজক, বন্দুকধারী পাহারাদার, লটবহর, গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে তারা গিয়ে উঠল আফ্রিকায়। তারপরে সেখান থেকে বহু নিগ্রো মালবাহক, কিছু আরব পথ-প্রদর্শক নিয়ে গিয়ে চলল তারা জঙ্গলে। কিন্তু জঙ্গলে যাওয়ার কথা বলা যত সহজ, কাজে তত নয়। বিশেষ করে এত লটবহর নিয়ে। বহুকষ্টে তারা চলেছে জঙ্গল ঠেঙিয়ে।

প্রথম কয়েকটা দিন মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কেটেছিল তাদের, কেবল পরিচালকের বদ মেজাজে কিছু নিগ্রো মালবাহকের ক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া।

সেদিন তারা যে অঞ্চলটা দিয়ে যাচ্ছিল সেই অঞ্চলটা ছিল একদল পিগমী নরখাদক আদিবাসীদের। সব বিদেশীকেই তারা ভাবত শত্রু। আর তাছাড়া তারা শিকার করে তাদের মাংসও খেত।

সেদিন তারা নির্বিবাদেই চলছিল সবাইকে নিয়ে। হঠাৎ তিনজন মালবাহক নিগ্রো পড়ল লুটিয়ে তীরের ঘায়ে। রাইফেল নিয়ে ছুটেও গেল তারা, কিন্তু কাউকেও পেল না। ঘাবড়ে গেল মোট-বাহকদের দল।

যাহোক অনেক কষ্টে সহকারী পরিচালকের মধ্যস্থতায় বেশী টাকা কবুল করে আবার চলল তারা তার পরদিন। আর একটুখানি জায়গা পেরিয়ে গেলেই বিপন্মুক্ত হবে তারা। কিন্তু সেদিনও আবার। মোটবাহক কয়জন তো গেলই, শিকারীর ভূমিকায় যে অভিনয়

করবে সেও পড়ল লুটিয়ে তীরের ঘায়ে। অল্পের জন্য পরিচালক গেল বেঁচে।

সেদিন কিন্তু মোটবাহকের দলকে তারা আর রুখতে পারল না। সেদিন রাত্রিতেই তারা তাদের সর্দারকে নিয়ে পালিয়ে গেল শিবির ছেড়ে। তারা পড়ল আতান্তরে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না তারা। সামনে রয়েছে বিরাট ঘাসের জঙ্গল। এটা পেরুলেই মুক্তি।

যাহোক, অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে তারা নিজেরাই নিজেদের সব কাজ করে, মোট-টোট নিয়ে চলল ঘাস ঠেলে। বিরাট বিরাট ঘাস। গাড়িগুলি পর্যন্ত ডুবে যায় ঘাসে। এগিয়েই চলছিল তারা। হঠাৎ চারদিক থেকে আদিবাসীর দল, 'হা রে-রে-রে', চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। তীরের ঘায়ে লুটিয়ে পড়ল অনেকে। তারাও অবশ্য বসে ছিল না। রাইফেলের গুলিতে অনেক আদিবাসীই হল হতাহত।

এমন সময় হঠাৎ পরিচালক চিৎকার করে উঠল—আরে, নায়ক কোথায়?

—সত্যিই তো! নায়ক কোথায় গেল? সবাই চিৎকার করে উঠল।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। নায়ককে পাওয়া গেল না কোথাও।

আসলে হয়েছিল কি, নায়ক বলিষ্ঠ চেহারার হলেও সে ছিল ভীরু। আদিবাসীদের সঙ্গে যখনই কোন গণ্ডগোল হয়েছে, গুলি-গোলা ছুটেছে, তখনই সে নানা অছিলায় দূরে দূরে থেকেছে তাদের থেকে, কখনও বা লুকিয়ে রয়েছে গাড়ীর পেছনে। ঘাসের বনে এসেও তাই করেছিল সে। আদিবাসীরা আক্রমণ করতেই সে চট করে লুকিয়ে পড়েছিল ঘাসের ভিতরে। আর এটাই হল তার কাল।

গুলি গোলা থামলে যখন সে এগিয়ে যাচ্ছিল তার দলের দিকে তখনই সে একজন আদিবাসীর নজরে পড়ে যায়। প্রথমে আদিবাসীটিও ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু তারপরেই সে তার দলের লোকদের ডেকে

এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নায়কের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। সে পড়ল মহা বিপদে। এর আগে সে অনেক বিপদের কথা শুনেছে, পড়েছে বইয়ে, কিন্তু নিজের চোখে দেখল এই প্রথম। হঠাৎ তার স্নায়ুগুলি যেন সতেজ হয়ে উঠল। কেটে গেল তার ভীরুতা। হঠাৎ সে হুঙ্কার দিয়ে একটা আদিবাসীকে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে মারল আর একটার উপর। জীবনে এই প্রথম তার লড়াই, শক্তিও আছে। কি এক উন্মাদনায় মেতে উঠল সে। ঘুসি, লাথি মেরে নাজেহাল করে তুলল আদিবাসীদের। অবাক হয়ে গেল সে, এতখানি সাহস তার ছিল! কিন্তু এত করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। ধরা পড়ে গেল তাদের হাতে। তারা তখন তাকে হাত-পা বেঁধে গাঁয়ের একটা কুটিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখে দিল।

কুটিরের ভেতর ঢুকে সে তো অবাক! দেখে দু'তিন জন নিগ্রোর সঙ্গে ওদের নিগ্রো সর্দারও পড়ে আছে, হাত-পা বাঁধা।

—তোমরা? নায়ক জিজ্ঞাসা করল।তারা—আমাদের নিয়ে কি করবে?

—আমাদের খাবে।

কথা বলতে বলতে কখন যে রাত হয়ে গেছে খেয়ালও করেনি তারা। হঠাৎ ঢাক-ঢোলের শব্দে যেন আঁতকে উঠল সবাই। কিন্তু কিছু করার ছিল না তাদের। দুজন প্রহরী এসে একজনকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ভয়ে কাঁপতে লাগল নায়ক। ঘুম হল না সারারাত। তার পরদিনও আবার। তার পরদিন নিয়ে গেল সর্দারকে।

এদিকে টারজানের কিন্তু নজর এড়ায়নি কিছুই। চিত্র নির্মাতা দলটাকে সে দেখেছিল, দেখছিল পরিচালকের ব্যবহারও। লোকটা যে নিষ্ঠুর বুঝেছিল সে। তাই তার সহানুভূতি ছিল না তাদের উপর। দূরেই চলে গিয়েছিল সে। তাই তারা যেদিন আক্রান্ত হয় সেদিন সে দেখেনি কিছুই। আর এই নরখাদক আদিবাসীদেরও সে পছন্দ করত না। শত্রু বলেই ভাবত। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে

উৎসব করে যে তারা কি করে সে জানত, বিরক্তও লাগত, কিন্তু গা করেনি এতদিন।

পরপর তিনদিন ঢাক-ঢোলের বাজনায় সে বিরক্ত হয়েই ছিল, চতুর্থ দিন সন্ধেবেলায় বাজতেই রেগে উঠেছিল সে। নাঃ, দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে তাদের মানুষ খাবার ইচ্ছা। এটার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। সে তখনি ছুটল তাদের গাঁয়ের দিকে। তার পোষা সিংহটা কোথায় এক সাথী পেয়ে খেলছিল বলে তাকে আর নিল না সঙ্গে। একাই ছুটে গেল সে গাছের ডালে ডালে। গিয়ে দেখেই তো মাথায় রক্ত উঠে গেল তার। একটা বলিষ্ঠ দেহী, তারই মত দেখতে সাদা মানুষকে ঘিরে বর্শা উঁচিয়ে আসছে নরখাদকের দল। সামনের দুচারটার সঙ্গে আপ্রাণ লড়ছে লোকটা। আর সর্দার সামনে বসে রয়েছে একটা টুলে।—অপদার্থের দল, দাঁড়া, খাওয়াচ্ছি তোদের মানুষের মাংস। টারজান ডালে ডালে লাফিয়ে ঠিক চলে গেল সর্দারের মাথার উপর। আর তারপরেই ঝট করে তার দড়ির ফাঁসটা সর্দারের গলায় পরিয়ে এক ঝটকায় টেনে তুলে নিল গাছে, পাতার আড়ালে। ভয়ে আঁতকে উঠল নরখাদকের দল। সর্দারের কথা আর শুনতে পেল না তারা, দেখতে তো পেলই না। চুপচাপ তারা গাছের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টারজান বলে উঠল—সর্দার, দেখতে পাচ্ছ আমাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু! আপনি দেবতা। চিঁ চিঁ করে উঠল সর্দার।

—না-আ। চিৎকার করে উঠল টারজান। —আমি টারজান। আমি যে কোন সময়ে তোমাদের যে কোন লোককে শেষ করে দিতে পারি তা জান?

—আপনি গাছের উপর, আবার গাছের তলাতেও! অবাক হয়ে গেল সর্দার! আপনি তা হলে—!

—প্রস্তুত হও। চিৎকার করে উঠল টারজান।

—আজ্ঞে না, আমায় ছেড়ে দিন প্রভু। বলে কেঁদে উঠল সর্দার।

—ছেড়ে? টারজান বলল—দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে কথা



দিতে হবে আর কোনদিন তোমরা মানুষের মাংস খাবে না।

—দিচ্ছি প্রভু, কথা দিচ্ছি। কাঁপতে লাগল সদার।

—আর একটা কথা, তোমার লোকদের বল, তারা যেন বন্দীর বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের দরজা খুলে দেয়।

কি আর করবে সর্দার? আদেশ তাকে দিতেই হল। আর লোকগুলিও তখনই বন্দীকে ছেড়ে দিল। টারজানও সর্দারকে ঝপ করে মাটিতে ফেলে দিল।

অবাক হয়ে নায়ক টারজানের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি কে?

—আমি টারজান।

—টারজান! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নায়ক তার দিকে! এ টারজান? রক্তমাংসে গড়া মানুষ।

—এস আমার সঙ্গে। হাঁটতে লাগল টারজান।

তার পেছনে যেতে যেতে নায়ক বলল—কিন্তু তুমি না থাকলে আমার আর রক্ষা ছিল না আজ। তোমাকে একটা ধন্যবাদ—।

—ঠিক আছে, এস। চলতেই লাগল টারজন।

স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল নায়কের, সেদিনের রাতটা। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু ভোরবেলায় উঠেই যে টারজান কোথায় চলে গিয়েছিল জানে না নায়ক। ঘুম থেকে উঠেই সামনে কতগুলি ফল পেয়ে গোগ্রাসে গিলেছিল সে। কখন যে টারজান ফলগুলি রেখে গিয়েছিল জানে না সে। পাশে বসে সিংহটা দেখছিল তাকে। খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে টারজানের জন্য বসে রইল সে।

এদিকে শিবিরে হৈ চৈ কাণ্ড! নায়িকা ও তার নকল মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আরব প্রহরীরাই রাত্রির অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে গেছে তাদের।

তার পরদিন ভোরে উঠেই পরিচালক ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বনে। কোথায় নিয়ে গেছে মেয়েদের কে জানে! একে বনের পথ, পদে পদে বাঁধা, তাতে আরবরা গেছে ঘোড়ায় চেপে।

টারজান অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিল তাদের। কিন্তু পরিচালকের নিষ্ঠুরতার কথা মনে ছিল তার। তাই সে তাদের দেখা দেয়নি। কিন্তু একটু পরে যখন সে দেখল তারা দুইজন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা আরব যেখানে আগুন জ্বালিয়ে বসেছিল সেখানে গিয়ে উঠল রাইফেল দেখিয়ে, তখন সে নিশ্চিন্ত মনে চলে গিয়েছিল। নায়কের কাছে গিয়ে বলেছিল—তোমার দুইজন লোকের খোঁজ পেয়েছি। কাল সকালে নিয়ে যাব তোমাকে।

আরবটি ছিল তাদের দলের সেই আরবগুলিরই একজন, যারা তাদের নায়িকা ও তার নকলকে ধরে নিয়ে যায়।

আরবটাকে তার দলের আরবরাই তাড়িয়ে দিয়েছিল এক ছুতো ধরে। তাতে হীরের ভাগ দিতে হবে না তাকে। এই হীরে নিয়েই গণ্ডগোল।

তারা চিত্রনির্মাতার দলটার সঙ্গে থাকতে বহুদিন হীরক উপত্যকার কথা শুনেছিল দলের লোকদের মুখে। একটা ম্যাপ নাকি পেয়েছে তারা। তাই তারা এক সুযোগে তাদের ম্যাপশুদ্ধ নিয়ে গিয়েছিল। অনেক আগেই নিত, কিন্তু এত লোকজনের মধ্যে সুযোগ পাচ্ছিল না। তাই সেদিন তারা যখন আদিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত এই সুযোগটাই তারা নিয়েছিল।

কিন্তু একদিন রাত্রিতে পালিয়ে যায় মেয়ে দুটি। তাই ঝগড়া করে তারা তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে। ম্যাপটাতো আছে। হীরে পেলে ভাগ দিতে হবে না।

মেয়ে দুটি পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। আরবদের দুটি ঘোড়া নিয়েই তারা পালিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যাবে তারা, পথঘাট চেনে না। যেতে যেতে হঠাৎ তারা পড়ে এক সিংহের খপ্পরে। নায়িকার নকল মেয়েটির ঘোড়ার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সিংহ। ফলে ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়েছিল

মেয়েটি, তাই রক্ষা। সে তাড়াতাড়ি একটা গাছের উপরে উঠে প্রাণ বাঁচায়। আর নায়িকার শিক্ষিত আরবী ঘোড়া সিংহ দেখে দেয় ছুট আরব শিবিরের দিকে। কিছুতেই সে থামাতে পারল না ঘোড়াটাকে। ফলে, সে আবার আরবদের হাতে পড়ল ধরা।

সেদিন রাত্রিতে নায়িকার নকল মেয়েটি গাছ থেকে আর নামেনি। সিংহটাও ঘোড়ার মাংস খেয়ে ভোর হতেই চলে যায়। তারপর মেয়েটি গাছ থেকে নেমে চলতে থাকে সামনে। কিন্তু কোথায় যাবে সে, কিছুই চেনে না। ভয়ে, ক্লান্তিতে পা যেন আর চলে না। একটা গাছের নীচে বসে ভাবতে থাকে সে কি করবে। এমন সময় ছুটি গরিলা এসে তাকে ধরে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েই কেমন থমকে যায় সে তাদের মুখে ইংরেজী কথা শুনে।

একটি গরিলা বলল—না, ভয় নেই তোমার। আরামে থাকবে। তোমাকে আমি আমাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

—দেবতা! বিস্মিত হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল তাকে।

—হ্যাঁ। তিনি মানুষ।

গরিলাটি বলল—তিনি বুড়ো হয়েছেন। তাই—।

মেয়েটি ভয় পেলেও, ঘাবড়ে যায়নি। বলল—তোমরা তো বেশ ইংরেজী কথা বলতে পার?

—কেন পারব না? বলে অপর গরিলাটি বলল—আমাদের দেশের নামই তো ইংল্যাণ্ড। অষ্টম হেনরী রাজত্ব করেন এখানে। তার সাত রাণী। তাই তো তোমাকে আমি নিয়ে যাব রাজার কাছে।

—না, তুই না। আমি, আমি নেব মেয়েটিকে দেবতার কাছে। বলে রুখে উঠল প্রথম গরিলা।

লেগে গেল তুমুল লড়াই, ছুই গরিলায়।

মেয়েটি এই ফাঁকে দিল দৌড়। কিন্তু পারল না পালিয়ে যেতে। লড়াই থামিয়ে ঠিক গিয়ে ধরে ফেলল তাকে।

তারপর তারা দুইজনে চলল তাদের নগরে মেয়েটিকে নিয়ে। অবাক হয়ে গেল মেয়েটি তাদের এই নগরটি দেখে। দুটো প্রাসাদও আছে পাশাপাশি। একটি রাজার, অপরটি দেবতার।

কিন্তু সেখানে মেয়েটি পড়ল আবার আর এক যন্ত্রণায়। রাজার সাত রাণী। তারা রাণীত্ব হারাবার ভয়ে খোঁচাতে লাগল তাকে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সে।

পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান আরবটাকে ধরেছিল বটে, কিন্তু রাখতে পারেনি। রাত্রিতে তারা ঘুমিয়ে পড়লেই সে পালিয়ে যায় ঘোড়ায় চড়ে।

আরবটা পালিয়ে কিন্তু আর কোথাও যায়নি, সে সোজা চলে গিয়েছিল তাদেরই দলের কাছে। মেয়েটাকে পেয়ে গিয়েছিল বলে অন্য আরবদুটো তাকে নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। দলেই নিয়েছিল আবার। তাদের কাছেই সে শুনেছিল অপর মেয়েটি পালিয়ে গিয়ে সিংহের মুখে পড়েছিল। আর ফিরতে পারেনি সে।

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল তখন। আরবগুলি মেয়েটিকে নিয়ে এগিয়ে চলেছিল হীরক উপত্যকার দিকে। হীরক উপত্যকা কিনা জানে না নায়িকা, কিন্তু যেতেই হচ্ছিল তাকে তাদের ভয়ে। সে নাকি ম্যাপের সব কিছু জানে। তাই তাকেই দেখিয়ে দিতে হবে হীরক উপত্যকা। যেতে যেতে একটা নদী দেখে আরও উল্লসিত হয়ে উঠেছিল তারা। ম্যাপে নাকি এটা দেখানো আছে। খানিক গিয়েই একটা জলপ্রপাত।

মেয়েটিও কম অবাক হয়নি। সত্যিই তো, ম্যাপে এদুটোর কথা আছে। আর একটু এগিয়ে একটা গ্রানাইট পাথর স্তম্ভ। স্তম্ভটার কথাও আছে ম্যাপটাতে। তারপরেই একটা খাড়াই পাহাড়। এটা পেরিয়েই উপত্যকা।

পাহাড়টার কাছে গিয়েই দুটি আরব সেই পালিয়ে আসা আরবটিকে বলল—তুমি মেয়েটিকে নিয়ে এখানেই থাক। দেখবে, যেন না

পালায়। আমরা দুজনেই গিয়ে পাহাড়টায় উঠব। বলে তাদের দুটি ঘোড়া সেখানে রেখে তারা গিয়ে উঠতে লাগল পাহাড়ে। তাকিয়ে রইল তারা দুইজন।

অনেকটা উঠেছে তারা। হঠাৎ কোথেকে একদল গরিলা এসে তাদের করল আক্রমণ। চিৎকার করে ছুটোছুটি করতে লাগল তারা। কিন্তু যাবে কোথায়? লাফ দিয়ে পালাতেও পারছে না। গরিলার দল তাদের রাইফেলগুলি দুমড়ে মুচড়ে টুকরো-টুকরো করে আছড়েই শেষ করে দিল তাদের।

তা দেখে নীচে নায়িকা ও আরবটি দুজনেই উঠল চিৎকার করে। আর তক্ষুনি কোথেকে দুটো গরিলা এল তাদের দিকে ছুটে। তা দেখে আরবটি তো আরবী ভাষায় কি বলে দিল ছুট ঘোড়া-টোড়া ফেলে। নায়িকার কথা তার মনেই নেই। ছুট, ছুট, ছুট। ছুটতে ছুটতে কোথায় যে যাচ্ছে সে কিছুই মনে নেই, তার।

নায়িকাও ভয় পেয়ে লাগিয়েছিল ছুট। কিন্তু মেয়েমানুষ, যাবে কোথায়? একটা গরিলা এসে ধরে ফেলল তাকে। চিৎকার করে কেঁদে উঠল নায়িকা।

অপর গরিলাটা বলল—আরে, দেবতার কাছ থেকে পালিয়ে এল কি করে এটা? বলেই নায়িকাকে বলল—এই, কি করে পালালে তুমি?

নায়িকা তো অবাক? ইংরেজী কথা বলে এরা? বলল—পালিয়ে? আমি পালাব কেন?

—কেন, তোমাকে সেদিন ধরে নিয়ে যায় নি?

—না তো! কাউকে ধরেছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তার মাথায় রুমাল ছিল?

—হ্যাঁ।

নায়িকা বুঝল তার নকল মেয়েটি যেভাবেই হউক সিংহের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে তাদের হাতে পড়েছে।

অন্য গরিলাটা তখন তাড়া দিয়ে উঠল প্রথম গরিলাটাকে। বলল—এই, দেরি করছ কেন? চল, নিয়ে যাই তাকে।

তুমি আস এটাকে নিয়ে। আমি যাচ্ছি এগিয়ে।

এটাই তো চেয়েছিল সেই গরিলাটা। তাড়াতাড়ি সে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও। আমি এলুম বলে।

তারপর সেই গরিলাটা যেই এগিয়ে নগরের মধ্যে ঢুকে গেল সে করল কি, মেয়েটাকে চট করে কাঁধে তুলে নগরের বাইরে বনে এক গুহায় রেখে দিয়ে নায়িকাকে বলল—তুমি এখন এখানেই থাক। আমি আসছি। বলে সে চলে গেল।

গুহাটা এমন একটা জায়গায় যে পালিয়ে যাওয়ারও পথ নেই তার। কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না নায়িকা।

আরবটা গরিলার ভয়ে ছুটতে ছুটতে কোথায় যে যাচ্ছিল কিছুই তো খেয়াল ছিল না তার। এই অবস্থায় সে গিয়ে পড়ে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের সামনে। তারাও তো তাকেই খুঁজছিল। তারা তো তখনই ছুটে গিয়ে চেপে ধরল তাকে—শয়তান! কোথায় পালিয়েছিলি বল?

আর ঠিক এমন সময়েই কোত্থেকে টারজানও এসে হাজির। টারজান এগিয়ে গিয়ে পরিচালককে বলল—কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? আমি তোমাদের খুঁজছি।

তাদের সব কথা শুনে টারজান আরবটিকে আরবীতে জিজ্ঞেস করল—মেয়েছুটি কোথায়?

সে বলল একটিকে সিংহ খেয়ে ফেলেছে, আর একটিকে ধরেছে গরিলা।

—গরিলা? কোথায়? বলে টারজান তার কাছ থেকে মোটামুটি জায়গাটা জেনে নিয়ে পরিচালক ও ক্যামেরা.ম্যানকে সব বলে

বলল—তোমরা এখানে থাক। আমি মেয়েটিকে খুঁজে আনব।

—আমরাও যাব তোমার সঙ্গে। দুজনেই বলে উঠল একসাথে।

—না। টারজান বলল—তোমরা তো খাওনি কিছু। দাঁড়াও, একটা হরিণ এনে দিই তোমাদের। বলে একলাকে কোথায় চলে টারজান।

তারা তো অবাক। একটু পরেই সে কাঁধে করে একটা হরিণ এনে তাদের সামনে ফেলে দিয়ে বলল—তোমরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর, আমি আসছি। বলে সে চলে গেল পাহাড়ের দিকে। সন্ধে হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে।

এদিকে গরিলাটা নায়িকাকে গুহায় রেখে চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এসে তাকে বলল—এই, শিগগীর লুকিয়ে পড়। সেই গরিলাটা টের পেয়ে আসছে এদিকে। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি তাকে তাড়িয়ে দিতে। বলেই সে চলে গেল।

নায়িকা পড়ল মহা বিপদে। কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু একটু পরেই গরিলাটা এসে বলল—দিয়েছি তাড়িয়ে। কিন্তু এখানে আর না, তোমাকে রাখতে পারব না এখানে। চল অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে। বলেই সে ঝট করে নায়িকাকে কাঁধে তুলে ছুট।

ঠিক এই সময়েই টারজান এসে পাকড়াও করল তাকে।

তাকে দেখেই তো নায়িকা উঠল চিৎকার করে—নায়ক, আমাকে বাঁচাও।

গরিলাটাও উঠল দাঁত খিঁচিয়ে।

টারজান তৈরী হয়েই ছিল। লেগে গেল তুমুল লড়াই। কিন্তু টারজানের সঙ্গে কি আর সে পারে? গরিলার সঙ্গে যুদ্ধ করে অভ্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই গরিলাটা লুটিয়ে পড়ল টারজানের ছুরির ঘায়ে। আর উঠল না।

নায়িকা তখন ছুটে এসে টারজানের গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল—নায়ক, নায়ক, এতবড় গরিলাটাকে ঘায়েল করলে তুমি? এত সাহস তোমার? কই কোনদিন দেখিনি তো!

টারজান মুচকী হেসে বলল—চল, তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান সবাই—। এস। বলে টারজান তাকে নিয়ে তুলে দিল পরিচালকের হাতে।

পরিচালকের চোখে জল এসে গেল তাকে পেয়ে। বলল—বেচারা নকল মেয়েটা সিংহের খপ্পরে পড়ে—।

—না তো। নায়িকা বলল—তাকেও তো গরিলারা আটকে রেখেছে।

—তাই নাকি। তবে তো খোঁজ করতে হয় তার। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি।

—না। টারজান বলল—তুমি পারবে না। আমি যাব। বলেই সে ছুটে চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

নগরের দরজায় কেউ ছিল না তখন। প্রাসাদের বারান্দায়ও ছিল না কেউ। সে চুপিচুপি এঘর ওঘর করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল মেয়েটিকে। হঠাৎ সে একটা ঘরে মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়াতেই পেছন থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঘরের দরজাটা।

তন্দ্রার মত পড়েছিল মেয়েটি তখন। ঘরের কোণে ছোট্ট একটা মশাল। মেয়েটি পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠেছিল —একি! নায়ক তুমি?

—হ্যাঁ, তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

—আমাকে? হাসল মেয়েটি। —কিন্তু নিজেই যে বন্দী হয়ে গেলে।

নিজের অবস্থাটা যে টারজান বোঝেনি তা নয়। বলল—দেখি না চেষ্টা করে। বলতে না বলতেই কে যেন হেসে উঠল জানালা দিয়ে। একটা মাত্র ছোট্ট জানালা, মোটা লোহার শিক লাগানো। সে

তাকিয়ে দেখে একটা গরিলা, মুখটা মানুষের, বৃদ্ধ, হাসছে তার দিকে তাকিয়ে।

লোকটি বলল—তোমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি আমি। নিজেই যখন এসেছ। সুন্দর স্বাস্থ্য। কাজ হবে আমার।

—আমি অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছি। তারপর প্রাণীর জন্মগত ও দেহগত উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণা করতে চলে আসি আফ্রিকার গরিলার রাজ্যে। আমি তাদের অনেক পরিবর্তন করতে পেরেছি। ইংরেজী ভাষাও শিখিয়েছি, দেখতেই তো পেয়েছ। আমি নিজেও তাদের দেহের জীবকোষ গ্রহণ করেছি। ফলে দেখতেই পাচ্ছি গরিলার মতই হয়ে গেছে আমার দেহ। যাহোক বৃদ্ধ হয়েছি তোমাকে খেয়ে আবার তরুণ হব। যাকগে, বিশ্রাম কর। আমি পরে আসব আবার। বলে সে চলে গেল।

—অদ্ভুত। টারজান মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল—তোমাকে কতদিন এখানে এনে রেখেছে?

—তা বেশ কয়েকদিন। তা, দেখছি, তুমি তো কম অদ্ভুত নও। এমন পোশাক পরেছ কেন?

—যাকগে, তর্ক পরে করা যাবে। বলে টারজান তাকে একটা দেয়ালের কাছে এনে বলল—উপরের দিকে তাকিয়ে দেখ বাতাস আসার একটা ফাঁক রয়েছে ছাদের গম্বুজটার কাছে। একটা মানুষ যেতে পারে সেখান দিয়ে। তুমি আমার কাঁধে উঠে চলে যাও ছাদে। তারপর এই দড়িটা বেঁধে ঝুলিয়ে দাও নিচে। আমি উঠে পড়ব।

তাই করল তারা। যাবার সময় টারজানের গা লেগে মশালটা গেল গড়িয়ে। তাতে সুবিধেই হল তাদের। প্রায় নিভু নিভু হয়ে এল মশালটা। চারিদিক অন্ধকার।

টারজান দড়িটা খুলে গম্বুজটা থেকে বেরোতে যাবে মেয়েটাকে নিয়ে কার পায়ের আওয়াজে আবার লুকিয়ে পড়ল তারা গম্বুজের

নীচে। শুনতে পেল কে যেন বলছে—রাজামশাই নাচের অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে সবার সঙ্গে ঘুমে অচেতন প্রভু।

প্রভু! টারজান বুঝল ছাদে দেবতা দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশে কে আর একজন।

এমন সময় কে একজন দৌড়ে এসে খবর দিল—বন্দীরা পালিয়েছে প্রভু। ঘরে আগুন লেগে গেছে মশাল থেকে।

তারপরেই লেগে গেল ধুন্দুমার। হৈ হট্টগোলে ভরে উঠল চারদিক। টারজানও এই ধোঁয়ায় বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারল না। বেরিয়েই আসতে হল তাদের। আর তখনি তাকে দেখে কয়টা গরিলা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কিন্তু সে টারজান, অনেক কায়দা জানে। ছুরির ঘায়ে পটাপট কয়টাকে শুইয়ে দিল সে। কিন্তু একটা ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে ফেলল টারজানকে। শেষই করে ফেলত। প্রভুই বাঁচিয়ে দেয় তাকে। তাকে তো তার দরকার। এই ফাঁকে মেয়েটি যে কখন পালিয়ে গেছে সিঁড়ি দিয়ে খেয়াল করেনি কেউ। হঠাৎ মনে হতে হুদ্দাড় করে নেমে গেল বাকী গরিলাগুলি। এমন সময় জ্ঞান ফিরে আসে টারজানের। চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সমস্ত প্রাসাদটাতেই আগুন ধরে গেছে।

প্রথমে প্রভু ঠিক অতটা বোঝেনি। কিন্তু যখন বুঝল তখন আর উপায় ছিল না তার। ছুটোছুটিই সার।

এত আগুন দেখে টারজানও ঘাবড়ে গিয়েছিল জ্ঞান ফিরে পেয়ে। কিন্তু সে আর দেরী করল না। ছাদ থেকে উঁকি মেরে একদিকে একটা খোলা ছাদ দেখে লাফ দিতে যেতেই প্রভু এসে বলল—আমাকেও নিয়ে যাও। আমি বৃদ্ধ। এতটা লাফ দিতে পারব না।

টারজান বলল—কেন? নিয়ে যাব কেন? আগুনে পুড়বে তুমি, তাতে আমার কি?

—না, না, দয়া কর।

—দয়া? হুম্, করতে পারি। যদি কথা দাও আর কোন ক্ষতি

করতে চেষ্টা করবে না আমাদের। আমাদের চলে যেতে সাহায্য করবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, করব। কথা দিলাম। দয়া করে আমাকে বাঁচাও।

—ঠিক আছে, চল। বলে টারজান পেছন ফিরে তাকিয়ে মেয়েটিকে না দেখে বলল—আরে? মেয়েটি গেল কোথায়? তবে কি সে পালিয়ে যেতে পেরেছে?

মেয়েটি রাজার খপ্পরেই পড়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে না যেতেই সে পড়েছিল ধরা। তারপর রাজার গরিলারাই তাকে নিয়ে গিয়ে তুলে রাজ অন্তঃপুরে।

বৃদ্ধ তার নিজের গুহায় এসে টারজনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল—বল, এখন কি করব?

টারজান বলল—তোমার লোকদের নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করতে হবে মেয়েটিকে।

—হ্যাঁ, করছি। বলেই বৃদ্ধ একজন গরিলাকে ডেকে আদেশ করল—আমার বিশ্বস্ত গরিলাদের এখানে এনে সমাবেশ কর। তাদের বল এক্ষুণি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে শাস্তি দিতে হবে রাজাকে। উদ্ধার করতে হবে মেয়েটাকে।

—যে আজ্ঞা প্রভু। বলে গরিলাটা চলে গেলে টারজান বলল—

—গরিলারা তোমার কথা বেশ শোনে তো। যুক্তিও যেন বোঝে?

—হ্যাঁ, বৃদ্ধ বলল—বোঝেই তো।

যাহোক, তার কিছুক্ষণ পরে রাজার প্রাসাদ জুড়ে লেগে গেল লড়াই বৃদ্ধের ও রাজার দলের গরিলাদের মধ্যে। রাজার দলের গরিলারা গেল হেরে। রাজা তখন বেগতিক দেখে অন্তঃপুরে গিয়ে মেয়েটাকে হঠাৎ তুলে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে ছুটল বনে। কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ। বনে গিয়েও সে নিস্তার পেল না। কোত্থেকে এক সিংহ এল ছুটে। রাজা তখন হঠাৎ মেয়েটাকে সিংহের মুখে ছুঁড়ে

দিয়ে ছুটে যেতেই সিংহ রেগে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলল। এই ফাঁকে পালিয়ে গেল মেয়েটা। রাত শেষ হয়েছে তখন।

কিন্তু পালিয়ে গিয়েও মেয়েটা পড়ল একটা হিংস্র মানুষের হাতে। সঙ্গে একটা মেয়ে। এই দুটোই ছিল সেই বৃদ্ধের পরীক্ষার পশু।

ঠিক তখনই টারজান গিয়ে হাজির। টারজানকে দেখেই মানুষটা তাকে একজন ভাগীদার বলে চিৎকার করে উঠল গরিলা ভাষায়—চলে যাও তুমি। নাহলে—।

কথাও শেষ হয়নি তার টারজান গেল ছুটে।

প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও একটু পরেই কিন্তু নায়িকার নকল মেয়েটি টারজানকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল—নায়ক, আমাকে বাঁচাও।

টারজান কি আর স্থির থাকতে পারে?

লোকটাকে তারপর ঘুসির পর ঘুসি দিয়ে অজ্ঞান করে তাকিয়ে দেখে হিংস্র মেয়েটা ছুটছে নকল মেয়েটাকে ধরতে। টারজানও তখন ছুটে পাহাড়ে উঠে মেয়েটাকে ধরে বেঁধে ফেলল তার দড়ি দিয়ে।

এখন সুযোগ বুঝে অন্য গরিলাগুলি পাহাড়ে উঠতে যেতেই টারজান পাথর ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিল সব কটাকে।

তারপর সারাদিন ধরে তারা সেখানে বিশ্রাম করে কিছু ফল পেড়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে সন্ধে বেলায় চলল শিবিরের দিকে। পথে একটা নালা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ নকল মেয়েটি লাফিয়ে একটা হীরে কুড়িয়ে পেয়ে চিৎকার করে উঠল—আরে, হীরে। আরও কত, দেখ, দেখ নায়ক। পাথরগুলি জ্বলছিল অন্ধকারে।—আমি নিতে পারি?

—যত পার নাও না। হিংস্র মেয়েটি বলল।

পাথরগুলি কুড়োতে কুড়োতে নকল মেয়েটি বলে উঠল—তাই তো বলি হীরক উপত্যকা কেন এটার নাম।

তারপর সারারাত তারা চলে ভোরবেলায় গিয়ে উঠল শিবিরে।

শিবিরের সবাই তো তাদের ফিরে পেয়ে খুব খুশি। হৈ হুল্লোড়ে কেটেও গেল কয়দিন। হিংস্র মেয়েটার সঙ্গে পরিচিতও হল তারা। হিংস্রতাও কমে গেল তার দিনে দিনে। পরিচালক তো এর মধ্যে কয়েকটা দৃশ্যের ছবিও তুলে ফেলেছে হিংস্র মেয়েটার একটা নতুন ভূমিকা লিখে। এমন সময় একদিন হলিউডের একটা টেলীগ্রাম পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল সবার। ফিরে যেতে হবে তাদের। টারজান একসময় কতগুলি নিগ্রো মালবাহকও জোগাড় করে দিয়েছিল তাদের। রওয়ানা হয়ে গেল তারা। অনেকটা পথ এগিয়েও দিয়ে এসেছিল টারজান। বলে গিয়েছিল—তোমরা বন্দরের দিকে চলে যাও। আমি বন্দরেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।

কিন্তু দেখা আর করা হল না তার। তার ইচ্ছে ছিল নায়ককে নিয়ে এসে চমক লাগিয়ে দেবে তাদের। অসুস্থ অবস্থায় এক আদিবাসী গাঁয়েই তো সে রেখে এসেছিল তাকে। সেখানে গিয়ে তাকে আর পায়নি সে। তার আগেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সেই জ্বরে। পালিয়ে এসেছিল টারজান দুঃখে। তাই বন্দরে গিয়ে সে আর কারোর সঙ্গে দেখা করেনি। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল তাদের দূর থেকে। চলে যাচ্ছে তাদের জাহাজটা।



নকল বনাম আসল টারজান

টারজান কত জায়গায়ই ঘুরে বেড়ায়। ভয় নেই, ডর নেই। সেই টারজান একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখে কতগুলি নিগ্রো একটা তাঁবু খাটাচ্ছে। আর দুইজন সাদা মানুষ কথা বলছে পাশে নদীটার দিকে চেয়ে। একটু পরে একটা নৌকো বেয়ে আর দুজন এলে তারা তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল। তাদের একজনকে দেখেই তো চমকে উঠল টারজান, আরে! একে না তাড়িয়ে দিয়েছিলাম? আবার এসে জুটেছে দুর্বৃত্তটা? সঙ্গে নিয়ে এসেছে আর একটাকে?

গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়েই তাদের দেখছিল টারজান। হঠাৎ তার কানে এল ছুর্বৃত্তটা বলছে—চিনি না আবার? নিশ্চয়ই চিনি টারজানকে।

খটকা লাগল টারজানের—তবে কি তাকেই চায় তারা? আর একটু এগিয়ে সে শুনতে পেল, শিকারীটি বলছে—এক ধনী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মেয়েও এসেছিল শিকারে। আমিও ছিলাম তাদের সঙ্গে। হঠাৎ একদিন টারজানের সঙ্গে তাদের এমন খাতির হয়ে যায় যে মেয়েটি একদিন তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। সেও আজ বহুদিনের কথা। পরে শুনেছি সে নাকি মেয়েটির গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। তার বাবা মেয়ের জন্য একহাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে, আর টারজানকে ধরতে পারলে দেবে পাঁচশ পাউণ্ড। আমরা তাই এখানে এসেছি যদি পাই তাকে।

অবাক হল টারজান। আমি তো কোনদিন কাউকে নিয়ে যাইনি। তবে কি আমার মত দেখতে কোন লোক আমার নামে এসব করে বেড়াচ্ছে? দেখতে হচ্ছে তো। তবে তার আগে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে এলে হয়।

অনেক ভেবেও টারজান ঠিক করতে পারল না কে মেয়েটি। সেদিন সারারাত সে গাছেই কাটাল। পরদিন ভোরে একটা হরিণ মেরে খেয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা বর্শা এসে গাছে বিঁধল। ঠিক তার পাশে। চট করে সে সরে গিয়ে লুকিয়ে দেখল একটা আদিবাসী তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে ছুটে গিয়ে তার দলের কাছে গিয়ে যেন কি বলছে।

অবাক হয়ে গেল টারজান! আদিবাসীরা তো তার বন্ধু, হঠাৎ তাকে বর্শা ছুড়ল কেন? টারজানকে তো তারা চেনে, কিন্তু—।

সেদিন রাত্রেই সে তাদের গাঁয়ে হানা দিয়ে একটা আদিবাসীকে ধরে নিয়ে এসে শুনল তাদের গাঁয়ে ঢ্যাড়া পিটিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে

টারজান তাদের ছেলে ও মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতে আসছে। তাছাড়া পাহাড়টার একটু দূরে যে আদিবাসীরা থাকে তাদের সর্দার বলেছে টারজান নাকি এখন খারাপ হয়ে গেছে। তারা নাকি দেখেছে, সে একটা সাদা মেয়ের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে।

তার পরদিনও সেই একই ব্যাপার। তার বন্ধু এক সর্দারের ছেলে বর্শা নিয়ে আক্রমণ করেছিল তাকে সে তাকে। বলেছিল, শিবিরের সাদা মানুষেরা তাদের বলেছে টারজানকে ধরতে পারলে পুরস্কার দেবে। টারজান তাদের একটি মেয়ে নিয়ে চলে গেছে, তাই তারা তাকে ধরতে চায়।

এদিকে টারজান নামধারী লোকটা সাদা মেয়েটাকে নিয়ে যেতে যেতে পরিশ্রান্ত হয়ে একজায়গায় বসে মেয়েটাকে বলল—তুমি জান তো, তুমি দেবী।

—দেবী! অবাক হল মেয়েটি।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সে বুঝল লোকটাকে। হয়ত তার মাথারই ঠিক নেই। বলল—তুমি আমাকে নিয়ে যেও না। শিবিরেই দিয়ে এস। না হলে—।

কথাও শেষ হয়নি তার, হঠাৎ কতগুলি নরখাদক এসে বন্দী করে ফেলল তাদের।

লোকটি কিন্তু ভয় পেল না। মেয়েটিকে বলল—যেভাবেই হোক আমি পালিয়ে যাব, তোমাকে নিয়ে যাব পরে। বলেই সে হঠাৎ একটা হাঁক দিতেই কোত্থেকে কতগুলি গরিলা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দলটার উপর। পালিয়ে গেল লোকটি। পালিয়ে গিয়েছিল দলটাও। কিন্তু মেয়েটিকে ছাড়েনি তারা।

টারজান কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, লোকটা কে? গাছে শুয়ে শুয়েই ভাবছিল সে সেদিন রাতে। চোখে ঘুম আসছিল না। হঠাৎ ঢাকের আওয়াজে বিরক্ত হয়ে সে ভাবল, আবার কাকে নিয়ে এসেছে নরখাদকের দল খাবে বলে? কিছুতেই এ অভ্যাস

গেল না তাদের। বিরক্ত টারজান ছুটে নরখাদকদের গাঁয়ে গিয়েই চমকে উঠল একটা সাদা মেয়েকে দেখে। এই কি সেই মেয়েটা?

ততক্ষণে যাদুকর পুরোহিত একটা ছুরি নিয়ে মেয়েটার দিকে ছুটে যেতেই টারজান ঝট করে ছুড়ল এক তীর। পুরোহিতটা পড়ে গেল তীরের ঘায়ে। ঘাবড়ে গিয়ে নরখাদকের দল হৈ চৈ করে উঠতেই পড়ে গেল আর কয়েকটা তীরের ঘায়ে। টারজান তখন একলাফে তাদের সামনে পড়তেই, 'মা-রে বাবা-রে' করে ছুটে পালাল নরখাদকের দল। তারপর সে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে আর এক লাফে গাছে চড়ে হাওয়া।

মেয়েটাও হতভম্ব। বলল—তুমি আমাকে তোমাদের রাজ্যে নিয়ে যেওনা টারজান। আমি ইংরেজ। দেবী হতে চাই না।

—কি বলছ তুমি? অবাক টারজান!

—বুঝেছি। আমারই মত দেখতে একটা লোক আমার নাম ধরে এসব করে বেড়াচ্ছে। তাকেই তো খুঁজছি আমি। সে প্রতারক। রেগে উঠল টারজান।

মেয়েটি তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল—এখন আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছে। তোমার গলার স্বর আলাদা। তুমিই আসল টারজান?

—হ্যাঁ, চল। দিয়ে আসি তোমাকে শিবিরে।

—তুমি আমাদের শিবির চেন?

—চিনি। চল। বলে টারজান মেয়েটিকে নিয়ে চলল শিবিরের দিকে।

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না সে। তাকে দেখেই দুর্বৃত্ত গুলি করে। মাথায় গুলি লেগে পড়ে যায় টারজান। তারা তখন ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে বলে—এই তো মেয়েটি।

থতমত খেয়ে যায় মেয়েটি। বলল—তাকে গুলি করলে কেন? তোমরা কে?

—যাকগে, চল। বলে দুর্বৃত্ত মেয়েটির হাত ধরতেই, এক ঝটকায় সে তার হাত ছাড়িয়ে বলল—

—না, একে দেখ আগে।

—আরে, তুমিও যেমন। বলে দুর্বৃত্ত তাকে জোর করে নিয়ে এল শিবিরে।

তাকে পেয়ে সবাই তো ছুটে এল আনন্দে। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষেপে গেছে মেয়েটি। লাফিয়ে এসে সে আমেরিকান ভদ্রলোককে বলল—কাকে পাঠিয়েছিলে তোমরা? সে টারজানকে গুলি করেছে। টারজান আমাকে নরখাদকদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, আর তাকেই করেছে গুলি?

—তার মানে? সবাই অবাক।

দুর্বৃত্ত বলল—তার মুখে শুনলে তো, টারজানকে ঘায়েল করেছি আমি? উদ্ধারও করেছি তাকে?

—না। মেয়েটি যেন ক্ষেপে গেল।—কি বলছে লোকটা? এই টারজান তো ধরেনি আমায়। সে আমায় বাঁচিয়েছে। চল না যাই, দেখে আসি, কি হল তার।

—ঘাবড়ে গেল আমেরিকান ভদ্রলোক। বলল—তু-তুমি বলছ, এক টারজান তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আর একজন তোমাকে বাঁচিয়েছে? তাহলে—তো—যেতেই হয়। বলে সে সবাইকে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

—আরে, তোমরাও যেমন, এতক্ষণে কি আর সে থাকে এখানে? হায়েনা আছে না—? চল, চল, আমার পুরস্কারটা—। দুর্বৃত্ত বলল।

—না, পুরস্কার কেউ পাবে না। মেয়েটি বলল—যে পেত পুরস্কার তাকে গুলি করে চাইছে পুরস্কার।

—সে দেখা যাবে। বলে হেসে দুর্বৃত্ত চলে এল সবার সঙ্গে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এদিকে নকল টারজান কিন্তু

শিবিরের কাছেই একটা গাছে উঠে সব লক্ষ্য রাখছে। মেয়েটাকে দেখে প্রথমে চমকে গেলেও সে খুশিই হয়েছিল তাকে দেখে। ভেবেছিল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আবার নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু শিবিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও দুর্বৃত্ত দুইজন তখনও জেগে আছে দেখে অধৈর্য হয়ে উঠছিল সে। তবুও অপেক্ষা করতেই হবে।

দুর্বৃত্ত দুজনে ঘুমোবে কি? তখন তারা দুইজনে পরামর্শ করছিল মেয়েটিকে তারা নিয়েই যাবে চুরি করে। তারপর তারা তার বাবার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবেই তিনহাজার পাউণ্ড আদায় করবে।

তাই করল তারা। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তারা চুপিচুপি মেয়েটির তাঁবুতে গিয়ে উঠতেই চমকে উঠেছিল মেয়েটি।—কে! কের

—এই চুপ। একটা কথা বলেছ কি—। বলেই দুর্বৃত্ত তার রিভলভারটা নাচাতে লাগল তার চোখের সামনে। তার সহকারী দাঁড়িয়ে রইল।

অগত্যা কি আর করবে মেয়েটি। তাদের সঙ্গে বেরোতেই হল তাকে। আর তখনি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নকল টারজান তার গরিলাদের নিয়ে। মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। নকল টারজান মেয়েটিকে নিয়ে, হাওয়া। রক্তাক্ত দেহে পড়ে রইল দুর্বৃত্ত ও তার সহকারী। হৈ হৈ করে ছুটে এসেও কেউ ধরতে পারল না নকল টারজানকে।

এদিকে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরে নকল টারজান আদিবাসী একটা মেয়েকেসহ চলল সে পাহাড়টার দিকে।

মেয়েরা যেন আর চলতে পারছে না। কিন্তু টারজান থামলে তো? পিছিয়ে পড়লেই টারজান বলে—এস, এস।

—আর পারছি না। বলে ঝামটে উঠল সাদা মেয়েটি।

—তুমি রাগ করলে? টারজান একটু থেমে বলল।

—কেন করব না? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে আমাকে তুমি নিয়ে চলেছ?

—আমিও কি ক্ষতি করেছি তোমার? আমি তো চেয়েছি তুমি ভাল থাকবে। রাজ্যের সব লোক পুজো করবে তোমায়। বলেই সে আবার তাড়া দিয়ে নিয়ে চলল তাদের। গরিলারাও চলল সঙ্গে। খানিক গিয়েই পাহাড়। পাহাড়টা দেখেই ঘাবড়ে গেল সাদা মেয়ে। বলল—এই পাহাড়ে উঠতে হবে?

—হ্যাঁ, এস। বলে টারজান উঠতে লাগল গরিলাদের নিয়ে একটা গরিলা হাত ধরে নিয়ে চলল সাদা মেয়েটিকে। হঠাৎ একটা খাদ দেখে আর একটা গরিলা আদিবাসী মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে দিল। একটা আর্ত চিৎকারের সঙ্গে অনেক সিংহের গর্জন শুনে আঁতকে উঠল সাদা মেয়েটি—একি! একি করলে?

—রাজ্যের রক্ষীদের খাবার দিলাম। টারজান বলল।

—তার মানে? তোমরা আমাকেও—।

—আরে, না না। কিযে বল? তুমি তো আমার—। বলেই সে চিৎকার করে উঠল—এই সামলে—। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। পা ফস্কে পড়ে গেল একটা গরিলা ঠিক সিংহের গর্তে। তার ধাক্কা লেগে মেয়েটিও পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা পাথরের খাঁজে আটকে গিয়ে বেঁচে যায়।

নকল টারজান তারপর অতি সন্তর্পণে তাকে তুলে বলে—না, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে। বলে সে নিজেই হাত ধরে নিয়ে চলল তাকে।

নগরীতে এসে যেন টারজান হাঁফ ছেড়েবাঁচল।—বাঃ! বাঃ! এলাম আমরা।

কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি অবাক হয়ে দেখছে কি সুন্দর নগরী। যেন পুরোনো কালের কোন এক পর্তুগীজ সভ্যতা। নগরের প্রত্যেকটা লোক তাদের অবাক হয়ে দেখছে না কেবল, নতজানু হয়ে দেখাচ্ছে সম্মান।

রাজদরবারে গিয়ে পেল আরও সম্মান। রাজা ও পুরোহিত তো

তখনি আসন ছেড়ে উঠে সাদরে অভ্যর্থনা করল তাদের। কষ্টের মধ্যেও একটু সান্ত্বনা জুটল তার। সে পরিচিত হয়ে গেল দেবী বলে।

এমন সময় নকল টারজান এসে তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

মেয়েটি রাগে চিৎকার করে উঠে।—তুমি, তুমি আমাকে এখানে আনলে কেন? কেন?

—তাই তো, তাই তো—। কেমন যেন থতমত খেয়ে টারজান বলে—ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। কেন যে আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। যাহোক, কালকেই আমি নিয়ে চলে যাব এখান থেকে।

নিয়েও গেল সে তার পরদিন সকালবেলায় বেড়াবার অছিলায়। দেবতাকে আটকাবে কে? প্রহরীরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েই নগরীর দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে। রাজা ও পুরোহিত জানতেও পারল না। কিন্তু তাদের ভাগ্য খারাপ। খানিক গিয়েই বনের মধ্যে পড়ল তাদের শত্রুপক্ষের হাতে।

এই রাজ্যের পাশের রাজ্য ছিল এক নিগ্রো সুলতানের। দুই রাজ্যের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকত। সেদিনও একদল নিগ্রো মুসলমান ওৎ পেতে ছিল বনের মধ্যে, ঠিক তখনি গিয়ে পড়ে তারা। তারা তখন নকল টারজান ও মেয়েটিকে নিয়ে গেল তাদের সুলতানের কাছে। সুলতান রাখল বন্দী করে। তবে মেয়েটিকে দেখে সে ঠিক করল তাকে বিয়ে করবে।

কারাগারে বসে মেয়েটি রেগে চিৎকার করে চলেছে টারজানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—কেন? কেন তুমি নিয়ে এসেছিলে আমাকে শিবির থেকে? অপদার্থ কোথাকার। ঠিক এমন সময় সেই আমেরিকান ভদ্রলোককেও কারাগারে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।—আপনি এখানে!

—হ্যাঁ, কি আর বলব বল। সবই ভাগ্য। এই তো, এই লোকটা—। নকল টারজানের দিকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন—

তোমাকে নিয়ে চলে আসার পর তার পরদিন আমরা সবাই তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি একা পথ হারিয়ে পড়ি সিংহের মুখে। তখন আসল টারজান এসে আমাকে বাঁচায়।

আমরা দুজনে এখানে এসে লুকিয়ে দেখি দুই রাজ্যের দুইদল সৈন্য যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ দেখতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কখন এ রাজ্যের কিছু সৈন্য আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, খেয়াল করিনি। পড়লাম ধরা। কিন্তু টারজান কয়েকজন সৈন্যকে ঘায়েল করে পালিয়ে যায়। আমাকে নিয়ে আসে এখানে।

গুলি লেগেছিল বটে টারজানের মাথায়, তবে মারাত্মক কিছু হয়নি।

নিগ্রো মুসলমান সৈন্যদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সে ছুটে যায় সামনের নগরীর দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাকে দেখে সবাই শ্রদ্ধা জানাতে থাকে। টারজান কিন্তু তখনও জানে না নগরীর সবাই তাকে দেবতা বলে ভাবছে। চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে সে, হঠাৎ হৈ হৈ চীৎকার শুনে তাকিয়ে দেখে একটা পাগলা মোষ ছুটে আসছে। সামনে পড়ে গেছে এক অস্ত্রধারী পুরুষ। কিন্তু মোষটা এত বিরাট যে তাকে নিবৃত্ত করার শক্তি তার নেই। টারজান মুহূর্তে লাফিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল মোষটাকে। তারপরে মোষটার ঘাড় ভেঙ্গে সে উদ্ধার করল সেই অস্ত্রধারীকে। অস্ত্রধারী অভিভূত। সে তাকে সযত্নে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বলল—তোমাকে কিভাবে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। কে তুমি?

—আমি টারজান।

—টারজান? সে কি করে হবে? দেবতা হিসেবে যে এখানে ছিল সেই তো টারজান।

না, সে প্রতারক। আমার নাম নিয়েই সে মেয়ে চুরি করে বেড়ায়। আমি তাকেই ধরতে এসেছি। সে কোথায়?

—যতদূর খবর পেয়েছি সে নিগ্রো মুসলমানদের রাজ্যে গেছে।

—তাকেই ধরব আমি। খুন করব। তুমি কৈ?

—আমি এখানকার সেনাপতি। বলেই সে তার লোকদের ডেকে বলল—দেখে যাও, এই বিদেশীই হল আসল দেবতা। আগের জন ভণ্ড।

মাথা নীচু করে সবাই সম্মান দেখাল তাকে। সেনাপতি তখন তাকে নিয়ে চলল রাজদরবারের দিকে। পথে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল তার।

টারজান অবাক। বলল—কি হচ্ছে এসব?

—এস না। বলে সেনাপতি তাকে রাজদরবারে নিয়ে গেলে, উপস্থিত সবাই নতজানু হয়ে সম্মান দেখাল। রাজা ও পুরোহিত ঠিক বুঝতে পারল না কাকে নিয়ে এল সেনাপতি? আসল দেবতাকে তো মুসলমানেরা ধরে নিয়ে গেছে। রাজা ও পুরোহিত একসঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—কাকে নিয়ে এসেছ সেনাপতি?

সেনাপতি মাথা নুইয়ে বলল—ধৈর্য ধরুন মহারাজ। ইনিই আমাদের আসল দেবতা।

কক্ষনোও না। বলে রাজা কাকে বলল, একে ধরে সিংহের মুখে ফেলে দাও।

বলতে না বলতেই একজন যোদ্ধা তরবারী নিয়ে টারজানের দিকে ছুটে এলে টারজান একসঙ্গে তাকে তুলে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

চারদিকে উঠল জয়ধ্বনি। রাজা ও পুরোহিত বেগতিক দেখে কখন যে পালিয়ে গেল কেউ বুঝতেই পারল না।

টারজান বুঝল সব। সিংহাসনের লোভেই সব গণ্ডগোল। সে তখন সেনাপতিকে বলল—আমি বুঝেছি সব। রাজা ও পুরোহিত সাধারণ লোককে বশীভূত করে রাখতে চায়। কিন্তু তুমি!

—আমি নতুন রাজা ও পুরোহিতকে বসাতে চাই সিংহাসনে।

—তার মানে তুমি হতে চাও রাজা।

—না। সামন্তরা যাকে রাজা বলে স্বীকার করবে সেই হবে রাজা।

ইতোমধ্যে এ নিয়ে আর কথার দরকারও হল না তাদের। সব সামন্তই ঘাবড়ে গিয়েছিল টারজানের এমন ক্ষমতা দেখে। একজন এসে টারজানকে বলল—প্রভু, আমাদের রাজা কে হবে?

সেনাপতি টারজানের দিকে তাকিয়ে রইল। টারজান বলল—অতীতে যত অন্যায় অত্যাচার হয়েছে আজ হতে তার অবসান হল। তোমাদের রাজা হল তোমাদেরই সেনাপতি। আজ থেকে সে-ই তোমাদের রাজ্য শাসন করবে।

মুহূর্তে জয়ধ্বনি উঠল রাজদরবারে নতুন রাজার। তারপরেই ঠিক হল প্রধান পুরোহিত।

এমন সময় খবর এল তিনজন সাদা মানুষ বন্দী হয়েছে সৈন্যদের হাতে। উল্লসিত হয়ে উঠল রাজা।—বাঃ! সুখবর! আমার রাজত্বের প্রথমদিনেই সাদা বন্দী? তাদের ক্রীতদাস করে রাখব। নিয়ে এস তাদের।

তাদের দেখেই চমকে উঠল টারজান। দুইজন সেই দুর্বৃত্ত। আর একজন অবশ্য অচেনা। তাকে কাছে ডেকে টারজান জিজ্ঞেস করল—তুমি কি করে ধরা পড়লে?

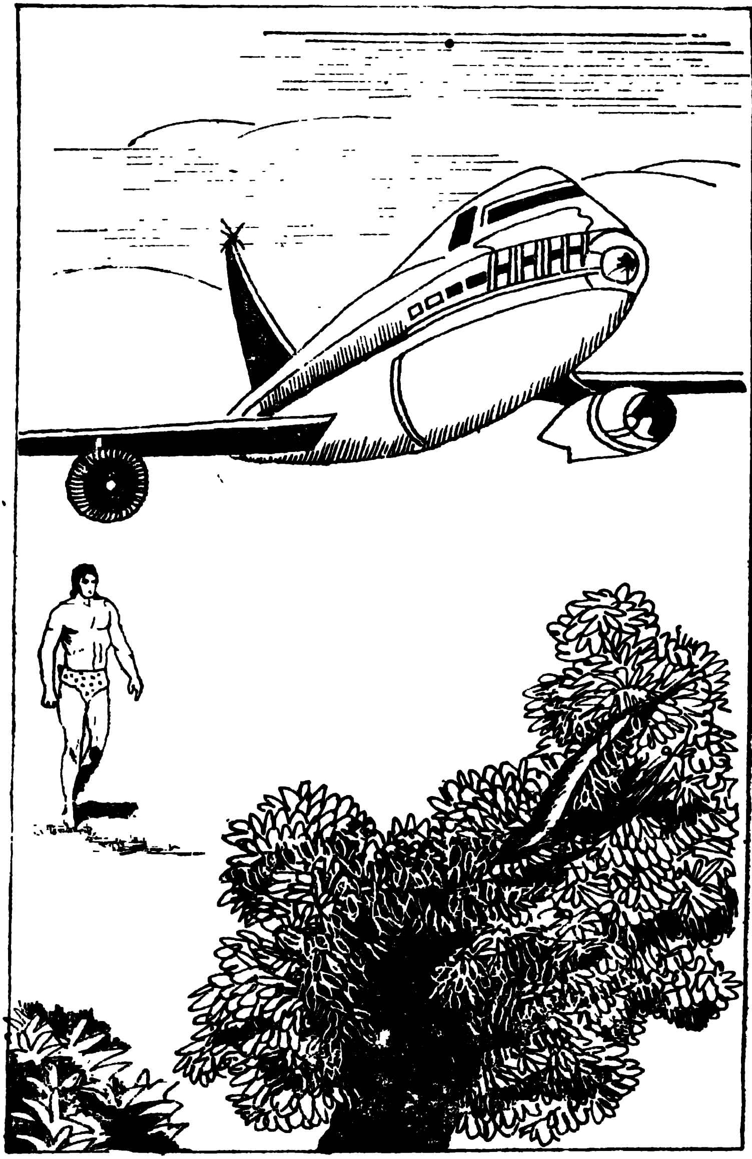
—দুবছর আগে আমি মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ি। তারা আমাকে ক্রীতদাস করে রেখেছিল। তাদের সোনার খনিতে কাজ করতাম। একদিন হঠাৎ এখানকার লোক এসে আমাকে ধরে ফেলে। তারপর পথে এদুজনকেও পেয়ে যায়। কিন্তু তুমিই কি রাজা?

—না, আমাকে তারা প্রভু বলে ডাকে। রাজা হল সিংহাসনে যে বসে আছে সে।

টারজান তখন রাজাকে বলল—আমি এখন একে নিয়ে নিগ্রো মুসলমানদের রাজ্যে গিয়ে ভদ্রলোকটিকে বের করে খুন করব। আর মেয়েটিকে নিয়ে আসব। তুমিও এস তোমার সৈন্যদের নিয়ে। তুমি রাজা হয়েছ। তোমার উচিত এখন রাজ্য বিস্তার করা।

তুমুল লড়াইয়ের পর সুলতান পরাজিত ও বন্দী হল নতুন রাজার

হাতে। টারজানও তার গরিলার দল নিয়ে তাদের করেছিল সাহায্য।



যুদ্ধ শেষে সেও সেই অচেনা লোকটিকে নিয়ে চলে গেল পালিয়ে।

সেই দুর্বৃত্ত দুইজনও কিন্তু বসে থাকেনি তারাও যুদ্ধের সুযোগে পালিয়ে গিয়েছিল কারাগার থেকে।

তিনটি দলই ছিটকে পড়ল তিনদিকে।

দুর্বৃত্ত দলের নেশা তখন সোনায়। তারা শুনেছিল ন্যাড়া পাহাড়ের কাছেই কোথাও সোনা আছে। সেটার খোঁজে বেরিয়েই পড়েছিল এই বিপদে। এখনও নেশা কাটেনি তাদের। তবে সহকারী চাইছিল কোনমতে চলে যেতে। কিন্তু দুর্বৃত্ত দিলে তো! ঘুরতে ঘুরতে একদিন পেয়েও গেল তারা সেই সোনার খনি। সুলতানের রাজ্যেই ছিল সেই খনি। সুলতান হেরে যাওয়াতে অরক্ষিত অবস্থায়ই পড়েছিল খনি। হঠাৎ দুর্বৃত্ত এটা দেখে তো হুমড়ী খেয়ে পড়েই হা হা করে হেসে উঠেছিল—এই তো, এই তো খনি। আমরা এখন ধনী। বলে জামা খুলে সে কুড়োতে লাগল সব সোনার তাল। সহকারীও নিল এক বোঝা। কিন্তু খাদ্যের অভাবে, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর তুলতে পারলে তো? তবু ছেড়ে যেতে পারে না।

এদিকে নকল টারজানও আমেরিকান ভদ্রলোক ও মেয়েটিকে নিয়ে পড়ল এক বিপদে। সাহসী হয়েও সে ঠিক বুঝতে পারছিল না কি করছে সে। যেতে যেতে হঠাৎ এক গরিলা দল আক্রমণ করে তাদের। গরিলাদলের সঙ্গে আমেরিকান ভদ্রলোক লড়াই করবে কি? গরিলার এক আঘাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে। নকল টারজানও তাই।

এত বিপদে পড়ে কিন্তু মেয়েটি তক্ষণে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। সেই দুর্বৃত্ত যখন তাকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন মেয়েটি হঠাৎ তার তূণ থেকে একটা বিষাক্ত তীর বের করে বসিয়ে দেয় তার পিঠে। চিৎকার শুনেই নকল টারজান তাকে এসে ধরে।

গরিলা দল চলে যাওয়ার পরেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু কিছুই মনে ছিল না তার। উঠে বসে চারদিক তাকিয়েই হঠাৎ

তার সব মনে পড়ে। মনে পড়ে যায় আমেরিকান ভদ্রলোকের কথা। কিন্তু কোথায় সে। এখানেই সে পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে। হঠাৎ পাশেই দেখে চাপ চাপ রক্ত। তবে কি সিংহ নিয়ে গিয়েছে তাকে? মেয়েটিকেও? লাফিয়ে উঠেই ছুটে যেতে থাকে সে! দেখা পেয়ে যায় সেই দুই দুর্বৃত্তের। সোনা নিয়েই ব্যস্ত তারা। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, পা আর চলে না তাদের। তবুও নিয়ে চলেছে দুই বাক্স সোনা। নকল টারজান কোনমতেই ফেরাতে পারল না তাদের। বিরক্ত টারজান তখন তাদের ফেলে রেখেই চলে এসেছিল এদিকে। আর তখনি শোনে সে এই চিৎকার।

মেয়েটিতো নকল টারজানকে পেয়ে খুশিতে জড়িয়ে ধরল তাকে।

এদিকে আসল টারজান সেই অচেনা লোকটিকে নিয়ে তখনও চলেছে মেয়েটির খোঁজে। দিনের পর দিন। টারজান শিকার করে আনে, দুজনে খায় তারপর আবার চলে।

এমন সময় একদিন অচেনা লোকটিকে এক জায়গায় রেখে টারজান গেছে শিকার করতে। হঠাৎ সামনে ঝোপের আড়ালে কার কথা শুনে সে তাকিয়ে দেখে সেই নকল টারজান ও মেয়েটি কথা বলছে বসে। টারজান তো তখনি এক লাফে লোকটির সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠল -এই তো পেয়েছি তোমাকে।

ঝট করে দুজনেই উঠল লাফিয়ে। আর মেয়েটি তো টারজানকে দেখেই আনন্দে ছুটে গিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠল আরে টারজান তুমি?

- হ্যাঁ, সর। আমি লোকটাকে খুন করব। বলেই সে নকল টারজানের কাছে গিয়ে বলল—সোজা হয়ে দাঁড়াও।

— কেন কেন? মুখ শুকিয়ে গেল মেয়েটির।

নকল টারজানও বলল তুমি আমাকে খুন করবে কেন?

ঠিক এই সময়ই সেই অচেনা লোকটি কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে নকল টারজানকে দেখে বলে আরে, তুমি!

টারজান বলল তুমি চেন তাকে?

—বা রে! চিনব না কেন? অচেনা লোকটি বলল সে তো আমার বন্ধু, অসমসাহসী, ভাল পাইলট, তার প্লেনেই তো আমরা দুজন চলে এসেছিলাম এখানে। ছোটবেলা থেকেই সে টারজানের বই পড়ে টারজানের মত জঙ্গলে থাকতে চাইত, তাই তো বাড়ী ধরে আসা, এরোপ্লেন বিগড়ে গিয়েই তো দুজনে দু'জায়গায় লাফিয়ে পড়েছিলাম। আমি পড়েছিলাম সুলতানের হাতে ধরা, আর সে নগরে। বোধহয় মাথায় আঘাত লেগে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল সে।

সত্যিই তাই! স্মৃতিশক্তিই হারিয়ে ফেলেছিল সে। আর তার পরদিনই খুঁজতে খুঁজতে এরোপ্লেনটা পেয়ে স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছিল তার। অক্ষতই ছিল প্লেনটা, তেলও ছিল। তারপরেই সে ঠিক করতে লেগে গিয়েছিল এরোপ্লেনটা। করেও ফেলল!

ততক্ষণে টারজানের রাগও শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

তার পরদিনই তারা তিনজন টারজানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এরোপ্লেনে উঠে পড়ল আকাশে। মেয়েটি কিন্তু তখনও তাকিয়েছিল জঙ্গলের দিকে। হাত নেড়ে বিড় বিড় করে বলেছিল বিদায় আফ্রিকা, বিদায়।